প্রথম খণ্ড।

"যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥"

[illegible]।—হে কৌন্তেয়! যত্নবান্ বিবেকশালী পুরুষেরও [illegible]লোড়নকারী ইন্দ্রিয়সমূহ সবলে আয়ত্তগত করে।

[illegible]র্য্য।—ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির এতই প্রবল প্রতাপ যে, [illegible]বিধান ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও তাহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা সুকঠিন।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ২য় অধ্যায়। ৬০ শ্লোক। শ্রীমদ্ভগবদুক্তি।)

বিজ্ঞাপন।

[illegible] স্বার্থসিদ্ধির বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া [illegible] পরহিত-সাধন-ব্রত-গ্রহণ করিতে পারিলে, মানব স্বয়ং আত্মার এবং সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারেন, এই তত্ত্বকথা বর্ত্তমান সামান্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

বহুদিন পূর্ব্বে এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রচারিত হইয়াছিল এবং তদবস্থায় ইহার বহু সহস্র খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল। নানা কারণে এত দিন এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে না পারায় অনেকের নিকট বড়ই আমাকে কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পুস্তক সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হওয়ায়, আমি নিষ্কৃতি-লাভ করিলাম। ইতি

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ সাল।

কর্ম্মক্ষেত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর যাইবার একটি সরল ও সুন্দর রাজপথ আছে। পথটি ছয় ক্রোশ দীর্ঘ। দুই তিন স্থান ব্যতীত, পথের অব্যবহিত পার্শ্বে, কোথাও লোকালয় নাই। সততই এই পথে গরুর গাড়ি ও মানুষ যাতায়াত করে। কিন্তু দিনমানে যত লোক ও গাড়ি দেখা যায়, রাত্রিতে তত দেখা যায় না। পূর্ব্বে এই পথের কোন কোন স্থানে লগুড়ধারী মহাশয়েরা লুকায়িত থাকিতেন; এবং অসাবধান ও সঙ্গীহীন পথিকের মাথা ফাটাইয়া জীবন-যাপন করিতেন। ইংরাজরাজের বিষম দণ্ডবিধির প্রতাপে সে ভয় এখন আর বড় নাই। কিন্তু নদীর একদিক ভাঙ্গিতে থাকিলে, অপর দিকে চড়া পড়ে; জগতে চির-দিনই সুখদুঃখ পাশাপাশি হইয়া চলে। ইংরাজরাজের

পড়িতেছে। এইরূপ সময়ে দুই ব্যক্তি সেই পথ দিয়া শান্তিপুর-অভিমুখে গমন করিতেছে। ব্যক্তিদ্বয়ের একের বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। সে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়, ঈষৎ স্থূল, ও মধ্যমাকার। তাহার মাথায় বহু-তালিযুক্ত এক ছাতা, পায়ে নয়,—হাতে এক জোড়া জীর্ণ ঠনঠনের চটী, পৃষ্ঠদেশে গামছা বাঁধা এক বুঁচকি, কোমরে চাদর জড়ান। তাহার সঙ্গী যুবা পুরুষ—বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর, কৃশকায়, গৌরবর্ণ ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। তাহারও মাথায় ছাতা, কিন্তু তালিহীন ; হাতে জুতা, কিন্তু জীর্ণ চটি নয় ; কোমরে চাদর জড়ান, কিন্তু গা জামায় ঢাকা।

লোক দুইটি যে এই পথ দিয়া সতত যাতায়াত করে তাহা তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে। তাহারা কথা কহিতে কহিতে চলিতেছে। যুবক বয়ঃ-জ্যেষ্ঠকে 'শামখুড়া' বলিয়া ডাকিতেছে ; সুতরাং খুড়া মহাশয়ের নাম শ্যামলাল, কি শ্যামচাঁদ, কি শ্যামাচরণ, কি এইরূপ একটা কিছু হওয়া সম্ভব। শ্যামখুড়া সঙ্গী যুবককে 'যদু বাবাজি' বলিয়া ডাকিতেছেন ; সুতরাং শ্রীমান বাপাজীবনের নাম যদুনাথ, বা যদুপতি বা এইরূপ একটা কিছু হওয়াই সম্ভব। নাম যাহাই হউক, সাহসী খুড়া ভাইপো, অপরিহার্য্য প্রয়োজনের জন্যই হউক, বা অভিজ্ঞতা-হেতু ভীতিবিরহিত হইয়াই হউক, এই নিতান্ত অসময়ে এই পথ দিয়া চলিতেছেন। এক্ষণে কথাবার্ত্তায়

কিয়দংশ শুনিতে পাইলেই তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যাইবে।

ভাইপো বলিতেছেন,—"তা যাই বল শ্যাম খুড়া, শান্তিপুরের চালানি কাজে যে এত সুবিধা হইবে, তা আগে বুঝা যায় নাই।"

শ্যাম বলিলেন,—"ব্যবসায়, কি জান যদু বাবাজি, শরীরে আলস্য থাকিলে চলিবার যো নাই। আমরা ব্যবসার জন্য যেমন শরীর জল করিয়া লাগিয়াছি, এমন করিলে যে কাজেই লাগা যাইবে, তাতেই বেশ দশ টাকা উপায় হইবেই হইবে।"

যদু বলিলেন,—"তা সত্য—আমাদের খাটনির শেষ নাই। ঝড় বল, বৃষ্টি বল, সাপ বল, বাঘ বল, আমরা কিছুতেই পিছ-পা নই। এখন যে সুবিধার আশায় আজি এই দারুণ দুর্য্যোগে আমরা বাহির হইয়াছি, মা কালীর ইচ্ছায় সেটা লাগিলে হয়।"

শ্যাম বলিলেন,—"লাগিতেই হইবে। যেরূপ সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে এখনও সে মালের কোন খরিদ্দার উপস্থিত হইয়াছে এমন বোধ হয় না। একবার বায়না করিয়া ফেলিতে পারিলেই পাকা হইয়া যাইবে। নোটগুলা কোমরে ঠিক আছে তো? একবার হাত দিয়া দেখ।"

যদু হস্তদ্বারা কোমরের নোটের তাড়া দেখিয়া বলিল, —"ঠিক আছে। কিন্তু কাকা, সওদাটা নাকি বড়ই

লাভের, তাতেই আমার ভয় হইতেছে, পাছে ফস্‌কাইয়া যায়।”

শ্যাম বলিলেন,—“ভয়ের তো কোন কারণ নাই; এখন আমাদের কপাল। আজি বৈকাল পর্য্যন্ত মালের কোন খরিদ্দার উপস্থিত হয় নাই, এ সংবাদ আমরা আজি সন্ধ্যার পর জানিতে পারিয়াছি। তাহার পরেই আমরা টাকা লইয়া বাহির হইয়াছি। সাপ, বাঘ, মেঘ, বৃষ্টি, ভূত-প্রেত কিছুই আমরা মনে করি নাই। ইহাতেও যদি সওদা ফস্‌কাইয়া যায়, তাহা হইলে আর হাত নাই। ফস্‌কাইবে এমন বোধ তো হয় না! তুমি ধার্ম্মিক, সত্য-বাদী, ব্যবসায়-কার্য্যে বড় যত্নবান। ভগবান্ সকল বিষয়েই তোমার সুবিধা করিয়া দিবেন।”

যদু বলিলেন,—“খুড়া, তোমার আশীর্ব্বাদ আমার একমাত্র ভরসা। আমার ব্যবসাই বল, সংসার-ধর্ম্মই বল, সকলই তুমি। তোমার সাহায্য আর উপদেশ না পাইলে আমি কিছুই করিতে পারি না। তোমার প্রতি যতদিন আমার ভক্তি থাকিবে, যতদিন তোমার কথা আমি মাথা পাতিয়া মানিয়া চলিব, যতদিন তোমার উপদেশ সকল ধর্ম্মের সার বলিয়া আমার মনে থাকিবে, ততদিন আমার কোন কষ্ট হইবে না, আমার কোন কাজেই ঠকা হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস।”

শ্যাম খুড়া একটু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—“জল

একটু চাপিয়া আসিল, অন্ধকারটাও একটু জমাট বাঁধিল বোধ হইতেছে। তা হউক, পথ অতি পরিষ্কার ভয় কিছুই নাই। মধ্যে মধ্যে কোমরে হাত দিয়া নোটগুলা দেখিও বাবা! এক সঙ্গে হাজার টাকার নোট না আনিলেই হইত। যা হউক, একটু সাবধান থাকিও।"

যদু বলিল,—"কিছু ভয় নাই খুড়া! কিছু বেশী টাকা সঙ্গে আনাই ভাল হইয়াছে। কি জানি কি দরকার পড়ে, তখন কার কাছে গিয়া হাত পাতিবে, বল। তা ভয় কি খুড়া? পথ খুব খাসা—ভয় কিছুই নাই। আর পথ যেমনই হউক, আমরা দু' দু'টা মরদ—যমকেও ডরাই না। তবে কিসের ভয়?"

শ্যাম খুড়া বলিলেন,—"ভয়? রাধাকৃষ্ণ! ডাকাতই আসুন, কি ভূতই আসুন, কি বাঘই আসুন, আমরা কিছুতেই পিছাইবার পাত্র নহি।"

ঠিক সেই সময়ে পথ-পার্শ্বস্থ বৃক্ষতল হইতে নিতান্ত কোমল ও ক্ষীণ-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—"বাবা, শান্তিপুর আর কত দূর?"

যেই এই কথা শুনা, সেই অতি সাহসী খুড়া চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"বাবা গো, পেত্নী গো, তোমরা কে কোথায় আছ, আমাকে ধর গো!"

সঙ্গে সঙ্গে অতি সাহসী ভাইপো চীৎকার করিলেন,— "খুড়া গো, খেলে গো, ওগো পেত্নী গো!"

পুনরায় সেই বৃক্ষতল হইতে কাতর-কণ্ঠে শব্দ হইল,—"তোমরা যেই হও, আমাকে ফেলিয়া যাইও না। আমি তোমাদের সঙ্গ ছাড়িব না।"

তখন শ্যাম বলিলেন,—"ঐ আস্‌ছে গো, ঐ এলো গো, ঐ এসেছে গো, রাতে নাম কর্‌তে নাই গো!"

সঙ্গে সঙ্গে যদু বলিলেন,—"আমায় ধরেছে গো, প্রকাণ্ড পেত্নী গো বাবা!"

তাহার পর সেই কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে অতি দ্রুত চট্ পট্ থুপ থপাস্, চপ্ চপ্, ঢুড় ঢুড় শব্দ হইতে লাগিল অমিতপ্রতাপ খুল্লতাত শ্যাম এবং বীরবর ভ্রাতুষ্পুত্র যদু ঊর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাদ্দিকে পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। হাত হইতে জুতা পড়িয়া গেল, কাঁধ হইতে ছাতা খসিয়া গেল, ধড় হইতে প্রাণ পলায় পলায় হইল—কাজেই এ সকল সন্ধান তখন করে কে? এইরূপে অন্ধকারে ছুটিতে ছুটিতে একবার শ্যামের গায়ে যদু পড়িয়া গেলেন। তখন শ্যাম চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"আমাকে ধরেছে রে যদু, ধরেছে। দোহাই মা পেত্নী, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দেও।"

যদু বলিল,—"ভয় কি খুড়ো? আমি গো আমি!"

হাঁফাইতে হাঁফাইতে শ্যাম বলিলেন,—"তুমি? তবু রক্ষা! তা ভয় কি বাবা? রাম রাম বল।"

তখন খুড়া-ভাইপো এক দৌড়ে আধক্রোশের বেশীও

ছাড়াইয়া আসিয়াছেন। প্রেতিনী আর অনুসরণ করিতেছে না বুঝিয়া, তাঁহাদের উভয়েরই একটু সাহস হইল, এবং তাঁহারা সুপটু চরণ-চতুষ্টয়ের বেগ একটু কমাইয়া আনিলেন। তখন শ্যাম যদুকে তিরস্কার-স্বরে বলিলেন,—"ছি বাবা, তুমি ছেলে মানুষ; সংসারে কিছুই জান না; এমন ভয় করিতে আছে কি?"

যদু বলিলেন,—"ছি খুড়া, তুমি বুড়া মানুষ; সংসারের অনেক জান; এমন ভয় করিতে আছে কি?"

সুতরাং খুড়া মহাশয় নিরুত্তর হইলেন। তখন এই গলদঘর্ম্মকলেবর, কর্দ্দম বিলেপিত-কায়, নিরুদ্ধ-নিশ্বাস বীরদ্বয়, বারংবার চারিদিকে সভয় দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, সন্নিহিত সাঁকোর উপর বসিয়া বিশ্রাম করিবেন স্থির করিলেন। তাঁহারা তদর্থ সাঁকোর উপর উপবিষ্ট হইয়া হাঁফাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে একটা শৃগাল পথ বহিয়া যইতেছিল। বীরদ্বয় সেই শৃগালের গমন-জনিত থপ্ থপ্ শব্দ শুনিয়া সমস্বরে সকাতরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"আবার ঐ এয়েছে গো বাবা!"

কিন্তু উভয়েই শ্রম-কাতর চলচ্ছক্তিহীন, এবং প্রেতিনীর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি-লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব-বোধে, নিরতিশয় ভরসা-শূন্য। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উভয়েই কাঁপিতে কাঁপিতে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং উভয়েই, ভীতিজনিত অঙ্গাদির অস্থিরতা-হেতু, তদবস্থায়

সাঁকোর উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। সাঁকোর নিম্নে ভেককুল-সমাকুল একটু জল ছিল। বীরদ্বয়ের আপাদ-মস্তক জলসিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল—অঙ্গে কোন আঘাত লাগিল কি না, তাহা তখন স্থির হইল না। কোনরূপ অঙ্গ-সঞ্চালনাদি না করিয়া তাঁহারা কিয়ৎকাল তথায় নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাহার পর নিতান্ত অস্ফুট-স্বরে ভাইপো জিজ্ঞাসিলেন,—"খুড়া, পেত্নী কোথায় ?"

খুড়া বলিলেন,—"রাম রাম বল বাবা ; ও নাম তুমির মুখেও আনিও না। আজি বড় অযাত্রা।"

তাহার পর খুড়া ও তাঁহার উপযুক্ত ভাইপো, অপরিসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া, অতি কষ্টে পুনরায় রাস্তার উপরে উঠিয়া আসিলেন, এবং দুটিতে এক হইয়া সাঁকো হেলান দিয়া বসিলেন। ভয় ও পরিশ্রমে তাঁহাদের শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল ; তাঁহারা অনতিকাল মধ্যে নিদ্রিত হইয়া আপাততঃ সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

বলা বাহুল্য যে, এই দুই ব্যক্তি কৃষ্ণনগরের দোকানদার। উন্নতিশীল কৃষ্ণনগরের একজন উন্নতিশীল বালক দেশহিতৈষী, ভলণ্টিয়ার হওয়ার আবশ্যকতা-সম্বন্ধে, অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হাটে মাঠে ঘাটে তাঁহার জ্বলন্ত উন্মাদকারী বক্তৃতা শুনিয়া কৃষ্ণনগরের ছেলে-

বুড়ো ভলণ্টিয়ার হইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে অন্যান্য অনেক দোকানদারের সহিত শ্যাম ও যদুও যে ভলণ্টিয়ার হইবার জন্য যথেষ্ট ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ আমরা রাখি। যদি মহামতি ট্যালবয়স্ হুইলার সাহেব বা অন্য কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিত তাঁহাদিগের গ্রন্থাদিতে এই চিরস্মরণীয় ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তজ্জন্য আমাদের নিকট আবেদন করিলে, আমরা এতৎ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রমাণাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিতে সম্মত আছি। বলা অবশ্যক, এরূপ ঘটনা উল্লিখিত রূপ ঐতিহাসিকের লেখনীমুখে পরিব্যক্ত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।
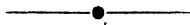
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খুড়া ও ভাইপো যখন এইরূপে সাঁকো হেলান দিয়া তন্দ্রাভিভূত ছিলেন, তখনও উষা-সমাগম ঘটে নাই। কবির ভাষায় বলিতে হইলে বলা উচিত ছিল যে, সূর্য্যদেব তখনও রাঙ্গা টোপর মাথায় দিয়া আকাশের পূর্ব্ব দরজা হইতে উকি দিতে আরম্ভ করেন নাই। সৌভাগ্য-ক্রমে দুনিয়ার সকল লোক কবি নহে।

ব্যবসায়ীদ্বয় ঘুমাইতে ঘুমাইতে প্রেতিনীর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন কি না, এবং স্বপ্নে তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া আশঙ্কিত হইতেছিলেন কি না, তাহার সংবাদ আমরা রাখিতে পারি নাই। সুতরাং এস্থলে ভারত-ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ নিতান্ত অঙ্গহীন হইয়া থাকিতেছে। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের দ্বারা এ অপূর্ণতা নিরাকৃত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত, অত্যদ্ভুত গবেষণা-সহকারে, ভারত ইতিহাসের যাবতীয় অভাব মিটাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কৃপা হইলে, এ অঙ্গহীনতা সংশোধিত হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে; কারণ, এবংবিধ অসংখ্য গুরুতর বিষয়ের অত্যাশ্চর্য্য মীমাংসা তাঁহাদের গ্রন্থাদির ছত্রে ছত্রে মণিমুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে

এইরূপ সময়ে মাল-বোঝাই ও ত্রিপল ঢাকা এক গরুর গাড়ি 'ক্যাঁ—কোঁ—চ্যাঁ—চোঁ' শব্দে দশদিক নিনাদিত করিতে করিতে কৃষ্ণনগরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। তাহার গাড়োয়ান নিধিরাম ঘোষ নিরতিশয় বর্ব্বর, নচেৎ এই নিশাবসান-কালে, নিসর্গের নিরূপম শোভা সম্ভোগ না করিয়া, সে গাড়ির সম্মুখে বসিয়া ঝিমাইতেছে কেন?

প্রেতিনী-চিন্তাপরায়ণ, অধুনা তন্দ্রাগ্রস্ত ব্যক্তিদ্বয়ের কর্ণে সহসা সেই গো-যানের অত্যুৎকট ধ্বনি প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাদের প্রতীতি জন্মিল, এবার দল বাঁধিয়া আত্মীয়-কুটুম্ব প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া, প্রেতিনীরা ধাইয়া আসিতেছে; সুতরাং আর নিস্তার নাই। তখন ভাইপো বলিলেন,—"ঐ ধর্‌লে গো! যাই গো!"

খুড়া বলিলেন,—"ঐ ধরেছে রে! বাবা গো!"

তখন খুড়া ভাইপো জড়াজড়ি করিয়াই গড়াইতে গড়াইতে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই গোলমালে নিধিরাম গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সম্মুখস্থ ব্যাপার দেখিয়া সে মনে করিল, হয় তো কোন দস্যু পথিকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং তজ্জন্য উভয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে। সে শ্যাম খুড়াকে দস্যু এবং যদু বাবাজীকে পথিক বলিয়া মনে করিল। হতভাগা গাড়োয়ান, জগতের পরিত্রাণ

কর্ত্তা প্রভু যেশু খৃষ্টের নীতিকথা কখন আলোচনা করে নাই, দার্শনিক-প্রবর জন ষ্টুয়ার্ট মিলের 'ইউটিলিটেরিয়ানিজম' শাস্ত্র কখন অধ্যয়ন করে নাই; সুতরাং তাহার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা একটুও বিদূরিত হয় নাই। 'সরভাইবাল অফ্ দি ফিটেষ্ট' এই অপূর্ব্ব 'থিয়রিটাও' যদি তাহার জানা থাকিত, তাহা হইলে, কোনরূপে তাহা এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া, হতভাগা নিশ্চিন্ত থাকিলেও থাকিতে পারিত। মূর্খ গাড়োয়ান সম্মুখস্থ ব্যাপার সন্দর্শনে বড়ই রাগিয়া উঠিল, এবং গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বেগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া সে যদি চুপ করিয়া থাকিতে পারিত, তাহা হইলে অনেক সুপণ্ডিত তাহার চরিত্রগত সাম্যভাবের সমর্থন করিতে পারিতেন। মন্দমতি নিধিরাম বিনা বাক্যে হস্তস্থিত পাঁচনির দ্বারা খুড়া মহাশয়ের উপর বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম বসাইয়া দিল এবং অত্যন্ত ক্রোধের সহিত চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল —"দাঁড়া শালা ডাকাইত, আজ তোর হাড় এক ঠাঁইয়ে, মাস এক ঠাঁইয়ে করিয়া তবে ছাড়িব। জানিস্ না হারামজাদা, এ কোম্পানির মুলুক?"

এই বলিয়া ক্রুদ্ধ গাড়োয়ান মহাশয় দ্বিগুণ জোরে পুনরায় শ্যাম খুড়ার পৃষ্ঠদেশ বেশ করিয়া সাজাইয়া দিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, আমরা জ্ঞাত আছি,

নিধে গাড়োয়ান মহারাণীর এলাকা-ভুক্ত কোন স্থানের 'জষ্টিস্ অব্ দি পিস্' বা অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নহে, এবং ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট বা দারোগাগিরি কর্ম্মও সে করে না। সুতরাং এরূপ অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া দণ্ডবিধির অবমাননা করা তাহার পক্ষে যৎপরোনাস্তি অন্যায় কর্ম্ম সন্দেহ নাই। যে কথা শিক্ষিতমাত্রেই বুঝেন, মূর্খের একজনও তাহা বুঝিতে পারে না, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য! সে যাহাই হউক, নিধিরামের কথায় যেরূপ রাজ-ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কিন্তু কখনই উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে। সে বাক্যের দ্বারা যেরূপ রাজ-ভক্তির পরিচয় দিয়াছে, জেলার মেজিষ্ট্রেট সাহেব যদি তাহা দয়া করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রীযুক্ত নিধিরাম গাড়োয়ান মহাশয় রায় বাহাদুর অথবা 'সি, আই, ই,' উপাধিতে বিভূষিত হইতেন। বস্তুতঃ এইরূপ রাজভক্ত লোকই এইরূপ রাজ-সম্মানের উপযুক্ত।

কথা হইতেছে, মা'র বড় শক্ত জিনিস; কারণ, মা'রের আগে ভূত পলায়; সুতরাং প্রেতিনী কোন্ ছার! অধুনা পেত্নীর উপর মা'র না পড়িলেও, পেত্নী-পাওয়া লোকের ঘাড়ে বিলক্ষণ সোটা পড়িয়াছে। সেই সোটার চোটে হয়ত পেত্নী ছাড়িয়া গেল। যদু বাবাজি প্রহারের শব্দ ও খুড়ার আর্ত্তনাদ শুনিয়া, সভয়ে খুড়ার বাহুমধ্য

হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন, এবং কয়েক পদ অন্তরে গিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। এদিকে যাতনাক্লিষ্ট শ্যাম-খুড়া কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়োয়ানের পা জড়াইয়া বলিলেন,—"দোহাই বাবা, আমি কখন চোরও নহি, ডাকাইতও নহি। আমার সাতপুরুষের মধ্যে চোর-ডাকাইত ছিল না। ঐ যদু সম্পর্কে আমার ভাইপো হয়। কৃষ্ণনগরে আমাদের সবাই জানে; সেখানে আমাদের দোকান আছে।"

গাড়োয়ান সবিস্ময়ে একবার যদু ও একবার শ্যামের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"হাঁ—একি কাণ্ড? এ যে শ্যাম খুড়ো দেখ্‌ছি—ও যে যদু-দা। রাম রাম রাম—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!"

তখন শ্যাম-খুড়া নয়নের জল মুছিয়া গাড়োয়ানের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তাহাকে চিনিতে পারিয়া সক্রোধে বলিলেন,—"কেও, নিধে নাকি? হারামজাদা, মেরে ফেলেছিস্ একেবারে!"

অতিশয় রাগের সহিত যদু বলিলেন,—"নিধে! তুই হতভাগা কোন্ আক্কেলে খুড়োর গায়ে হাত তুল্লি বল্‌তো! তোর সর্ব্বনাশ করে তবে ছাড়্‌ব জানিস্?

তখন নিধে গোয়ালা ওরফে নিধিরাম ঘোষ বড় দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইল। সে যেরূপ ঘটনায় ও যেরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই ঘোর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা

সবিনয়ে বুঝাইয়া দিল, এবং তজ্জন্য বড়ই আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। আজিকার বাজারে চলিত কথায় বলিতে হইলে বলা আবশ্যক যে, নিধে গোয়ালা যথোপযুক্ত 'এপলজি' করিল। দুই দশটা রাগ, অভিমান, তিরস্কার ও শাসন-বাক্যের পর, খুড়া-ভাইপো একযোগে তাহার ক্ষমাভিক্ষা মঞ্জুর অর্থাৎ 'এপলজি এক্‌সেপ্ট' করিয়া লইলেন।

এই স্থলে তত্ত্বদর্শীগণ নিধিরামের চরিত্র সমালোচনা করিয়া কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকের পক্ষে সেগুলা বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে পারে বিবেচনায়, তৎসমস্ত এখানে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। নিধিরাম ঘোষ মূর্খ; সে গরুর পৃষ্ঠদেশে বিলক্ষণ লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ করে; তাহাদের লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া রসিকতা করে; তাহাদের ভগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া কুৎসিত গালিগালাজ করে; তাহাদের জননীকে উদ্দেশ করিয়া সুরুচি-বিরুদ্ধ অভদ্রতা করে; গাড়ির পেয়ে মারে; ঘাড়ে করিয়া গাড়িতে মাল বোঝাই করে; আবার সেইরূপে গাড়ি খালাস করিয়া দেয়। ইত্যাকার কাজ সে জানে, কিন্তু 'এপলজি' করিতে তাহার কখনই জানা সম্ভব নহে। আমাদের একজন সম্মানিত ইংরাজবন্ধু অনেক বিবেচনার পর স্থির করিয়াছেন যে, 'এপলজি করাটা সভ্যতার একটা অঙ্গ।' এদেশ চিরদিন

যেরূপ অসভ্য, তাহাতে এখানে 'এপলজি' কখনই প্রচার ছিল না, ইহা স্থির। ইদানীন্তন কালে বিলাত হইতে বস্তা বস্তা বিলাতী কাপড়ের আমদানী হইয়া যেমন দেশীয় আপামর সাধারণের নগ্নতা নিবারণ করিতেছে, সেইরূপ বস্তা বস্তা সভ্যতার আমদানী হওয়ায় নাগাইদ নিধিরাম ঘোষ 'এপলজি' করিতে শিখিয়াছে! অতএব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের জয় হউক—তাঁহাদের অধিকার বসুন্ধরার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হউক। এই বিচার-নিপুণ পণ্ডিত মহাশয় আরও মীমাংসা করিয়াছেন, যাহারা এইরূপ 'এপলজি' প্রভৃতি সভ্যতার প্রধান অঙ্গসমূহ সম্পূর্ণ আয়ত্তীকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাই এতদ্দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই। এইরূপ লোকেরাই 'ন্যাশনাল কংগ্রেসে ডেলিগেট' হওয়ার উপযুক্ত। শ্রীযুক্ত নিধিরাম ঘোষ গাড়োয়ান মহাশয় বোধ হয় উক্ত মহাসভার এক মেম্বর; যদি এখনও এ সম্মানের তিনি অধিকারী না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যে কোন না কোন উন্নতিশীল স্থান হইতে 'ডেলিগেট' হইয়া ন্যাশনাল 'কংগ্রেস্' নামক সভায় তিনি উপস্থিত হইবেন, এবং জলদ-গম্ভীর-স্বরে বক্তৃতা করিয়া ভারত-উদ্ধার সমাধা করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত নিধিরাম

নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইল। তখন খুড়া ও ভাইপো ভাগাভাগি করিয়া এবং একের অপূর্ণতা অপরে পূরণ করিয়া, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পেত্নী দেখিয়াছেন, তাহার মূলার মত দাঁত, তাহার পা উল্টা, অঙ্গে শত শত কৃমি, নাকে কথা, ইত্যাদি প্রেতিনীর চিরন্তন বিবরণ তাঁহারা বিবৃত করিলেন। এ সমস্তই তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সুতরাং বিশ্বাস করিবার যো নাই। সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া নিধিরাম বড় ভীত হইল এবং শান্তিপুরের রাস্তায় আর কখন রাত্রে গাড়ি চালাইবে না স্থির করিল। হায়! সুসভ্য নিধিরাম কি ভয়ানক কুসংস্কারের দাস!

সমস্ত কথা শুনিয়া নিধিরাম বলিল,—"হালদার খুড়ো! পথে যখন ভয় পেয়েছ, তখন আর শান্তিপুর গিয়া কাজ নাই; চল বাড়ী যাওয়া যাক।"

খুড়া অধোমুখে রহিলেন। নিধিরামের পরামর্শ তিনি নিতান্ত মন্দ বলিয়া মনে করিলেন না। কিন্তু কর্ম্মানুরক্ত ও ব্যবসায়ানুরাগী ভাইপো এ পরামর্শ ভাল বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"বড় দরকারী কাজ—ফিরিয়া যাওয়া কোন রকমেই হয় না। বিশেষ শান্তিপুর তো আসাই হয়েছে—আর ক্রোশ দুই পথ বইত না। এত দূর আসিয়া ফিরিয়া গেলে লোকে কি বলিবে? ওঠ খুড়ো! দুর্গা দুর্গা বলে, চল, এ পথটুকু শেষ করে ফেলি।"

তখনও ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই। নিধিরাম বলিল,—"যদি যেতেই হয়, তবে রোদ না উঠ্‌তে উঠ্‌তে এই বেলা ধীরে-ধীরে দুর্গা দুর্গা বলে চল্‌তে আরম্ভ কর।"

তখন খুড়া মহাশয় পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং অতি কষ্টে পা বাড়াইতে লাগিলেন ; ভাইপোও তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকিলেন।

নিধিরাম গাড়িতে বসিল, এবং গরুর লেজ মলিয়া গাড়ি চালাইয়া দিল।

শ্যামাচরণ হালদার ও যদুনাথ হালদার দূর সম্পর্কে খুড়া-ভাইপো। কৃষ্ণনগরে যদু হালদারের এক জাঁকাল দোকান আছে ; তাহাতে অনেক লোক ও টাকা খাটে। পূর্ব্বে যদুর পিতা সেই দোকান চালাইতেন। তাঁহার লোকান্তরের পর যদু সেই দোকান চালাইয়া আসিতেছেন। পিতা অতি সামান্য অবস্থা হইতে ঐ দোকান উপলক্ষ করিয়া ক্রমে বেশ দশ টাকার সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এবং উত্তম ঘর-দ্বার করিয়া দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকর্ম্মও সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পুত্র পিতার সকলই বজায় রাখিয়াছেন এবং অনেক বাড়াইয়াছেন। যদু ছেলে ভাল। তাহার বাবুগিরি নাই, অহঙ্কার নাই, আলস্য নাই, অপব্যয় নাই ; বরং কৃপণতা আছে, দেবতাব্রাহ্মণে ভক্তি আছে, পরকালের ভয় আছে,

ইন্দ্রিয়দমন আছে, পরোপকার আছে। সে ময়লা কাপড় পরে, গাম্‌ছা কাঁধে করিয়া বেড়ায়, মাটীতেও বইসে, মুড়ি খায়, তামাক সাজে, ইত্যাদি অনেক অপকর্ম্ম করে। সে ছোট বড় করিয়া চুল কাটিয়া সিঁতে কাটে না, গায়ে কামিজ দিয়া ফুলিয়া বেড়ায় না, চুরুট মুখে দিয়া ইংরাজী ড়ায় না, সুরাসেবন করিয়া মাতলামি করে না, ইত্যাদি বহুবিধ সুকর্ম্ম সে করিতে জানে না। এখনকার কালে যাহাকে লেখা-পড়া বলে, তাহাও সে জানে না। স্কুল-কালেজে সে পড়ে নাই। সে খাতা লিখিতে জানে, জমা-খরচ বুঝে ও মুখে সকল প্রকার দর কষিতে জানে। তা'ছাড়া যদু বেচারা আর কিছুই জানে না। এতক্ষণে আমাদের এই উপন্যাস ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হইবে সন্দেহ নাই। ছি! ছি! এই অপদার্থটার প্রসঙ্গ লইয়া যে উপন্যাসের প্রারম্ভ, তাহা কি মার্জ্জিতরুচি ভদ্র-গণের পাঠ্য হইতে পারে? যদি যদুনাথ নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা খবরের কাগজের 'এডিটারও' হইত, তাহা হইলেও না হয় চক্ষুকর্ণ বুঁজিয়া তাহার কথা পড়া যাইত। আরে ছিঃ! যদু একটা দোকানদার! ভারত-উদ্ধারের কোন সাহায্যই তাহার দ্বারা সম্ভব নহে। দূর করিয়া ফেলিয়া দেও—এ উপন্যাস; এই জন্যই বাঙ্গালা উপন্যাস শিক্ষিত বঙ্গবাসীরা পড়িতে চাহেন না। এদেশের গ্রন্থ-কারেরা পাত্র-নির্ব্বাচন করিতে জানে না; কাহার কথা

বলা উচিত, কহার কথা বলা উচিত নয়, তাহা বুঝে না; অত্যদ্ভুত ঘটনাবলী সমাবেশ করিতে পারে না; এবং বিশেষ কোন শিক্ষা বা উপদেশ দিতে জানে না। সুতরাং উচ্চশিক্ষার সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন, বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ, যদি বা দয়া করিয়া এই উপন্যাসের এতদূর পড়িয়া থাকেন, অতঃপর আর ইহা পাঠ করিবেন না। আমরা বলি তথাস্তু। যাঁহারা যদুনাথের নামে ভয় না পান, তাঁহারাই দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গে আসুন। আর, যাঁহারা যদুনাথের ভারটি সহিতে অক্ষম, তাঁহারা এই সময়ে দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করুন; কারণ, আমরা যদুনাথের প্রসঙ্গ বলিয়াছি, বলিতেছি এবং বলিব।

শ্যামাচরণ যদুর পিতার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। পুত্রও তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিতেন। শ্যাম যদিও যদুর দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী, তথাপি যদু তাঁহাকে আপনার খুড়ার মতই মান্য করিত এবং মুরুব্বি-বোধে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। যদু এ পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই শ্যামের অবাধ্য হইয়া চলে নাই। শ্যামও স্বার্থত্যাগী হইয়া সকল বিষয়েই সতত যদুর শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। এই দুই নিরীহ ব্যবসাদার, কোন বিশেষ লাভজনক সওদার প্রত্যাশায়, টাকা কড়ি লইয়া, অদ্য এই অসময়ে শান্তিপুর চলিতেছেন, এ কথা পাঠকগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমে ঊষা সমাগম হইল। যদি আপনারা দশ জনে পরম্ মনে অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি এই সময়ে একবার প্রভাত-বর্ণনা করিবার চেষ্টা করি। কাজটা কবিদিগেরই একচেটিয়া। আমি কবি নহি, সুতরাং এ কার্য্যের অধিকারী নহি। কিন্তু বামনের কি কখনও চাঁদ ধরিবার সাধ হয় না? পঙ্গুর কি কখনও পর্ব্বত লঙ্ঘন করিবার বাসনা হয় না? তবে এ স্পর্দ্ধা আমারই বা না হইবে কেন? আমার ক্ষমতা না থাকিলেও, অদৃষ্টক্রমে কবি-হৃদয়-সাগর-সমুত্থিত কাব্যসুধা এক আধটু সেবন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি। আমি ইদানীন্তন কালের কীর্ত্তিলোলুপ গ্রন্থকারগণের ন্যায়, সেই কবিগণের ভাবাপহরণ করিয়া এবং তাঁহাদের পরিগৃহীত পন্থায় বিচরণ করিয়া ধন্য হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহাতে কাহারও ক্ষতি আছে কি? যদি কোন পাঠকের এ অদ্ভুত বর্ণনা ভাল লাগে, তাহা হইলে বাহবা পাইবার দাওয়া আমার; আর যদি কাহারও মন্দ লাগে, তাহা হইলে দোষ, কবি মহাশয়গণের; সঙ্কলনকর্ত্তা বোধে আমি ক্ষমার যোগ্য।

সপ্তাশ্ব-সংযোজিত সুরম্য স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া সূর্য্য-

দেব পূর্ব্বাকাশের প্রান্তপ্রদেশে প্রকটিত হইলেন। তদীয় সমাগম সন্দর্শনে সরোবরে কমলিনীকুল বিলাসভরে বিকসিত হইতে লাগিল। মার্ত্তণ্ডদেবের প্রচণ্ড প্রতাপে অন্ধকার পলায়ন পরায়ণ হইয়া গিরিগুহা প্রভৃতি দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ময়ূখমালা মণ্ডিত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল তমোমুক্ত রম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। নিশানাথ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া নীরবে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন; নীরশোভিনী নায়িকা নলিনী নিজপতির বিচ্ছেদে বিয়োগ-বিধুরা বালিকাবৎ মলিনা শ্রীহীনা ও কাতরা হইতে লাগিলেন। বিহঙ্গমগণ নিজ নিজ নীড় পরিত্যাগ করিয়া নভঃপ্রদেশে উড্ডীয়মান হইবার প্রযত্ন করিতে লাগিল, এবং সপ্তস্বর-লহরী-সহকারে সমস্ত প্রদেশ প্রকম্পিত করিতে লাগিল। কুসুমকুল বিকশিত হইয়া সৌরভে সকল স্থান আমোদিত করিতে লাগিল। মধুলোলুপ মধুপকুল গুণ গুণ শব্দে প্রসূনপুঞ্জের সন্নিধানে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। আমরাও এই সুযোগে জবাকুসুম সঙ্কাশ সর্ব্বপাপঘ্ন সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া অদ্ভুত প্রভাত-বর্ণনা পরিসমাপ্ত করিলাম।

শ্যামাচরণ ও যদুনাথ এইরূপ সময়ে ধীরে ধীরে ও নীরবে শান্তিপুরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। সহসা পথপার্শ্ব হইতে যন্ত্রণাব্যঞ্জক একটি অস্ফুটধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাঁহারা উভয়েই চমকিয়া

উঠিলেন। প্রেতিনীর ব্যাপার আবার তাঁহাদের মনে পড়িল কি? যেদিক হইতে শব্দ উত্থিত হইল, তাঁহারা উভয়েই সেই দিকে নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, পথপার্শ্বস্থ গুল্মাদির অন্তরালে বস্ত্রাবৃত এক মনুষ্য-মূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা বড়ই ভীত, বড়ই কুসংস্কারা-পন্ন। তথাপি তাঁহারা সেই শায়িত মূর্ত্তির সমীপদেশে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক নিতান্ত কাতরভাবে সেই জলসিক্ত ঘাসের উপর পড়িয়া আছে। অপরিচিত পুরুষদ্বয়কে সমীপস্থ দেখিয়া স্ত্রীলোকটি বড়ই সঙ্কুচিতা হইল এবং সযত্নে আপনার বদন সমাচ্ছন্ন করিবার যত্ন করিতে লাগিল। শ্যামাচরণ বলিল,—"মা ভয় নাই—আমরা তোমার সন্তান।"

রমণী কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইল। যদু বলিল,—"কি জন্য তুমি এখানে পড়িয়া, বাছা? রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে? এ অসময়ে এখানে কোথা হইতে আসিলে? কোথায় তুমি যাইবে?"

রমণী কোন উত্তর দিল না দেখিয়া, যদু পুনরায় বলিল,—"আমাদের দ্বারা তোমার ভাল ছাড়া মন্দ হইবে না। এখন কি করিলে তোমার উপকার হয়, বল; আমরা যেমন করিয়া পারি, তাহা করিতেছি।"

রমণী উঠিয়া বসিবার প্রযত্ন করিল। অতি কষ্টে

উঠিয়া বসিল। ভাব দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে বড় বেদনা বলিয়া বোধ হইল। রমণী বসিয়া ধীরে ধীরে আপনার অবস্থা বিবৃত করিল, যদুর যাবতীয় প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিল। যতদূর তাহার বলা সঙ্গত ও সম্ভব, তাহাই সে বলিল। তাহার কথা শুনিয়া যদু মনে করিল, স্ত্রীলোকের কি অপূর্ব্ব মধুমাখা কণ্ঠস্বর! তাহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া যদুর মনে হইল, এই নারী কি অলৌকিক রূপরাশি-সম্পন্না। বস্তুতঃ যদুর কোন মীমাংসাই ভুল হয় নাই। সেই সুন্দরীর কণ্ঠস্বর বড়ই কোমল, বড়ই মধুর, এবং যদিও অধুনা কাতরতা-পূর্ণ, তথাপি স্বভাবতঃ হৃদয়দ্রবকর। আর, তাহার রূপরাশি বাস্তবিকই বড়ই মুগ্ধকর। সে ধূলিধূসরিত-কায়া, রুক্ষকেশা, নিরাভরণা, গ্রন্থিযুক্ত মলিন বস্ত্রাবৃতা, এবং নিরতিশয় কাতরা। তথাপি সেই স্বভাব-সুন্দরীর নিরুপম শোভা, সেই সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, ফুটিয়া পড়িতেছে, এবং যেন আপনিই হাসিতেছে। অঙ্গের মলিনতা তাহার সুগৌর বর্ণের ছটা ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। দারিদ্র্য-দুঃখ তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌকুমার্য্য প্রচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না। হৃদয়ের কাতরতা তাহার আয়ত লোচন-যুগলের উজ্জ্বলতা ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না, এবং লজ্জা ও বিষণ্ণতা তাহার শোভা-সমূহ লুকাইতে পারিতেছে না।

যত্নর কৌশলময় প্রশ্নের উত্তরে সুন্দরী স্বকীয় পরিচয় ও অভিপ্রায়াদি যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহার যে যে অংশ প্রয়োজনীয়, তৎসহ আমাদের পরিজ্ঞাত অন্যান্য জ্ঞাতব্য-বিবরণ মিশাইয়া, সঙ্ক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

এই সুন্দরী ব্রাহ্মণ-কন্যা—নাম বিরাজমোহিনী। নিবাস, কৃষ্ণনগরের উত্তর খড়ে নদীর অপর পারে অতি সামান্য এক পল্লীগ্রামে। যুবতীর বয়স অনুমান বিশ বৎসর। অতি শৈশবেই বিরাজ মাতৃহীনা। পিতা ভিন্ন সুন্দরীর আশ্রয়-স্থান ছিল না। কিন্তু তাঁহার পিতাও তিন মাস হইল, লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। পিতা অতি দুঃখী ছিলেন। কোনরূপ কষ্টে স্বষ্টে তিনি আপনার ও কন্যার ভরণপোষণ চালাইতেন। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর হইতে বিরাজের কষ্টের সীমা নাই। বিরাজের উদরে অন্ন নাই, পরিবার বস্ত্র নাই, অঙ্গে তৈল নাই। ভিক্ষা করিয়া, কি কাহারও বাটীতে দাসীবৃত্তি করিয়াও বিরাজের চলিবার উপায় নাই। ভগবান্ দুঃখীনীকে রূপ-যৌবন প্রদান করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। হতভাগিনী যে দুঃখ করিয়া দিন কাটাইবে, তাহার উপায় নাই। যেদিকে সে গিয়াছে, জীবিকার জন্য যে উপায় সে অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাতেই তাহার প্রতিবন্ধক হইয়াছে। হৃদয়হীন পুরুষ-রাক্ষসেরা তাহার সর্ব্বনাশ সাধিবার জন্য নিরন্তর

চেষ্টা করিয়াছে। ঘৃণিত অভিসন্ধি ও কুৎসিত রসিকতার সে যেন লীলাভূমি। সাধ্বী, অতি সন্তর্পণে, অতি সাবধানে, অনন্ত কষ্ট সহ্য করিয়াও এতদিন আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছে; জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবে; ইহাই তাহার সঙ্কল্প।

কিন্তু বিরাজমোহিনী তো সধবা। তাহার হাতের লোহ ও সীমন্তের সিন্দূর-বিন্দু তাহার পতি-বিদ্যমানতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তবে বিরাজের এত কষ্ট কেন? কেন সে অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়-বিহীনা? বিরাজমোহিনী স্বামীত্যক্তা—তাই এ রূপের লতিকা এরূপ মর্ম্মপীড়িতা, বিমলিনা ও হতাদৃতা। বিরাজ নিরপরাধা। তাহার স্বামী বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এক কুলটা কামিনীর প্রেমাসক্ত। বিরাজ সেই পাষণ্ড স্বামীর উদ্দেশে চরণ-পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করে না—শত দুঃখে প্রপীড়িতা হইয়াও এবং আপাত-মনোহর অত্যুজ্জ্বল সুখসমূহ আয়ত্ত-গত করিবার শত সহস্র সহজ উপায় উপস্থিত থাকিতেও, সে কদাপি স্বামী ভিন্ন অন্যচিন্তা করে না। কিন্তু স্বামী, ভ্রমেও বিরাজকে মনে করে না, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের সন্ধান লয় না, এবং বিরাজ আছে কি মরিয়াছে, তাহাও জানে না। শ্বশুরের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াও, হতভাগা একদিনও বিরাজের সংবাদ লয় নাই।

অতি সুকৌশলে শ্যাম ও যদু জানিয়া লইল যে, বিরা-

জের স্বামীর নাম কালিদাস চক্রবর্ত্তী। শান্তিপুরে তাহার আড়ৃত আছে এবং বিশেষ উপার্জ্জন আছে। ঘটনাক্রমে এই কালিদাস চক্রবর্ত্তী শ্যাম ও যদুর বিশেষ পরিচিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার অবস্থা যে ভাল এবং সে যে শান্তিপুরেই বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বেশ্যা লইয়া বাস করিতেছে, তাহাও তাহারা জানে। এই সুন্দরী সেই কালিদাসের পত্নী; ইহাঁর এরূপ কষ্ট দেখিয়া, তাহারা নিতান্ত দুঃখিত হইল। কালিদাসের সহিত তাহাদের কতকটা বাধ্যবাধকতা আছে; সুতরাং বিরাজমোহিনীর সম্বন্ধে বিশেষ সুব্যবস্থা করিতে পারিবে বলিয়া তাহারা আশা করিল।

আমরা ব্যাঘ্রাদিকেই বড় ভয়ানক প্রাণী বলিয়া ভয় করি; কিন্তু মানুষ যে ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা কত ভয়ানক, তাহা বড় ভাবিয়া দেখি না। বাঘের সহিত আমাদের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, সুতরাং সুযোগ পাইলে তাহারা আমাদের ধরিয়া খায়। কিন্তু মানুষ, অনায়াসে সামান্য লাভের জন্য ভাইকে ভিখারী করে; কিঞ্চিৎ রজত নামক পদার্থের লোভে, নিরীহ মনুষ্যের প্রাণসংহার করে; অসংখ্য প্রকার জাল-জুয়াচুরী ও মামলার ফাঁদে ফেলিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে; অকারণে ক্রুদ্ধ হইয়া কত লোককে পুড়াইয়া মারে, সামান্য ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, ছলে বলে কৌশলে কুল মজাইয়া দেয়; একটু সুখের

লোভে সমাজ হাহাকার ও আর্ত্তনাদে পরিপূরিত করিয়া দেয়; এবং কারণে অকারণে বসুন্ধরাকে শোকের পুরী করিয়া তুলে। এই কাতরা দুঃখিনী কামিনীর কথা একবার বিচার করিলেই তো সকল তর্ক মিটিয়া যাইবে। একজন অতি ঘৃণিত পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সুখসম্ভোগ করিতেছে, তাহার সেই অবৈধ ব্যবহার-হেতু, আর এক নিরপরাধা সুন্দরী দুর্ব্বহ দুঃখভার বহন করিয়া মরণাপন্না হইতেছে। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া বল দেখি, মানব নামক শ্রেষ্ঠ জীব এবং ব্যাঘ্রাদি নিকৃষ্ট পশু, ইহার মধ্যে অপরাধী কে বেশী? বিরাজমোহিনী, এই বয়সে জগতের যাহা দেখিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছে, মানুষ-পশুই সকল পশুর অপেক্ষা ভয়ানক। তাই সে দুঃখিনী মানুষ-পশুর চক্ষে না পড়িবার আশায় এবং বাঘের হাতে পড়াও ভাল মনে করিয়া দিনে পথে বাহির হয় নাই। অন্ধকারে আপনার কালরূপ লুকাইয়া অভাগিনী পথ চলিতেছে।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে, পিতার সহিত, সে আর একবার শান্তিপুরে স্বামীর নিকট আসিয়াছিল। গুণময় স্বামী তাহার সেই বিকাশোন্মুখ অনুপম রূপরাশি, সেই কোমল-স্বভাব, সেই অতুলনীয় মধুরতা দেখিয়াও, তাহাকে চরণে স্থান দেন নাই; দুইটা মিষ্ট বাক্যেও তাহাকে তুষ্ট করেন নাই। তাহার পোড়া পেট কিরূপে বুঝিবে, তাহার

কোন ব্যবস্থা করেন নাই। দুঃখিনী বালিকা সেই দুর্ব্যবহার-রূপ দারুণ শক্তিশেল বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছিল এবং এখনও করিয়া আসিতেছে। বয়সের পরিপক্কতার সহিত তাহার সহিষ্ণুতার পরিপক্কতা হইয়াছে এবং আত্মত্যাগ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু রাগ বা কষ্টে, অভিমানে বা যাতনায়, তাহার মনের বিকৃতি একদিনও হয় নাই। স্বামী তাহাকে দেখিলে বিরক্ত হন, তাহার ছায়াও তাঁহার বিষ লাগে, এ হৃদয়-বিদারক কথা সে এক দিনও ভুলে নাই; সুতরাং তাঁহার সম্মুখে সে আর আসিবে না এবং তাঁহাকে কোন প্রকারে উত্ত্যক্ত করিবে না, ইহাও তাহার স্থিরসঙ্কল্প ছিল। কিন্তু ভগবান যখন মারেন, তখন কেহই রাখিতে পারে না। নদীতে যখন ভাঙ্গন ধরে, তখন ভালমন্দ কিছুই বিবেচনা করে না। হতভাগিনীকে বিধাতা চূর্ণীকৃত করিয়া পরীক্ষা করিতে বসিয়াছেন কি না—তাহার একটু ক্ষুদ্র অভিমানও তিনি রাখিবেন কেন? বিশ্বনিয়ন্তা এমনই কাণ্ড ঘটাইলেন যে, ধর্ম্ম যদি বজায় রাখিতে হয়, সৎপথে যদি থাকিতে হয়, তাহা হইলে সেই স্বামীর সাহায্যগ্রহণ ব্যতীত বিরাজমোহিনীর আর উপায়ান্তর থাকিল না। স্বামীর দাসীর দাসী হইয়াও যদি সে জীবিকা-পাত করিতে পারে, তাহা হইলেও সে এখন চরিতার্থ হইবে। লোকে ভোজন-শেষে কুকুরকে যেমন দেয়, স্বামীর ভোজনাবশিষ্ট সেইরূপ

মুষ্টিমেয় অন্ন খাইয়া থাকিতে পারিলেও, সে আপনাকে এখন ধন্য জ্ঞান করিবে। যদি তাহাও না জুটে? সহৃদয় স্বামী যদি ততটুকু অনুগ্রহও করিতে সম্মত না হন? ইহাও কি কখন সম্ভব? স্বামী নিতান্ত হৃদয়হীন হইলেও পরিণীতা পদাশ্রিতা পত্নিকে এতটুকু অনুগ্রহ না করিয়া থাকিতে পারে কি?— যদি দুরদৃষ্ট-বশতঃ বিরাজমোহিনী, স্বামীর এতটুকু করুণা-লাভও না করিতে পারে, তাহা হইলে সে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিয়া সকল জ্বালার শেষ করিবে স্থির করিয়াছে।

এত পথ চলা বিরাজমোহিনীর কখন অভ্যাস নাই; সুতরাং তাহার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। গতরাত্রি হইতে পায়ের বেদনায় ও শরীরের অবসন্নতায় সে নিতান্ত কাতর হইয়া এই স্থানেই পড়িয়া আছে। রাত্রিতে একাকিনী গাছতলায় পড়িয়া থাকিতে তাহার বড় ভয় হইয়াছিল। দুইজন পথিক কথা কহিতে কহিতে শান্তিপুরের দিকে যাইতেছিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাদিগকে সজ্জন বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল। তাহাদের নিকট বিরাজমোহিনী কিছু অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু দয়া করা দূরে থাকুক, বিরাজমোহিনীর দুরদৃষ্টক্রমে তাহারা ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

যদু একবার শ্যামের মুখের দিকে চাহিল, শ্যাম একবার যদুর মুখের দিকে চাহিল। এই সজীব সুন্দরী

ব্রাহ্মণী যে প্রেতিনী নহেন, ইহা তাহারা বুঝিয়া দেখিল। গত রাত্রির প্রেতিনী-ঘটিত ব্যাপারের এতক্ষণে মীমাংসা হইয়া গেল। তখন শ্যাম হাঁপ ছাড়িয়া বলিল,—"মা! সে আমরাই। না বুঝিতে পারাতেই রাত্রিতে আমরা আপনারাও কষ্ট পাইয়াছি, তোমাকেও কষ্ট দিয়াছি। এখন বেলা হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের শান্তিপুরে বড় দরকারী কাজ আছে। দেরি হইলে বড়ই ক্ষতি হইতে পারে। বল, এখন আমরা তোমার কি করিব?"

যদু বলিল,—"খুড়া! কাজ আমাদের বড়ই দরকারী, বিলম্বে বিশেষ ক্ষতি হইবার কথা। কিন্তু যত ক্ষতিই হউক, আর যত বিলম্বই হউক, এ ব্রাহ্মণ-কন্যাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া কোন মতেই হইতে পারে না।"

দারুণ ব্যবসাদার, ঘোর বিষয়ী, নিতান্ত কৃপণ এবং যৎপরোনাস্তি অসভ্য ও অশিক্ষিত যদু, যে ব্যবসায়ের জন্য জীবনকে বিপন্ন করিয়া শান্তিপুরের দিকে ছুটিতে-ছিল, তাহার কথা ভুলিয়া গেল। বিপন্না কুলকামিনীর যথাসম্ভব সাহায্য করাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল! সে তখন চাদর ভিজাইয়া জল আনিল, এবং বিরাজকে মুখে দিতে বলিল। পরে নানাপ্রকারে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ ও আশ্বস্ত করিয়া বলিল,—"এক্ষণে

ধীরে ধীরে পায় পায় হাঁটিয়া আপনি আমাদের সঙ্গে শান্তিপুর যাইতে পারিবেন কি? পথ বেশী নহে।"

বিরাজমোহিনী বলিলেন,—"আমার দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই, হাঁটিব কি প্রকারে? তোমাদের দরকারী কাজ আছে, তোমরা যাও। বেলা হইয়া পড়িল। তোমরা কাছে ছিলে বড়ই সাহস ছিল। এখন মধুসূদন আবার কি বিপদে ফেলিবেন, বলিতে পারি না।"

যদু বলিল,—"না না—আমরা আপনাকে এখানে, এ অবস্থায় ফেলিয়া কখনই যাইব না। দেখিতেছি, আপনার শরীর যেরূপ কাতর হইয়াছে, তাহাতে এক পা চলিতেও আপনি পারিয়া উঠিবেন না। দেখি—আর কোন উপায় হয় কি না।"

এই সময়ে দূরে গোযানের স্খলিত চক্রনির্ঘোষ শুনিয়া যদু বলিল,—"একখান গাড়ি আসিতেছে বোধ হয়। দেখি, উহাতে আপনার যাওয়ার কোন সুবিধা হইতে পারে কি না।"

বিরাজমোহিনী বলিলেন,—"কিন্তু গাড়িতে চড়িতে হইলে তো ভাড়া দিতে হইবে, আমার তো একটিও পয়সা নাই।"

যদু হাসিয়া বলিল,—"সে জন্য চিন্তা নাই। গাড়ির যে ভাড়া লাগিবে, তাহা আমরা আপনার স্বামীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লইব।"

বিরাজমোহিনী বলিলেন,—"আমি একমুষ্টি অন্নের নিমিত্ত ভিখারিণী হইয়া যাইতেছি। আমি গাড়ি করিয়া গেলে তিনি হয় তো বড়ই রাগ করিবেন।"

যদু উত্তর দিল,—"তিনি রাগ করিতে না পারেন, এমন কৌশল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া লইব।"

গাড়ি নিকটস্থ হইল। গাড়িখানি কৃষ্ণনগরে সোয়ারি লইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ছতরি আঁটা এবং খড় বিছান ছিল। সুতরাং যদু যাহা ভাবিতেছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাহাই হইল। যদু তাহার সহিত ভাড়া চুকাইয়া ফেলিল, এবং বিরাজমোহিনীকে সাবধানে সেই গাড়িতে উঠিতে বলিল। অতি কষ্টে বিরাজ গাড়ির মধ্যে বসিলেন।

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল। যদু ও শ্যাম ধীরে ধীরে গাড়ির পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন।

মূর্খ যদুও একটা বেশ কাজ করিয়া ফেলিল। হায় মূর্খতা! অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা তুমিই শ্লাঘ্যনীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কালিদাস চক্রবর্ত্তী কদাকার পুরুষ। তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিস। লোকটা একহারা লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ এবং লাবণ্য-বিহীন। তাঁহার দাঁত উঁচু, মুখে বসন্তের দাগ, শূকরের লোমের মত গোঁজ গোঁজ গোঁফ, বিরল কেশ, শিরাযুক্ত কলেবর, রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র চক্ষু প্রভৃতি অনেক লক্ষণ মিলিয়া তাঁহাকে অত্যদ্ভুত শ্রীযুক্ত করিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় জাত্যংশেও ভাল নহেন, এজন্য অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। বিরাজমোহিনীর পিতা নিতান্ত দরিদ্র ; সমান ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিতে যে ব্যয়ভূষণের প্রয়োজন হয়, তাহা তাঁহার সাধ্যাতীত ; এজন্য নিরুপায় হইয়া তিনি দুহিতারত্নকে এই সৎপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

কালিদাসের বিদ্যাসাধ্যও কিছু নাই। কিন্তু তাঁহার সময় ভাল ; কারবারে তাঁহার আয় বেশ। এই স্থলে কর্ম্মাভিমানী, বিদ্যাভিমানী, ক্ষমতাভিমানী, জ্ঞানাভি-মানী,মহাশয়েরা ক্রোধভরে হয় তো আমাকে গলা টিপিয়া মারিতে আসিবেন। তাঁহারা বলিবেন, যাহার বুদ্ধি-বিদ্যা নাই, যাহার কৃতিত্ব বা দক্ষতা নাই, এ জগতে সে কৃথ-

নই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কালিদাসের কারবার যখন চলিতেছে ভাল, তখন অবশ্যই তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা আছে সন্দেহ নাই। কথাটা শুনিতে ভাল, কিন্তু বড় কাঁচা। নব্য সভ্য ভব্য লোকের মুখেই এ কথা শোভা পায়; বুড়া পাকা পোক্ত লোকে এরূপ কথা মুখে আনে না এবং উহাতে সায় দেয় না। একটা সোজা দৃষ্টান্ত দেখাই। আধ ঘণ্টার মধ্যে ওলাউঠা হইয়া সকল লীলা-খেলার শেষ হইবে কি না, ইহা যাহারা জানে না, সেরূপ পীড়া উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার করিতে পারে না, এবং তাদৃশ রোগ প্রতিরোধ করিবার কোন ব্যবস্থা জানে না, তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও কৃতিত্বের অহঙ্কার বড়ই হাস্যজনক। মানুষ ছুটাছুটি করে, হাঁপা-হাফি করে, আর অহঙ্কারে গা তুলাইতে তুলাইতে ভাবে আমি সব করিতেছি। কিন্তু যিনি করিবার. তিনি যাহা করিতেছেন, মানুষ শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার একচুল এদিক ওদিক করিতে পারিতেছে না। তথাপি ছার অভিমান তো যায় না। যাহা হউক, আমরা বলি-তেছি. মূর্খ অকর্ম্মণ্য কালিদাসের বিষয়-কর্ম্মের বেশ উন্নতি।

কালিদাস যে বাটী প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা সুশ্রী, সুদৃঢ় এবং সুবিস্তৃত। তৈজস ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী কালি-দাস মন্দ করে নাই। কিন্তু কালিদাসের উপপত্নী তরঙ্গিণী

তৎসমস্ত নিজের বলিয়া ব্যক্ত করে। কালিদাসের নগদ টাকাকড়ি বড় নাই। তাহার উপপত্নীর অলঙ্কার-প্রতিকার অনেক। কালিদাস তাহা নিজেরই বলিয়া মনে করে। কালিদাসের ব্যবসায়ে বিস্তর টাকা খাটিতেছে। তাঁহার আড়ত বিশেষ বিখ্যাত, এবং সে জন্য তিনিও বিখ্যাত। ধন যাহার আছে, সে যদি সমাজ-কলঙ্ক মানব-প্রেত হয়, তথাপি তাহার সম্ভ্রমের ব্যাঘাত ঘটে না। সেই জন্য কালিদাসের ন্যায় ব্যক্তিরও মান-সম্ভ্রমের অভাব ঘটে নাই। হায়! রজতচক্র! এ সংসারে তুমিই অতুলনীয়। অয়ি অঘটন-ঘটন-পটীয়সি মুদ্রে! তুমি যাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছ, সে মূর্খ হইলেও পণ্ডিত, অজ্ঞ হইলেও বিজ্ঞ, দারুণ দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইলেও পরম সাধু।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। কালিদাস আহারাদি শেষ করিয়া সুবিস্তৃত কক্ষে খাটের উপর বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। কালো কুচকুচে একটি হুঁকা তাহাতে আমের পাতার একটি নল। কালিদাস তামাকের ধূমের সহিত পান চিবাইতে চিবাইতে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার আনন্দের অঙ্গহীন হয় নাই; কারণ সম্মুখে তাঁহার সকল আনন্দের কেন্দ্রস্বরূপা তরঙ্গিণী দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কি বলিতেছেন। হায়! পাপীয়সীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে লেখনী কলঙ্কিত করিতে হইতেছে। যাহাকে ঘৃণার

সহিত সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহার নাম কেবল লজ্জা ও নিন্দার সহিত সম্বদ্ধ, যাহার পরিচয় কেবল অপরিহার্য্য কলঙ্কই সঙ্ঘোষিত করে, যাহার চরিত্র কেবল অপরিসীম অধঃপতনের পরিচায়ক, তাহার প্রসঙ্গ লিখিতেও কষ্ট ও লজ্জা উপস্থিত হয়। কিন্তু সংসারে কিছুই অনর্থক নহে—পাপেরও সার্থকতা আছে। পাপ নহিলে পুণ্যের মহিমা পরিস্ফুট হয় না, অন্ধকার নহিলে আলোকের গৌরব হয় না, দুঃখ নহিলে সুখের মর্য্যাদা হয় না। সংসারে বিরোধী ব্যাপার সমূহ পাশাপাশি চলে এবং সঙ্ঘর্ষণ ঘটাইয়া যাহা দুর্ব্বল, যাহা নিন্দিত. যাহা ঘৃণার্হ, যাহা অনাদৃত, তাহা হয় ভাঙ্গিয়া ফেলে. না হয় তাহা আপনার লঘুতা বুঝিয়া মস্তক নত করে. এবং প্রতিপক্ষের মহিমা ও গৌরব জ্বলন্তভাবে পরিব্যক্ত করিয়া দেয়। অতএব যে ক্ষেত্রে বিরাজমোহিনী আছেন. সে ক্ষেত্রে তরঙ্গিণীর আবির্ভাব অসম্ভব, অসঙ্গত বা অনর্থক নহে। সুতরাং তরঙ্গিণী যখন দেখা দিয়াছে, তখন তাহার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলে চলিবে কেন ?

তরঙ্গিণীর বয়স ত্রিশ ছাড়াইয়াছে। বেশ মোটা-সোটা, শ্যামবর্ণা, বিলোল কটাক্ষ-শালিনী, হাসিভরা বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। বুদ্ধিহীন কালিদাস যে এরূপ বিলাসিনীর ক্রীড়াপুত্তলী ও ক্রীতদাস হইয়াই থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? কালিদাস জানে, তরঙ্গিণীর মত

রূপসী, বুদ্ধিমতী, সাধু-স্বভাবা, উদার হৃদয়া, সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা নারী বসুন্ধরায় আর কখন জন্মপরিগ্রহ করেন নাই। বলা বাহুল্য যে কালিদাস তরঙ্গিণীর নিতান্ত অনুগত। তরঙ্গিণী মনে করিলে কালিদাসকে নাচাইতে পারে, হাসাইতে পারে, কাঁদাইতে পারে। কালিদাস তরঙ্গিণীর পোষা বাঁদর। তরঙ্গিণীর মতেই কালিদাসের মত। তরঙ্গিণী যাহা ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করে, বেদব্যাসের অপেক্ষা সার কথা জ্ঞান করিয়া, কালিদাস সেই মতেই চলে। তরঙ্গিণী যখন হাসে, কালিদাস কোন কারণ বুঝিতে না পারিলেও, তখন হাসিয়া থাকে। সকল বিষয়েই সৌভাগ্যবান কালিদাস, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির অপেক্ষা ধর্ম্মশীলা এই কামিনীর মুখাপেক্ষী হইয়া চলে।

বাস্তবিক তরঙ্গিণী লোকটা কেমন? কালিদাস রাগই করুন, আর যিনি যাহাই বলুন, আমরা তরঙ্গিণীর প্রশংসা-সূচক কোন কথাই বলিতে পারিব না। আমরা যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তরঙ্গিণী যৎপরোনাস্তি মন্দ লোক। তাহার সম্বন্ধে যাহা যাহা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি। কালিদাস বাটী হইতে বাহির হইয়া আড়তে গেলে হারাধন নামে এক তিলিনন্দন তরঙ্গিণীর নিকট প্রায় প্রতিদিনই আইসে এবং তিন চারি ঘণ্টা তরঙ্গিণীর সহিত

একত্র থাকে। কালিদাস এ ব্যক্তির গমনাগমনের কথা জানেন। লোকে বিশ্বাস করে, হারাধন ধর্ম্মশীলা তরঙ্গিণীর প্রেমিক। কালিদাসকে তরঙ্গিণী বলিয়াছে, হারাধন তাঁহার ধর্ম্মভাই। সুতরাং কালিদাস যত্ন করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, এবং তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতাও করিয়াছেন। হারাধনের যাতায়াত, আহার-ব্যবহার প্রকাশ্য-রূপেই চলে। হারাধন তরঙ্গিণীর ধর্ম্ম-ভাই এবং কালিদাসের পরম আত্মীয়। তরঙ্গিণী নানা ছল করিয়া নূতন বাসন, শয্যা, অন্যান্য দ্রব্য খরিদ করায়। কিন্তু ব্যবহারকালে কালিদাস পুরাতন সামগ্রীই ব্যবহার করেন। লোকে বলে, তরঙ্গিণী দ্রব্য সামগ্রী সততই মাসীর বাটীতে চালান করে। চাল, ডাল, নূন, তেল, ঘি, ময়দা কিছুই বাদ যায় না। কালিদাসের গত কার্ত্তিকমাসে বড় জ্বর হইয়াছিল। তিনি নিরন্তর বমি করিয়া ঘর ভাসাইয়াছিলেন, এবং ক্রমশঃ উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিলেন। তরঙ্গিণী সে সময় তাঁহার নিকট প্রায়ই আসিত না। যদি বা কখন একবার মুখে কাপড় দিয়া আসিত, তখনই চলিয়া যাইত। বলিত,—'কালিদাসের কষ্ট দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়; সেই জন্যই আমি ও ঘরে যাই না। যদি বা যাই, তবে কান্না আটকাইবার জন্য মুখে কাপড় দিয়া থাকি।' হারাধন সে সময়ে তরঙ্গিণীর সহিত দিবারাত্রি আত্মীয়তা করিতেন। তরঙ্গিণী বলিত,—"এমন বিপদের সময় সাহায্য

করে এমন একজন আপনার লোক কাছে না থাকিলে চলে কি ?” কালিদাস বেলা বারোটার সময় স্নানাহার করেন। তরঙ্গিণী বেলা নয়টার মধ্যে স্নান শেষ করিয়া একপেট রসগোল্লা খাইয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু কালিদাসকে বলে, ‘স্নানের পর জল না খাইলে পিত্তি পড়ে বটে, কিন্তু কেমন পোড়া মন, তুমি বাড়ী আসিয়া স্নান আহার না করিলে, দুইটা চাউল মুখে দিয়া জল খাইতেও আমার ইচ্ছা হয় না।’ তরঙ্গিণী পাঁচ ভরির গহনা করিয়া এগার ভরির দাম আদায় করিত, জোড়ায় জোড়ায় নূতন কাপড় কিনাইয়া দোকানে বিক্রয় করিত, ইত্যাদি নানা তুচ্ছ বিষয়ে বাজে লোকে তরঙ্গিণীর নানাপ্রকার কুৎসা গায়িত। ইহাতেই তরঙ্গিণীর যতদূর যিনি বুঝিতে ইচ্ছা করেন বুঝুন —আমরা কিন্তু আর কোন কথা বলিব না; কারণ তরঙ্গিণী বড় মুখরা—ঝগড়ায় তাহাকে কেহ আঁটিতে পারে না।

কালিদাসের এই বিলাস-মন্দিরে, তরঙ্গিণীর এই লীলাস্থলে আজি চারিদিন হইল, বিরাজমোহিনী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যদু ও শ্যাম তাহাকে সঙ্গে আনিয়া এখানে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, এবং কালিদাস অনেক বিবেচনার পর অর্থাৎ তরঙ্গিণীর অনুমতি পাওয়ার পর, তাহাকে বাটীতে থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যদু ও শ্যাম ভাবিয়াছে তাহাদেরই আগ্রহে চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্ত্রীকে গৃহে লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের প্রসন্নতার পরিসীমা নাই।

চক্রবর্ত্তী কালিদাস বিবেচনা করিয়াছেন, কাজটা মন্দ হয় নাই। দশজন লোক এই বিষয়টার জন্য দোষে বটে; তা থাক না কেন, একদিকে পড়িয়া—দুটা ভাত দিলেই সকল গোল চুকিল। কিন্তু বিরাজমোহিনীকে চক্রবর্ত্তীর গৃহে স্থান দেওয়ার মূল কারণ তরঙ্গিণী; সে এ উপলক্ষে খুব বাহাদুরী করিয়াছে। এ কথা তাহার নিকট পড়িতেই সে বলিয়াছে,—'তা আর এতে অন্য মত করো না —কোন বাদ-বিচার করো না—তাঁকে হাত ধরে গাড়ির ভিতর হইতে উঠাইয়া আন। ছিঃ এও কি ভাল দেখায়?' তরঙ্গিণী সন্তুষ্টমনে সম্মতি দিল—কালিদাস অবাক্ হইলেন। কিন্তু তরঙ্গিণী যখন আজ্ঞা দিয়াছে, তখন তাহার অন্যথা করিতে তাঁহার সাধ্য নাই। বিরাজমোহিনীকে আনিবার জন্য কালিদাসের হাত ধরিতে হইল না। তরঙ্গিণীর দাসী গিয়া বলিল,—"এসো গো ভাল মানুষের মেয়ে, বাড়ীর মধ্যে এসো।" বিরাজমোহিনী হাতে স্বর্গ পাইল। সে এত সহজে স্বামীর গৃহে স্থান পাইবে, ইহা স্বপ্নেও আশা করে নাই। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। সে স্বামীকে একবার দেখিবার অভিপ্রায়ে মুখ তুলিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না—দেখিল তরঙ্গিণীর ঈষৎ হাস্যময় মুখ—আর তাহার হিংসাব্যঞ্জক বিশাল লোচন। বিরাজ সভয়ে মস্তক নত করিল। সে উদ্দেশে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গৃহমধ্যস্থা হইল।

আজন্মদুঃখিনী বিরাজমোহিনী বড় আশা করিয়া আর একবার স্বামীর গৃহে আসিয়া যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাহা তাহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া আছে। সুতরাং এবার এত সহজে অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় সে আপনাকে অসামান্যা ভাগ্যবতী এবং বর্ত্তমান ঘটনা অপরিসীম সৌভাগ্যোদয়ের পূর্ব্বসূচনা জ্ঞান করিল। বিধাতঃ! দুঃখিনাকে অধিকতর মনকষ্ট দিয়া তাহার এ সাধের সৌধ বিচূর্ণিত করিও না।

এখন তরঙ্গিণী যে এত বড় উদারতা দেখাইয়া ফেলিল; ইহার কারণ কি? এত বড় মহৎ কার্য্য কুটিলহৃদয় হইলে করিয়া উঠিতে পারিত কি? তরঙ্গিণী বড় চতুরা; সে অনেক ভাবিয়াই এ কাজ করিয়াছে। আসল কথা এই, দশ কুড়ি দিন হইতে তাহার পাচিকা ছাড়িয়া গিয়াছে। এই কয় দিন পাক করিয়া তাহার ননীর অঙ্গ গলিয়া যাইতেছে। সে ভাবিল, এ মাগী তো এখন রাঁধুক, তার পর বুঝিয়া কাজ করিলেই হইবে। মাহিনা লাগিবে না—দু'টা খেতে পেলেই চলিবে। কালিদাসকে যেরূপ মোটা শিকলে সে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহা কাটিয়া যে কালিদাস হাঁড়িচাঁচা পলাইবে, তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহার সূত্র মাত্র বুঝিতে পারিলেই সে তখনই সর্ব্বনাশ বাধাইয়া দিবে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল, ভালমানুষী দেখাইবার—কালিদাসের পায়ের বাঁধন

আর একটু কসিয়া আনিবার এমন সুযোগ ছাড়া হইবে না। সুতরাং বিরাজমোহিনী আশ্রয় পাইল। তরঙ্গিণী এক ঢিলে দুই পাখী মারিল।

বিরাজমোহিনী অতি সন্তোষের সহিত হাঁড়ি ধরিয়াছে। দরিদ্রের কন্যা—গৃহকর্ম্মে সে বিশেষ পটু। সে সচ্ছন্দে রন্ধনাদি নির্ব্বাহ করিতেছে। স্বামীর গৃহে স্থান পাইয়াও স্বামীর অন্ন খাইতে পাইয়া সে চরিতার্থ হইয়াছে। সে পরমানন্দে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করে, নীচের একটী ঘরে শুইয়া সন্তুষ্টমনে রাত্রি কাটায়, এক একবার যখন স্বামীর কাছে ভাতের থালা পৌঁছিয়া দিতে হয়, তখন সে স্বামীকে দেখিতে পায়। ইহাই তাহার পরম আনন্দ। এই আনন্দে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলে সকল দিকই চলিত ভাল। কিন্তু মানুষের চিত্ত উত্তরোত্তর অধিক সুখের জন্য চিরদিন ব্যাকুল! বসিতে পাইলে শুইতে অনেকেই চায়; হাত গিলিতে গিলিতে বাহু গেলার চেষ্টা অনেকেই করে। দুঃখিনী বিরাজমোহিনীকেও এইরূপ একটা ভয়ানক লোভের হাতে পড়িতে হইল। স্বামীর সহিত একটা কথা কহার লোভ সে কোন মতেই সংবরণ করিতে পারিল না। কোন সুযোগে, কখন কিরূপে স্বামীর সহিত একটা কথা কহিবে ইহারই উপায় সে চিন্তা করিতে লাগিল। তরঙ্গিণীকে সে যমদুতের ন্যায় ডরাইত। তরঙ্গিণী একদিনও তাহাকে একটি দুর্ব্বাক্য বলে নাই, তাহার সহিত একটীও

অপ্রিয় ব্যবহার করে নাই। তথাপি বিরাজ তাহাকে দেখিলেই আতঙ্কে জড়সড় হইত, তাহার আওয়াজ শুনিলেই ভয়ে আড়ষ্ট হইত, যে দিকে তরঙ্গিণী আছে, সেদিকে যাইতে হইলে তাহার পা কাঁপিত ও বুক দুড়দুড় করিত। তরঙ্গিণী বাঘ নয়, ভালুক নয়, অথবা বিরাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ভয়ের কারণস্বরূপ পুরুষ মানুষও নয়। তবে বিরাজ তাহাকে এত ভয় কেন করিত? ভয় ও ভক্তি, বিরক্তি ও স্নেহ, এ সকল ভাব বোধ হয় সকল সময়ে বাহ্য-ব্যবহার সাপেক্ষ নহে। হৃদয়ের ভাব অনেক সময়ে এ সকল আকর্ষণ বিকর্ষণ জন্মাইবার কারণ। এই তরঙ্গিণী-রূপা রায়বাঘিনী সর্ব্বদা বিরাজের স্বামীর পাশে পাশে। তরঙ্গিণীর সমক্ষে কথা বলা দূরে থাক্ ভয়েই বিরাজ ঘুরিয়া পড়ে। তবে এমন কড়া পাহারার মধ্যে দুঃখিনী স্বামীর সহিত কথা কহে কখন?

আজি দৈবাৎ বিরাজের কপালক্রমে একটা কথা কহিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। আজি যখন বিরাজ স্বামীর কাছে ভাত দিতে গিয়াছিল, তখন তরঙ্গিণী সেখানে ছিল না; সে ঘৃত আনিবার জন্য ভাঁড়ার ঘরে গিয়াছিল; সুতরাং সুবিশ্বাসী কালিদাস তখন পাহারা-পরিশূন্য। এই তো সুন্দর সুযোগ বটে! ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সুযোগ আর ঘটিবে কি? বিরাজ ভাতের থালা রাখিয়া হাত ধুইয়া ফেলিল। তাহার গা থর থর করিয়া কাঁপি-

তেছে। কি বলিবে, তাহা সে জানে না। দুঃখিনী গলায় কাপড় দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চুপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আমাকে একটু পায়ের ধূলা দিয়া আপনি কৃতার্থ করুন।"

হতভাগা কালিদাস কোন উত্তর দিল না। নির্ব্বোধ হইলেও, সে বুঝিতে পারিল, তাহার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছে। সেই কম্পিত কোমলস্বর তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল কি? ভগবান জানেন। সে একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। দেখিল, অশ্রুভারাবনত নয়না স্বরসুন্দরী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। সে কোন কথা বলিল না—বোধ হয় তাহার সাহস হইল না। কিন্তু সে পা বাড়াইয়া দিল। বিরাজ সযত্নে পরিধান-বস্ত্রের প্রান্তভাগে সেই চরণ মুছাইয়া লইয়া আপনার মস্তকে সেই বস্ত্রাংশ স্থাপন করিল। তখনই তরঙ্গিণী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। বিরাজ সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, চোরের ন্যায় অন্য দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। হায়! সে আপনার ধনে আপনি চোর। কালিদাসও ভয়ে একটু জড় সড় হইল। চরিত্রহীনের সৎসাহস কখনই থাকে না।

এই অতি ক্ষুদ্র ঘটনাটুকুর এক চুলও তরঙ্গিণীর অপ্রত্যক্ষ ছিল না; সে জানালার ফাঁক দিয়া সমস্তই দেখিয়াছে। বিরাজমোহিনীর এই দুষ্কর্ম্মের অতি গুরুতর শাস্তি দিতে সে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছে। বিরাজ, আজন্ম-

দুঃখিনী, কেন তুমি এ দুরাশা-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলে? কেন তুমি আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিলে? ক্ষুদ্র তুমি, কেন চাঁদে হাত দিতে চাহিয়াছিলে?

তরঙ্গিণী ঘরে প্রবেশ করিলেন। যেন কিছুই জানেন না, কিছুই বোঝেন না—মাঝের মাছখানি। সে সমান হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে লাগিল। কালিদাসকে এটা ওটা খাইবার জন্য সমান পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। ছোট লোকের মত ছোট চালে সে একটুও চলিল না।

কালিদাস একটু সঙ্কোচের সহিত যেন চোর চোর-ভাবে, আহার সমাধা করিয়া, খাটের উপর বসিলেন। তরঙ্গিণী তাঁহাকে পান দিল, দাসী তাঁহাকে তামাক দিল। কালিদাস তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন,—"আজি আমাকে এখনই আড়তে যাইতে হইবে; কয়েকটা বেপারী আসিয়াছে।"

বেপারী আসাটা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আজি তিনি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, না জানি তাহার জন্য কি তুমুল কাণ্ড বাধিবে ভাবিয়া বড়ই উৎ-কণ্ঠিত হইয়াছেন। এজন্য আপাততঃ তরঙ্গিণীর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল। যে অপরাধী, সে নিতান্ত জনহীন স্থানে ও সুন্দর সুযোগে চৌর্য্যবৃত্তি সমাধা করিয়াও, সতত মনে করে, কে বুঝি দেখিয়াছে, কে বুঝি আসিতেছে, ঐ বুঝি ধরিল। আজি কালিদাসেরও

সেই অবস্থা। কালিদাস লুকাইয়া, পরিণীতা সহধর্ম্মিণীকে পদধূলি দিয়া যে দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার ভয়ে তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত।

তরঙ্গিণী একটু মুখ ভার করিয়া বলিল,—"তা হবে না। কাল তোমার মাথা ধরিয়াছিল, আজি এখনই তোমাকে কোন মতে যাইতে দিব না। আসুক না কেন হাজার বেপারী। তোমার শরীর আগে, না টাকা আগে। এত টাকার ভাবনা ভাবিবার দরকার নাই। আড়ত না চলে না চলিবে। আমাদের দুটো পেট গাছতলায় থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইলেও চলিয়া যাইবে।"

রে ক্ষুদ্র কালিদাস-পতঙ্গ। এ উজ্জ্বল সম্মোহন আকর্ষণকারী আলোকে তুই যদি না পড়িবি, তবে আর পড়িবে কে? কিন্তু আগুনে যখন পড়িতেছ, তখন পুড়িয়া মরাই তোমার অপরিহার্য্য ব্যবস্থা। পুড়িয়া মরিবে জানিয়াও, পতঙ্গকুল আগুনের চারিদিকে ঘুরিতে ছাড়ে না। পুড়িয়া মরার পর তবে তাহাদের বহ্নিতৃষ্ণা নিবারিত হয়। যতক্ষণ পুড়িয়া না মরিতেছ, ততক্ষণ কালিদাস, বহ্নিলোলুপ পতঙ্গের ন্যায় তরঙ্গিণীরূপা পাবকশিখায় চারিদিকে মনের সাধে ঘুরিয়া বেড়াও। কিন্তু মৃত্যু এ লোভের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার। তুমি মূর্খ কালিদাস, কত পণ্ডিত, সুবিজ্ঞ, সুবোধ, সুবিচারক কালিদাস-পতঙ্গও এ তৃষ্ণা সংবরণ করিতে পারে নাই; তবে তোমাকে দোষ দিই কেন?

ঘুরিয়া বেড়াও কালিদাস—ঐ উজ্জ্বল আলোকের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াও—ঐ সুদর্শন পাবকের চারিদিকে ভোঁ ভোঁ করিয়া পরিভ্রমণ কর—ঐ উন্মাদকারী কৃতান্তকে পরম সুখের নিকেতন জ্ঞানে উহাতে ঝাঁপ দিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হও।

তরঙ্গিণীর কথা শুনিয়া কালিদাস বড়ই আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার অমার্জ্জনীয় অপরাধের কথা তরঙ্গিণী কিছুই জানিতে পারে নাই। জানিতে পারিলে এরূপ মধুমাখা, এরূপ প্রেমপূর্ণ, এরূপ আদরময় কথা তাহার মুখ হইতে কখনই বাহির হইত না; তাহার সুর বদলাইয়া যাইত। কালিদাস হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে যে না বুঝিতে পারিয়া বাস্তবিকই অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে তাহার কোনই সংশয় নাই। যাহাতে প্রেমময়ী, আনন্দময়ী, ধর্ম্মশীলা, উদারহৃদয়া তরঙ্গিণীর অন্তরে বেদনা জন্মে এরূপ কর্ম্ম যে মহাপাপ, তাহার আর সন্দেহ কি? বোকা কালিদাস বড়ই ভুল বুঝিয়াছে; কিন্তু এইরূপ ভুল অনেক বুদ্ধিমান কালিদাসও বুঝে। কালিদাস একটা বোকার মত উত্তর দিল,—"তা তোমার মন না হইলে আমি কোথায় যাইব? বেপারী কটাকে বিদায় করা—তা তুমি যখন বলিবে তখনই যাইব।"

তরঙ্গিণীর অব্যর্থ সন্ধানে দ্রুতগতি হরিণ পলাইতে পারিত না, খোঁড়া কালিদাস-সজারুর তো কথাই নাই।

তরঙ্গিণী মনে মনে অনেক হাসিল; মুখে সামান্য মাত্র হাসিয়া বলিল,—"তুমি একটু শোও—আমি তোমাকে বাতাস করি। পাছে কালিকার মত মাথা ধরে, এই ভয়ে আমি অস্থির। একটু বিশ্রাম করার পর, যেখানে যাইতে হয় যাইও, আমি তখন বারণ করিব না।"

কালিদাস হুঁকা রাখিয়া শয়ন করিল। তরঙ্গিণী পাখা অল্প অল্প নাড়িতে নাড়িতে বলিতে আরম্ভ করিল—"তোমার স্ত্রী বলিয়া যিনি আসিয়াছেন, উহাঁর কি বিলি করিবে মনে করিতেছ?"

ঐ রে—স্ত্রীর কথা তুলে কেন? কালিদাসের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। বলিলেন,—"বিলি—বিলি তুমি যা বল। তুমিই তো তাহাকে এ বাটীতে স্থান দিয়াছ।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"স্থান দিয়াছি—দেওয়াই তো উচিত। কিন্তু যা ভাবিয়াছিলাম, তা যে নয়। উহাকে খাওয়া পরার খরচ দিতে তুমি বাধ্য। তা এখানে রাখিয়া দেও, কি উহাকে বাপের বাটীতে পাঠাইয়া সেখানেই দেও।"

সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গিণী অতি মধুর ভাবে কালিদাসের চক্ষুর সহিত আপনার চক্ষু মিলাইয়া দিল। মূঢ় কালিদাস সভয়ে বলিল—"তুমি কি কর্‌তে বল?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি কি বলিব? উনি তোমার

স্ত্রী—হাজার হউক আমি পর। আমার কি কোন কথা বলা উচিত? তুমি বুঝিয়া সুঝিয়া যাহা ভাল হয় কর।"

কালিদাস বড় বিপদে পড়িল। তরঙ্গিণীর অভিপ্রায় কি, তাহা সে স্থির করিতে না পারিয়া বলিল,—"তা উহাকে এখানে না রাখাই যদি তোমার মত হয়, তবে ও আজই চলিয়া যাউক।"

তরঙ্গিণী তাহাই চাহে। কিন্তু সাধুতার ভাণ সহজে কেহ ছাড়ে কি? বলিল,—"রাধাকৃষ্ণ—তা কি বলিতে পারি। তবে কথাটা তোমাকে বলা উচিত নয়; আবার না বলিলেও আমার পাপ আছে। উহাঁর রীত চরিত্র যেমন ভাবা গিয়াছিল তেমন নয় দেখিতেছি।"

কালিদাস উঠিয়া বসিল। বলিল,—"কি রকম? কি রকম?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"সকল কথা তোমার জানিয়া কাজ নাই। উহাঁর স্বভাব ভাল নয়। আমি কু-কুলে জন্মিয়াছি বটে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় কুমতি আমার কখনই নাই। তুমিই আমার ধ্যান-জ্ঞান সকলই। কাজেই মন্দ রীতি-প্রকৃতি দেখিলে আমার কষ্ট হয়। আমি সে রকম লোকের সঙ্গে এক দণ্ডও থাকিতে পারি না। তাই বলিতেছি—"

কালিদাস জিজ্ঞাসিল,—"বল কি? এই কয় দিনেই উহার কুরীত ধরা পড়িয়াছে; তবে তো ও অতি ভয়ানক লোক। উহাকে তো কোন রকমেই বাড়ীতে রাখা যাইতে পারে না।"

তরঙ্গিণী বলিল—"না না—অত রাগ করিও না। তবে আমি নষ্ট দুষ্ট লোকের সঙ্গে এক জায়গায় থাকিতে পারিব না, তাহারই একটা ব্যবস্থা তুমি করিয়া দাও। উনি যেমন এখানে আসিয়াছেন, এখানেই থাকুন। আমার একটা অন্য স্থান করিয়া দাও। উহাঁর খোর-পোষ না দিলে লোকে তোমাকে দূষিবে। সেও তো আমার একটা কষ্ট।"

কালিদাস বলিল—"বিলক্ষণ! লোকে দূষিবে বলিয়া আমি কি কাল সাপ পুষিয়া তোমার কাছে ছাড়িয়া দিব? উহাকে এখনই জুতা মারিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতেছি।"

পাঠকগণের স্মরণ থাকা আবশ্যক যে, কিরূপ প্রমাণে তরঙ্গিণী বিরাজমোহিনীর এরূপ কলঙ্ক প্রচার করিতেছেন তাহা কালিদাস এখনও জানে নাই—জানিবার ইচ্ছাও করে নাই। তরঙ্গিণী যখন বলিতেছে, তখন অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? বুদ্ধিমান কালিদাস লোকের মুখে শুনিয়াই স্ত্রীকে জুতা মারিয়া গৃহ বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত। তরঙ্গিণী তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল,—"ছি ছি! উতল

হইয়া কোন কাজ করিতে নাই। আগে শুন সব কথা
তার পর যা হয় করিও।”

কালিদাস মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তরঙ্গিণী বলিল,—“হারাধনের সঙ্গে কালাচাঁদ বলিয়া সেই যে একটা বয়াটে ছেলে মধ্যে মধ্যে এখানে আইসে দেখিয়াছ বোধ হয়। আমি তাহার সম্মুখে বাহির হই না —সে বড় মন্দ লোক শুনিয়াছি। সে যখন আইসে, তখন হারাধনের অপেক্ষায় বাহিরে বসিয়া থাকে—আমাদের বাড়ীর মধ্যে আসিতে পায় না। তোমার স্ত্রী সেই কালাচাঁদের সহিত আজি ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছিলেন। আমি যে পাশের ঘরে ছিলাম, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার পেটের পীলে চমকিয়া গেল। কত কথা তোমাকে আমি লজ্জার মাথা খাইয়া বলিব? কালি সন্ধ্যার পর সে আবার আসিবে, তোমার স্ত্রী দরজা খুলিয়া দিয়া তাহাকে ঘরে লইবেন।”

কালিদাস বলিল,—“বল কি? তবে আর উহাকে এক মুহূর্ত্তও বাড়ীতে থাকিতে দিবার দরকার নাই। এখনই উহাকে তাড়াইয়া দিয়া তবে অন্য কাজ।”

তরঙ্গিণী বলিল,—“তা হইবে না। আমি মেয়েমানুষ। আমার বুঝিবার ভুল হইতে পারে। তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি নিজে না দেখিয়া, না বুঝিয়া কোন কাজ করিতে পাইবে না। কালি রাত্রির কাণ্ড তোমাকে দেখিয়া যা

হয় করিতে হইবে। আমরা মেয়েমানুষ অবুঝ, অধীর। তুমি এত অধীর হইলে চলিবে কেন ?"

কালিদাস নীরবে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। তরঙ্গিণী তাঁহাকে ধীরে ধীরে বাতাস দিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চতুরা তরঙ্গিণী আট ঘাট না বান্ধিয়া কোন কাজ করে কি? সে যাহা করিতে বসিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নহে। স্পর্দ্ধিতা বিরাজমোহিনী বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে গিয়াছে, তরঙ্গিণীর লাখরাজ জমি সে কাড়িয়া লইবার পথ করিতে গিয়াছে, সুতরাং সে অমার্জ্জনীয়া। মুখে তরঙ্গিণী যতই সৌজন্য প্রকাশ করুক, সে বিরাজমোহিনীর সর্ব্বনাশ সাধিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। দশ দিন পরেও যে স্বামী তাহাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিবেন, বা তাহার অপরাধে সন্দেহ করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, বা স্থানান্তরে রাখিয়া তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, ইহার কিছুই তরঙ্গিণী হইতে দিবে না। বিরাজের এক তিল অপরাধে (এখন অপরাধই বলিতে হইতেছে) তরঙ্গিণী অপরিমিত শাস্তি না দিয়া ছাড়িবে না স্থির করিয়াছে।

দুঃখিনী, আজন্ম-সুখবিহীনা বিরাজ—তুমি নিরন্তর নিরপরাধ। স্বর্গের দেবতারা এ কথা অবশ্যই জানিতে-ছেন। ধর্ম্মের পুস্তকে ইহা নিশ্চয়ই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। বৎসে! দুঃখের প্রবল পীড়নে কদাপি অবসন্ন

হইও না। ইহজগতে বুক পাতিয়া দুঃখ-দারিদ্র্যের আক্রমণ সহ্য করাই মহত্ত্ব; তাদৃশ সহিষ্ণুতা কখনই কোথায় নিষ্ফল হয় না। হৃদয়ের যে বলে, বৎসে! এতদিন অসহনীয় ক্লেশপরম্পরায় প্রপীড়িত হইয়াও, আপনার ধর্ম্ম ও সততা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছ, সেই বল তোমাকে যেন এখনও পরিত্যাগ না করে। সেই বল সহায় থাকিলে জগতের যাবতীয় বিপদ তুমি পীপিলিকা-দংশনবৎ নগণ্য বোধে, অবহেলার সহিত উপেক্ষা করিতে পারিবে। দুঃখিনি মুগ্ধে! বড় বিকট বিপদ বদন ব্যাদান করিয়া তোমাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ধাইয়া আসিতেছে—তুমি ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা, ধর্ম্ম ও সততা সম্মুখে রাখিয়া সাহসসহকারে দাঁড়াইয়া থাক। ভয় কি মা? অনাথনাথ বিপন্নবান্ধব নারায়ণ, চিরদিনই ধার্ম্মিকের সহায়। ধর্ম্মরূপ পবিত্র জ্যোতিঃ তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিলে, যমও তোমার নিকটস্থ হইবে না।

কালিদাস কিয়ৎকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া আড়তে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হারাধন আসিয়া তাঁহার বাটীতে দেখা দিলেন। হারাধন নিতান্ত বেলেল্লা বিকটাকার চেহারার লোক। তাহার মাথায় চেরা সিঁথি, গায়ে বেল-লাগান কামিজ। পরিধান কালাপেড়ে ধূতি, পায়ে বার্ণিস করা জুতা, বুকের উপর ঘড়ির চেন। বদনে দুর্ব্বৃত্ততা যেন মাখা। হারাধন বিষয়-কর্ম্ম কিছু করে না,

কেবল টপ্পা মারিয়া বেড়ায়; অথচ তরঙ্গিণীর ধর্ম্ম ভাই বলিয়া তাহার অন্ন বস্ত্র বা বাবুগিরির কষ্ট নাই। রতনে রতন চিনে। এই জন্যই তরঙ্গিণীর সহিত হারাধনের এত আত্মীয়তা।

হারাধনের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা হইতে থাকিল, তাহা লিখিবার অযোগ্য। সে সকল কুৎসিত আলাপ সমাপ্ত হইলে, তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি বড় দায়ে পড়িয়াছি, তোমাকে তাহার উপায় করিতে হইবে। নহিলে ক্রমে ছুঁই ফাল হইয়া দাঁড়াইবে। তখন তুমিও যাইবে, আমিও যাইব। সকল সুখ, সকল আমোদ, জন্মের মত হাত-ছাড়া হইবে। বাঁদর যদি একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ।"

এই বলিয়া তরঙ্গিণী একে একে সমস্ত কথা বলিল। তাহার পর সে যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছে, তাহাও বলিল। সমস্ত কথা শুনিয়া হারাধন তাহার মন্ত্রণা ও বুদ্ধির অনেক প্রশংসা করিল এবং বলিল,—"এর জন্য চিন্তা কি? আমি কালাচাঁদকে বলিয়া সকল পরামর্শ ঠিক করিয়া রাখিতেছি। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ হইবে, তাহার জন্য কোন ভয় নাই।"

হারাধন চলিয়া গেল। তরঙ্গিণী একটু নিশ্চিন্ত হইল। বিরাজমোহিনীর সর্ব্বনাশ সাধিবার জন্য জাল পাতা হইল।

পরদিন বৈকালে তরঙ্গিণী একটু সকালে সকালে খাবার তৈয়ার করিবার জন্য হুকুম জারি করিলেন। বাবুর শরীর ভাল নাই। তিনি সন্ধ্যার পর বাটী ফিরিবেন এবং সকালেই আহার করিবেন। তাঁহার আদেশ মত কার্য্য সম্পন্ন হইল, বিরাজ, বাবুর খাবার উপরে ঢাকিয়া রাখিয়া আসিল। তাহার পর বিরাজ সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে শয়ন করিতে গেল। নয়টার সময় কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় আড়তের কাজ শেষ করিয়া বাটী আসিলেন। তিনি আসিলে তরঙ্গিণী তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিল। এ কাজটা চিরকালই তরঙ্গিণী স্বয়ং সম্পন্ন করে। সেই দুটা ভাত মুখে দিয়া বাবু আড়তে গিয়াছেন, এতক্ষণ তাঁহাকে না দেখিয়া তরঙ্গিণীর কষ্টের সীমা নাই। তিনি দারুণ কষ্ট ও পরিশ্রমের পর, ঘরে ফিরিলে, লোকে তাঁহাকে দরজা খুলিয়া দিবে, তাহার পর তিনি উপরে উঠিয়া আসিবেন, তখন তরঙ্গিণী তাঁহাকে দেখিয়া মনপ্রাণ শীতল করিবে! বাপরে, এত বিলম্ব সহে কি? সুতরাং বাবু দরজার শিকলি নাড়িবামাত্র তরঙ্গিণী বেগে গিয়া দরজা না খুলিয়া থাকিতে পারে না। দরজা খুলার পর, বাবু দরজার ভিতরে আসিলে, দরজা বন্ধ করিলে যেমন শব্দ হয়, তরঙ্গিণী সেইরূপ শব্দ করিল; কিন্তু বাস্তবিকই দরজা বন্ধ করিল কি? না।

তরঙ্গিণী কালিদাসের হাত ধরিয়া সোহাগের হাসি হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিল। কালিদাস জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সংবাদ ?"

তরঙ্গিণী যেন কিছুই জানে না, বা কিছুই মনে করিয়া বসিয়া নাই। বলিল,—"কিসের ?"

কালিদাস বলিলেন,—"বলি ঐ পাপটার।"

তরঙ্গিণী যেন চমকিয়া বলিল—"ও হাঁ—বলি ঐ ঠাক্‌রুণটির কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছো ? আমি বলি—কি না জানি। তা কই ভাই, এখনও তো কিছু টের পাই নাই। এই জন্যই তো ভাই তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি মেয়ে মানুষ, আমার বুঝিবার ভুল হইতে পারে। তুমি না বুঝিয়া কোন কাজ করিতে পারিবে না। একথা আমি আগেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি।"

যেন দুধের দুধ, জলের জল। কালিদাস জিজ্ঞাসিলেন,—"এখন রাত্রি কত ?"

"দশটা হবে বোধ হয়। তা তুমি খাও, দাও, তার পর ওসব ভাবনা হবে। ভাল এক ছেঁড়া কথা তুলে দেখ্‌ছি, ভাবনায় তোমার শরীর খারাপ হইয়া পড়িল। আগে খাও দাও, নহিলে আমি কোন কথাই শুনিব না—কোন কথার জবাবও দিব না।"

কালিদাস আহার করিতে বসিলেন। তাঁহার আহার সমাপ্তির প্রায় সম সময়েই বাহিরের দরজায় খুট্ খুট্

করিয়া অনতি-উচ্চ শব্দ হইল। কালিদাস সোৎসাহে বলিলেন,—"তরু তরু! ঐ বুঝি কে দরজা খুলিল!"

তরঙ্গিণী যেন কিছু জানে না, কোন কথাই তাহার মনে নাই। সে বলিল,—"দরজা তো আমি তোমার সামনেই বন্ধ করিয়া আসিলাম। দরজা আবার এত রাত্রিতে কে খুলিবে?"

কালিদাস বলিল,—"কালাচাঁদ বুঝি আসিল। তোমার সখের বামুন ঠাক্‌রুণ বুঝি দরজা খুলিয়া তাঁহার রসিক-নাগরকে ঘরে লইলেন।"

তরঙ্গিণী সবিস্ময়ে বলিল,—"হাঁ—তাই তো। না—এই সন্ধ্যার সময়েই কি তা পারিবে? এখনও তোমার খাওয়া হয় নাই—তুমি ঘুমাও নাই। তবে মানুষের মনের কথা বলা যায় না। যদি কিছু হয়, তা কি এখনই হবে?"

কালিদাস বলিল,—"না, তাই বটে—আর কিছু নয়। আমি মানুষের পায়ের শব্দ পাইয়াছি। তুমি থাক, আমি যাই।"

তরঙ্গিণী সতীপ্রধানা। সে বিস্মিতের ন্যায় বলিল, "ওমা কি ঘেন্না—কি ঘেন্না! না না তোমার ভুল হয়েছে। এও কি কখন হয়? ভাল, দাঁড়াও তুমি, আমি যাই। হাঁ—সত্য বটে, কেউ বাড়ীতে এসেছে—আমিও যেন পায়ের শব্দ পেয়েছি।"

তখন কালিদাস কাণ্ডাকাণ্ডবোধ-শূন্য হইয়া আসন

ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং ষাঁড়ের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বেগে দুপ্‌দাপ্‌ শব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। এরূপ সময়ে অতি সাবধানে ও নিঃশব্দে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করাই বুদ্ধিমানের ব্যবস্থা। কিন্তু নির্ব্বোধ কালিদাস যাহার বুদ্ধি লইয়া চলেন, সে অন্যত্র হইলে অবশ্যই কালিদাসকে এ সম্বন্ধে সাবধান করিত; কিন্তু আজি আর সে কোন কথা বলিল না। সুতরাং কালিদাস বিনা আপত্তিতে, চীৎকারে ও পদশব্দে দেশ মাথায় করিতে করিতে, নামিতে লাগিলেন। সঙ্গে তরঙ্গিণী আলোক হস্তে আসিতে লাগিল। কালিদাসের চীৎকার ও পদশব্দের সহিত তরঙ্গিণীর মলের শব্দ মিশিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনি উৎপাদন করিতে থাকিল। তরঙ্গিণী, চক্রবর্ত্তীর হাত ধরিয়া, বলিতে লাগিল,—"তোমাকে কখনই ওখানে যাইতে দিব না। যদিই কেহ আসিয়া থাকে, সে এখন উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত হইলে সকলই করিতে পারে।"

যাহার চরিত্রের বল নাই, তাহার হৃদয়েও বল নাই। তাদৃশ কাপুরুষেরা শত্রু-পক্ষের সম্মুখীন হইতে প্রায়ই সাহসী হয় না। এস্থানে কালিদাসেরও সে সাহস হইল না। সে দেখিল বিরাজমোহিনীর ঘরের দ্বার খোলা; সুতরাং নিশ্চয়ই ঘরে লোক প্রবেশ করিয়াছে। দ্বার খুলিয়াই বিরাজ শয়ন করিয়া থাকে—কোন দিনই বন্ধ

করে না; এ কথা কালিদাস জানিত না। আর দেখিল, জামা গায়ে দেওয়া, মুখ কাপড় দিয়া ঢাকা, এক পুরুষ, সেই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কালিদাসের সম্মুখ দিয়া পলায়ন করিল এবং সদর দরজা পার হইয়া রাস্তায় গিয়া পড়িল। কালিদাস তখন উন্মাদের ন্যায় অস্থির হইল এবং বিরাজমোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ অশ্রাব্য ও অবক্তব্য গালি দিতে লাগিল। এই সকল গোলমালে নিদ্রিতা, অপাপবিদ্ধা, বিরাজমোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, এবং না জানি বাটীতে কি বিপৎপাত হইয়াছে ভাবিয়া, সে ঘরের বাহিরে আসিল। যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই তুমুল কাণ্ড বাধিয়াছে, সে তাহার কিছুই জানে না। কিন্তু সে কথা আর শুনিবে কে? কালিদাসের চক্ষুকর্ণের বিবাদ বিশেষরূপে ভঞ্জন হইয়াছে। তিনি বিরাজের বিরুদ্ধে ভয়ানক অপবাদ শুনিয়াছিলেন, অধুনা তদ্বিষয়ে অখণ্ডনীয় প্রমাণ তাঁহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল। তরঙ্গিণী কি মিছা কহিবার লোক? রাধাকৃষ্ণ!

বিরাজমোহিনী বাহিরে আসিবামাত্র তাহার স্বামী তাহার বক্ষে সজোরে পাদুকাসহ পদাঘাত করিলেন।

রে মূর্খ হতভাগ্য কালিদাস! রে হৃদয়হীন ভ্রান্ত পশু! আজি এই সতী সাবিত্রীর তুই যে অবমাননা করিলি, এ পাপের জন্য নিশ্চয়ই তোর অতি ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিতে হইবে। তোর এ দারুণ

দুষ্কৃতি রজনীর আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকিবে না; সত্য মিথ্যায় রূপান্তরিত হইবে না; কোটী কোটী তরঙ্গিণী একত্রিতা হইলেও, তোর রক্ষা-সাধন করিতে পারিবে না। তুই কাচকাঞ্চনের বিচার করিস্ নাই; ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা আলোচনা করিস্ নাই; অনন্যগতি আশ্রয়হীনা, সারল্য-প্রতিমা, ধর্ম্মস্বরূপা, সহধর্ম্মিণীর নিষ্পাপ শরীরে তুই যে পাপ-পঙ্কিল পদাঘাত করিলি এবং যে অশ্রাব্য, অনালোচ্য, অচিন্ত্যণীয় অপরাধে তাঁহাকে কলঙ্ক-কালিমালিপ্তা করিলি, তোর এই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বিশ্বনিয়ন্তা ন্যায়-পুরুষের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে। তোর ঐ পদাঘাত ধর্ম্মের বক্ষেই পড়িয়াছে। রে মূঢ়! তোর আর নিস্তার নাই। তোর তরঙ্গিণীর চটুল চাটুবাক্যে তুই সকলই ভুলিবি, তাহার বিলোল কটাক্ষে তোর সকল অন্তর্দ্দাহ বিলীন হইবে, কিন্তু রে হতভাগ্য কাপুরুষ! ধর্ম্মরূপী ভগবান এই অপরাধের এক বর্ণও ভুলিবেন না। সেখানকার জমাখরচে ঠিকে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই ধর্ম্মময়, যথাসময়ে ন্যায়দণ্ড হস্তে লইয়া, তোর দণ্ডবিধানার্থ উপস্থিত হইবেন এবং তোর সর্ব্বনাশ-সাধন করিবেন। তখন তোর দশা কি হইবে? মূঢ়, ভ্রান্ত, দুর্ভাগা কালিদাস! এখনও উপদেশ শুনিয়া কাজ কর। ঐ সাধ্বীর—ঐ ধর্ম্মময়ী সুন্দরীর হাত ধরিয়া সাদরে তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন কর। হতভাগা!

এখনও সময় আছে—এমন সুযোগ আর পাইবি কি ?

বিরাজ দারুণ আঘাতে পড়িয়া গেল, কিন্তু কাঁদিল না বা চীৎকার করিল না। তখনই উঠিয়া দুঃখিনী, ক্রুদ্ধ স্বামীর সম্মুখ হইতে সরিবার অভিপ্রায়ে, প্রকোষ্ঠ মধ্যে যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তখনই কালিদাস বলিল,—"আমার বুকের উপর বসিয়া তোর এই কাজ রে আবাগী! বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

এই বলিয়া, লাথি, কিল ও ধাক্কা মারিতে মারিতে, সেই নিষ্পাপ সুন্দরীকে বাটীর দরজা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আনিল। প্রহার যৎপরোনাস্তি হইল—চোর বা দুশ্চরিত্রাকে এমনই করিয়া লোকে মারে বটে, কিন্তু বিরাজ কাঁদিল না, বা একটি কথাও বলিল না।

দরজার কাছ পর্য্যন্ত আসার পর বিরাজ কবাট চাপিয়া ধরিল—মারিয়া ফেলিলেও বাহিরে যাইবে না, ইহাই তাহার সঙ্কল্প। এ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে কোথায় যাইবে ? জগতে আর কোথায় তাহার স্থান নাই তো! কালিদাস সেই স্থানে তাহার চুলের মুটা ধরিয়া অতিশয় বল প্রয়োগে তাহাকে টানিতে টানিতে বাহিরে লইয়া আসিল। অভাগিনীর অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল—নানা স্থান হইতে রক্ত ঝরিতে লাগিল। বিরাজ পথের উপর ধূলিশয্যায় পড়িয়া রহিল। কিন্তু বিরাজ কাঁদিল

না, বা একটি কথাও বলিল না। কালিদাস বড়ই ক্রোধের সহিত বলিল,—“তুই কোন্ সাহসে এখনও আমার বাড়ীতে থাকিতে চাহিস্? জানিস্ না হতভাগী, তোর নাগরের আসা যাওয়া, তোর লীলাখেলা কিছুই আমার জানিতে বাকী নাই। তোকে যে এখনও খুন করি নাই, সেইই ঢের। ও পোড়ামুখ আর কাহাকেও দেখাইস্ না। গঙ্গায় ডুবে মর গিয়া—ধিকজীবনী, কালামুখী।”

এতক্ষণে অপরাধের ভাবটা কতক বিরাজমোহিনী অনুভব করিতে পারিল। কিন্তু সে ঝগড়া করিল না, এক ফোটা চক্ষের জল ফেলিল না, অনর্থক আপনার সততা প্রমাণ করিবার প্রযত্ন করিল না, একটি কথাও কহিল না। কালিদাস বলিলেন,—“কালই যেন শুনিতে পাই, তুই মরিয়াছিস্, তোর পোড়ামুখ যেন আর কখন দেখিতে না হয়।”

কালিদাস বেগে ফিরিয়া আসিল। তরঙ্গিণী বিরাজের নিকটস্থ হইয়া তাহার কাণে কাণে বলিল,—“স্বামীর একটু পদধূলির জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলি—এখন পেট ভরিয়া পায়ের ধূলা পাইয়াছিস্ তো? কুঁজো আবার চিৎ হয়ে শুতে চায়! চিনিস্ না আমাকে সর্ব্বনাশী?”

হায় হায়! পাপীয়সি! তরঙ্গিণী, ইহজীবনেই কর্ম্মাকর্ম্মের শেষ নহে, জীবনান্ত হইলেই সকলই ফুরাইয়া যায়

না, এ পরম জ্ঞান, একবার ভ্রমেও তোর ন্যায় কুলটাদের মনে হয় না কি? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ঐ ধূলিধূসরিতা, রুধিরাক্তকলেবরা, সতীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাহার এরূপ সর্ব্বনাশ কখন করিতে পারিতিস কি? তাহা হইলে তাহার ন্যায় ও ধর্ম্ম-সঙ্গত অধিকার হইতে তাহাকে চিরদিন বঞ্চিত করিয়া তুই তাহা সানন্দ-চিত্তে সম্ভোগ করিতে পারিতিস্ কি? তাহা হইলে তুই অধুনা তাহার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে এরূপ কঠোর বাক্যরূপ লবণ দিতে পারিতিস্ কি? কিন্তু তরঙ্গিণী তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা হইবে না। আলোকের পর অন্ধকার, দিবার পর রাত্রি যেমন অবশ্যম্ভাবী, সুখের পর দুঃখও তেমনই অবশ্যম্ভাবী। তোমার এই সুখময়, আনন্দময়, সন্তোষময় দিন সমান যাইবে বলিয়া তোমার মনে যে বিশ্বাস আছে, তাহা অবশ্যই চূর্ণীকৃত হইবে। তোমার এ অহঙ্কারে ছাই পড়িবে, তোমার সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইবে, তোমার পাপ-লীলার পরিসমাপ্তি হইবে। যে অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া তুমি এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হইয়াছ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছ, পরিণাম-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছ, সেই অহঙ্কারেই তোমাকে ধূলায় লুটাইয়া রোদন করিতে হইবে; যে স্বাধ্বীকে তুমি পদবিদলিতা করিলে, তাহারই ঐ চরণযুগল নয়ন-জলে ভিজাইতে হইবে। একদিন পিতৃক্রোড়ারোহণেচ্ছু

দুঃখিনীনন্দন ধ্রুবকে তাহার বিমাতা অহঙ্কারস্ফীতা সুরুচি বড় কঠোর মর্ম্মবেদনা দিয়াছিল, বাক্যবাণে তাহার কোমল হৃদয় বড়ই বিদ্ধ করিয়াছিল। মর্ম্মপীড়িত দুঃখী শিশু, অনন্যোপায় হইয়া, তখন দুর্ব্বলের বল, বিপন্নের বান্ধব, আশ্রয়হীনের সহায়, কাতরের বন্ধু পদ্মপলাশ-লোচনের শরণাগত হইয়াছিল। শ্রীহরির কৃপায় সেই ধ্রুবের গৌরবগীতি বসুন্ধরা চিরদিন গাহিতেছে, সেই নিপীড়িত শিশু এখন দেবতা। আর সেই গর্ব্বিতা বিমাতা, সেই তিরস্কৃত বালকের ক্ষমা ও অনুকম্পা লাভ করিয়া উচ্চস্থানে সমাসীনা। অয়ি দুর্ব্বল-হৃদয়ে পাপিনি! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তৃণাদপি লঘু, নীচাদপি হেয় কালিদাসের অনুগ্রহে তুই স্ফীতা ও গর্ব্বিতা; কিন্তু জানিস্, ঐ মলিনা কাতরা কামিনীর সহায় কে? ক্ষুদ্র কালিদাস যাঁহাকে ভাবিতেও অধিকারী নহে, গর্ব্বিতা তুই যাহার নাম করিতেও অধিকারী নহিস্, সেই নরকান্তকারী নারায়ণ ঐ নারীর সহায়। তোর মত, তোর কালিদাসের মত, ক্ষুদ্র কীট একবার ঐ দেবীর—ঐ পদবিদলিতা সুরসুন্দরীর সমীপস্থ হইতে পাইলেও চরিতার্থ হইবি।

তরঙ্গিণীকৃত তীব্র তিরস্কারের বিরাজ কোন প্রতিবাদ করিল না। একটি কথাও সে বলিল না, এক ফোটা চক্ষুর জলও সে ফেলিল না। তাহার মাথা ঘুরিতে

লাগিল সে চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিল! তখনই তাহার সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল।

কতক্ষণ বিরাজ এ ভাবে থাকিল, তাহা সে জানে না। যখন তাহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তখন সে উঠিয়া বসিল। অঙ্গ কিছু অবশ—মনে করিল শয়ন করিয়া থাকায় হইয়াছে। রুধিরে পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত—মনে করিল কিরূপে জল পড়িয়াছে। দেখিল স্বামীর বাটীর দরজা বন্ধ। তখন কি করিতে হইবে,—একটুমাত্র সেজন্য আজন্মদুঃখিনী বিরাজমোহিনী চিন্তা করিল। তখনই মনে মনে বলিল,—"পিতার মুখে শুনিয়াছি, ইহজগতে স্ত্রীলোকের স্বামীর চেয়ে গুরু আর নাই। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র দেবতা। স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে নরকেও স্থান হয় না। আমার স্বামী আমার কপালক্রমে আমাকে কখন কোন আজ্ঞা করেন নাই। আজি ভাগ্যবলে আমার স্বামী আমাকে একটি আজ্ঞা করিয়াছেন; তিনি আমাকে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে বলিয়াছেন। তবে আর আমি কি করিব বলিয়া ভাবিতেছি কেন? সেই আজ্ঞা পালন করাই এখন আমার পরম ধর্ম্ম।"

বিরাজমোহিনী কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। তাহার পর স্বামী-ভবনের দিকে ফিরিয়া সে একবার ভূম্যবলুণ্ঠিতা হইয়া স্বামীর চরণ উদ্দেশে প্রণাম করিল। তাহার পর কষ্টে উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

কোথা যাও, বিরাজমোহিনী, সুশীলে, এ গভীর নিশীথে একাকিনী কোথা যাও? দেখ আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে, চন্দ্রের চারিদিকে নক্ষত্র হাসিতেছে, জ্যোৎস্না-মণ্ডিত হইয়া জগৎ হাসিতেছে, কুসুমকুল হাসিতে হাসিতে ঢুলিতেছে, তাহাদের সৌরভ হাসিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, আর তুমি সুন্দরী, যুবতী, সাধ্বী, তুমি হাসিতেছ না কেন মা? ভগবান তোমাকেই কেবল হাসিতে দেন নাই কেন মা? বৎসে! তাহা বলিয়া সেই সর্ব্বদর্শী ভগবানকে তুমি নিন্দা করিও না। পরম দয়াল অতি মহৎ অভি-প্রায়েই তোমাকে হাসিতে দেন নাই। স্থির হও বাছা. এমন দিন অবশ্যই আসিবে—যখন তোমার হাঁসিতেই বসুন্ধরা হাসিবে; তোমার হাসির কণিকামাত্র পাইলেই মানব ধন্য হইবে। কষ্ট ও সুখ উভয়ের বৈষম্য দেখিতে বড় ভয়ানক হইলেও, বস্তুতঃ কিছুই নহে। স্থির হইয়া উভয়ের জন্যই হৃদয়কে সমান প্রস্তুত করিয়া রাখ। এ সংসারে পতিপদাহতা, তাড়িতা কুলটা কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা, বিরাজমোহিনী তুমিই অতি ধন্যা। তাই বলিতেছি, কোথা যাইতেছ! শুভে—স্থির হও। এমন দিন কখনই থাকিবে না মা!

আঁকা বাঁকা গলি ঘুঁজি পার হইয়া ধীরে ধীরে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, বিরাজমোহিনী কতদূরই গেল। ও কিসের শাঁ শাঁ শব্দ? ও কিসের কুলকুল ধ্বনি?

বিরাজের সম্মুখে সেই কলভাষিণী, পূত-সলিলোদরা, পূর্ণা-বয়বা জাহ্নবী। বিরাজ একাকিনী সেই গভীর নিশীথে, সেই ভাগীরথী-সৈকতে দাঁড়াইল। বসুন্ধরা হাস্যময়ী। আকাশে চন্দ্র-তারা হাসিতেছে, তরঙ্গভঙ্গ-রঙ্গিণী গাঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে ছুটিতেছেন, আনন্দও হাস্য সর্ব্বত্র, কেবল একটি দুঃখিনী অথচ পবিত্রহৃদয়া, সরলা অথচ নিপীড়িতা সাধ্বী নিরানন্দময়ী। তাহার বদনের কোন স্থানেই হাস্যের রেখা নাই। বাহ্য জগতের হাস্য ও আনন্দে সে তখন নির্লিপ্তা; তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী, শশাঙ্কশেখর শির-শোভিনী ঐ গঙ্গার বারিরাশি ভিন্ন আর কোন পদার্থেই তাহার দৃষ্টি নাই। জগৎ নিস্তব্ধ—মানব সুষুপ্ত, কেবল দুঃখিনী আশ্রয়হীনা বিরাজমোহিনী একাকিনী এই নিশীথে গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মানা।

বিরাজমোহিনী সেই সৈকত-তীরে দাঁড়াইয়া একবার পতিপদ স্মরণ করিয়া ভক্তি সহকারে প্রণাম করিল। তাহার পর করজোড়ে বলিল,—"মা গঙ্গা, কোথাও এ অভাগিনীর স্থান হইল না। দয়াময়ি! তুমি এ দুঃখিনী কন্যাকে চরণে স্থান দিয়া কৃতার্থ কর মা।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, প্রফুল্ল-কুসুমবৎ লাবণ্যময়ী যুবতী ধীরে ধীরে সেই গঙ্গাপ্রবাহে অবতরণ করিল, এবং অচিরে সেই সুবিশাল সলিলরাশির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ সন্নিহিত এক বটবৃক্ষের সমীপদেশ হইতে এক সুগঠিত কলেবর, বলিষ্ঠ পুরুষ গঙ্গাপ্রবাহে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কে এ দেবতা? কোথা হইতে এ অসময়ে এ স্থানে ইহাঁর আবির্ভাব হইল?

এতক্ষণে আমাদের উপন্যাসের সূচনা সমাপ্ত হইল! অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবে উপন্যাস আরব্ধ হইবে।

"যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানু তিষ্ঠন্তি মে মতম্
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।"

অর্থ।—কিন্তু যাহারা অসূয়া-পরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুসরণ না করে. সেই বিবেকবিহীন সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ় জনগণকে বিনষ্ট জানিবে।

তাৎপর্য্য। -যে সকল মোহাচ্ছন্ন মনুষ্য স্পর্দ্ধা-সহকারে ভগবানের প্রতিষ্ঠিত সুসঙ্গত নিয়মানুসারে সৎপথে বিচরণ না করিয়া অবৈধ কর্ম্মে রত হয়, তাদৃশ অধঃপতিত কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিদিগকে বিনষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবে।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৩য় অধ্যায়। ৩২ শ্লোক।
শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি।)

কর্ম্মক্ষেত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুরের ক্রোশ কয়েক পশ্চিমোত্তরে রাজীবপুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। এই সামান্য পল্লীগ্রামের প্রান্তভাগে এক ঘর [illegible] দরিদ্র তিলির বাস। এই গৃহস্থের সংসারে এক বিধবা গৃহিণী, এক বিধবা কন্যা, এক সধবা বধূ এবং দুইটী ক্ষুদ্র শিশু ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তরঙ্গিণীর হৃদয়সখা হারাধন নন্দী এই ভবনের অধিকারী। হারাধন শান্তিপুরে দোকান করেন, ইহাই সর্ব্বত্র প্রচার এবং সেই উপলক্ষে তিনি বারো মাস শান্তিপুরেই থাকেন। ফলতঃ শান্তিপুরে তাঁহার এক দোকান আছে বটে, কিন্তু সে দোকান কদাচিত খোলা হয়। তিনি সেখানে যাহা করেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। তরঙ্গিণীর কৃপায় তাঁহার খাওয়া পরা ও বাবুগিরি চলে। কখন কখন তিনি বাটীতে যৎসামান্য খরচও পাঠাইয়া থাকেন। তাহাতে অতি কষ্টে

পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হয়। বারো মাসই তাঁহার দোকানের ঝঞ্ঝাট, এজন্য বারো মাসই তিনি বাটী আসিতে পারেন না। যদি দৈবাৎ কখন আইসেন, তখন তাহার বাবুগিরি ও ধূমধাম দেখিয়া গ্রামস্থ প্রতিবাসীরা অবাক্ হয় এবং তাঁহাকে একটা জমিদারের তুল্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করে। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে, তাঁহার পরিবারগণ, চিরাভ্যস্ত মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া, ধান ভানিয়া একবেলা মাত্র খাইয়া, তৈল না মাখিয়া, ভূশয্যায় শয়ন করিয়া, দিন কাটাইতে থাকেন। হারাধনকে বাবু না বলিলে তিনি হাড়ে চটিয়া যান। সৌভাগ্য ক্রমে হারাধনের গৃহাগমন জনিত হাস্যজনক হঠাৎ নবাবীর অভিনয় সতত ঘটে না। হারাধন প্রায়ই বাটী আসিতে পান না—তরঙ্গিণী তাঁহাকে ছাড়িয়া একটি দিনও থাকিত পারে না।

হারাধনের পরিবারের মধ্যে বিধবা গৃহিণী, তিনিই হারাধনের জননী। বিধবা কন্যাটি হারাধনের ভগ্নী—গিরিবালা। যিনি বধূ, তিনি হারাধনের পত্নী। শিশু দুইটী হারাধনের পুত্র কন্যা। গিরিবালা বাল-বিধবা—অধুনা বয়স সপ্তদশ বর্ষ। গিরিবালা পরমা সুন্দরী, তাহার রূপরাশি নির্দ্দোষ ও উজ্জ্বল; এত দুঃখ-দারিদ্র্য ও মনস্তাপ সত্ত্বেও গিরিবালার রূপরাশি যেন উছলিয়া পড়িতেছে। মলিন-বসনা, নিরাভরণা, ভোজ্য বিহীনা গিরিবালা যদি

সুখসেবিতা, রত্নালঙ্কার-ভূষিতা হইত, তাহা হইলে তাহার শোভা সংবর্দ্ধিত হইত, কি অপচিত হইত, তাহা বিচার্য্য। বৃদ্ধা মাতার পরিচর্য্যা এবং অপোগণ্ড ভ্রাতৃ সন্তান-দ্বয়ের লালন-পালনই গিরিবালার জীবনের প্রধান কার্য্য। সে দিবারাত্রি প্রধানতঃ এই কার্য্য লইয়াই ব্যাপৃত থাকে; সংসারধর্ম্মের অন্যান্য কর্ম্ম হারাধনের স্ত্রী নির্ব্বাহ করেন। গিরিবালার চরিত্রগত কোন কলঙ্কের কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনা যায় নাই।

এই গ্রামের প্রান্তভাগে গ্রাম্য জমিদার মহাশয়ের বাস। জমিদার জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার আয় অনেক —বার্ষিক বিশ হাজার টাকার কম নহে। পাড়াগেঁয়ে জমিদার; সুতরাং প্রতাপ, শাসন, ধূমধাম অপরিসীম। যে জমিদার এইরূপ প্রতাপবান্ অর্থাৎ নিতান্ত অত্যাচারী ও উৎপীড়নকারী সর্ব্বত্র তাঁহার বড় সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি, তাঁহার পীড়নে ব্যতিব্যস্ত লোকেরাও তাঁহার কথা উঠিলে, তাঁহার রাজকার্য্যনিপুণতার ভূয়সী প্রশংসা করে এবং তাঁহাদের জমিদারের প্রবল প্রতাপে বাঘে-বকরিতে একঘাটে জল খায় বলিয়া গৌরবে উৎফুল্ল হয়। রাজীবপুরের জমিদারবাবুরা এইরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত। শুনিতে পাওয়া যায়, গ্রামের বর্ত্তমান জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লেখাপড়ায় অদ্বিতীয়। লোকে যতটা বলে ততটা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য

নহে। তবে ছুট বাদ দিয়া বিচার করিলেও, বাস্তবিক সুরেন্দ্র বাবুকে পণ্ডিত না বলিয়া থাকিবার যো নাই। সুরেন্দ্র বাবু ইংরাজিতে সচ্ছন্দে কথা কহিতে পারেন, তাহার মধ্যে ব্যাকরণ ঘটিত বা অন্য কোন মারাত্মক ভুল প্রায়ই থাকে না। ইংরাজিতে চিঠিপত্র লিখিতেও তাহার স্বতন্ত্র কাগজে মুসাবিদা করিতে হয় না। ইংরাজি কাব্য উপন্যাসাদি সাহিত্যের কথা উঠিলে তিনি যেরূপভাবে মতামত ব্যক্ত করেন, তাহাতে তৎসম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতও তিনি মোটামুটি জানেন, এবং অনেক শাস্ত্রাদিরও সংবাদ তিনি রাখেন। শাস্ত্রের বিচার উঠিলে, মুখে মুখে বচন বলিতে না পারিলেও, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের মর্ম্ম তিনি বলিতে পারেন। বাঙ্গালা সাহিত্যও তাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে। বাঙ্গালা ভাষার পাঠোপযোগী পুস্তক প্রায়ই তিনি পাঠ করিয়াছেন। এক আধবার সখ করিয়া বাঙ্গালা মাসিক পত্রাদিতে দুই একটা প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহার সেই প্রবন্ধের ভাষা ও প্রণালী অনেকের নিকট প্রশংসিত। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা ভাষা নিতান্ত অসম্পূর্ণ, তাহাতে সকল প্রকার ভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব, এবং তাহার আলোচনা করা, নিতান্ত অনাবশ্যক। যাহা হউক, সকল দিক বিচার করিয়া, বর্ত্তমান কালের হিসাবে, সুরেন্দ্র বাবুকে সুশিক্ষিত ব্যক্তি বলাই সুসঙ্গত।

সুরেন্দ্র বাবুর মেজাজটা বড় সাহেবী রকম। হয় তো সুশিক্ষার ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। তিনি ইংরাজী কথা কহিতেই বেশী ভাল বাসেন। কোথায় যাইতে হইলে, হাপ বুট, হাপ হোজ, টাউজার, প্যাণ্টালুন, সার্ট, ওয়েসট্-কোট, কোট,কলার এবং হ্যাট প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পরি-চ্ছদে তিনি অঙ্গাবরণ করিয়া থাকেন। তামাক তিনি খান—কিন্তু দেশী হুঁকা কলিকা ও গুড়ুক তাঁহার চক্ষু-শূল। তিনি ম্যানিলা বা হ্যাভানা সিগার সেবন করেন। স্নান তিনি করেন, কিন্তু তেল মাখিয়া কলুর ঘানি হইতে বাহির হওয়া বড়ই লজ্জার বিষয় বলিয়া তিনি মনে করেন। পিয়ার্স বা রিমেলের সোপ তিনি মাখিয়া থাকেন। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে তিনি সামাজিক শাসন বড় গ্রাহ্য করেন না। বাদসাহের জাতি কর্ত্তৃক প্রস্তুতীকৃত গ্রাম্য কুক্কুটের পলাণ্ডু-গন্ধামোদিত মাংস তাঁহার বড় প্রিয় খাদ্য। আরও অধিক দূর তিনি অগ্রসর হন কি না, তাহা আমরা বলিব না। আতর, গোলাপ তাঁহার বড়ই বিরক্তিজনক; এজন্য তিনি ক্রাউন পারফিউমারি কোম্পানির ল্যাভেণ্ডার এবং ফরাসি ইউডিকলোঁ প্রভৃতি সামগ্রী ব্যবহার করেন। স্বাস্থ্যের অনুরোধে, তিনি একটু একটু হুইস্কি পান করিয়া থাকেন, ইহাও জানি।

সুরেন্দ্র বাবুর ধর্ম্ম-মত কি, তাহা বড় বুঝা যায় না। তিনি ঠাকুর-দেবতার মন্দিরে প্রণাম করেন না; বাটীতে

দুর্গোৎসব হয়, সুরেন্দ্র বাবু কিন্তু শান্তির জলও লন না। প্রতিমাকে প্রণামও করেন না। ব্রাহ্মণ-সজ্জনকেও কখন তিনি প্রণাম করিতেছেন, এমন দেখি নাই। রামায়ণ মহাভারতাদিকে তিনি গাঁজাখুরি গল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণ, শিবদুর্গা প্রভৃতি দেবতাকে তিনি মূর্খের কল্পিত দেবতা বলিয়া ব্যক্ত করেন, এবং তৎসম্বন্ধে অশেষ পরিহাস করেন। বেদ-শাস্ত্রকে তিনি মদ্যপায়ী-গণের উক্তি বোধে অশ্রদ্ধা করেন। দর্শনশাস্ত্র-সমূহকে তিনি অর্থবিহীন ঢেঁকির কচকচি বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। লোক, অন্যধর্ম্মে আস্থাবান হইলেও, হিন্দুর চক্ষুতে নাস্তিক। কিন্তু ইংরাজী হিসাবে নাস্তিকতার অর্থ অন্যরূপ। যিনি ঈশ্বর নাই বলেন, ইংরাজি-মতে তিনিই নাস্তিক। যাঁহার মতে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ইংরাজি-মতে তিনি নাস্তিক নহেন—তিনি সন্দেহবাদী (স্কেপ-টিক)। ইংরাজি দর্শনে এমনও দেখা যায় যে, কেহ কেহ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করেন না। জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় (নোয়েবল এবং অন্‌নোয়েবেল) ইহারও বিচার ইংরাজিতে আছে। সুতরাং ইংরাজি চিন্তাশীলগণের মতের আলোচনায় আমাদের কাজ নাই। সুরেন্দ্র বাবুকে কেহ কখন গির্জ্জায় যাইতে দেখেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে গিয়া তিনি কখন নয়ন মুদ্রিত করিতেন কি না, তৎসম্বন্ধেও কোন

প্রমাণ নাই। অতএব বোধ করি, সুরেন্দ্র বাবুকে পূর্ণমাত্রায় নাস্তিক বলিলেও বিশেষ অপরাধ হইবে না।

সুরেন্দ্র বাবুর অন্যান্য মতের আলোচনা করিলে, তাঁহার ধর্ম্মমত কতকটা বুঝা যাইতে পারে। দান-ধ্যান তাঁহার কখন দেখা যাইত না। তিনি দরিদ্রের দুঃখ, পীড়িতের যাতনা প্রভৃতি ব্যাপার দেখিয়া তৎসমস্ত তাহাদের অবিবেচনার ফল বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। যাহার আয় অল্প তাহাকে বিবাহ করিতে দেখিলে, ম্যাল্থসের থিয়রি শুনাইয়া দিতেন, এবং শ্রীমতী এনিবেসাণ্টের (এখন এনিবেসাণ্ট থিয়সফিষ্ট অর্থাৎ ইংরাজী যোগী হইয়াছেন, ইহা পাঠকেরা স্মরণ রাখিবেন।) মতানুসরণ করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার সম্মুখে শিশু-সন্তান লইয়া ভিখারিণী চক্ষুর জল ফেলিতেছে দেখিয়াও তিনি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আকণ্ঠ পোলাও খাইয়া উদ্গার তুলিতেন; এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি একখানি কম্বলের অভাবে শীতে মরিতেছে দেখিয়াও, তিনি সানন্দে ফ্লানেলের টাইট কোর্টের উপর সার্জ্জের অল্‌ষ্টর আঁটিয়া ঘাম ছুটাইতেন। বলিতেন, জগতে দুঃখ অনন্ত—অপ্রতিবিধেয়—অপরিহার্য্য! একজনের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করা, এক কলসী জল তুলিয়া সমুদ্র শুখাইবার চেষ্টা করার ন্যায়, নিতান্ত হাস্যজনক। তিনি আপনাকে আপনি বড় ভাল বাসিতেন। সেল্‌ফ অর্থাৎ আত্ম নামক

পদার্থটা তাঁহার বড় প্রিয়। তিনি আত্মসন্তোষ, আত্ম-তৃপ্তি, এবং আত্মভোগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলিয়া জ্ঞান করিতেন। বলিতেন, জগৎ যে আছে, সে কেবল আমি আছি বলিয়া। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব, বাহ্যজগতে নহে —আমার মনে। আমি ভোগ করিতেছি, ভোগ করিয়া আসিয়াছি, এবং ভোগ করিবার আশা করি বলিয়াই প্রত্যেক পদার্থ আমার চক্ষু সমক্ষে বিরাজিত ও বিদ্যমান। আমি না থাকিলে এই সকল পদার্থ এইরূপ ভাবে থাকিবে কি,না, কে জানে? থাকে না থাকে, তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই ভোগটাই যথার্থ, তদ্ভিন্ন সমস্তই অযথার্থ। সুতরাং সুরেন্দ্র বাবু বাসনারূপ আত্মভোগে কোন সময়েই পশ্চাৎপদ হইতেন না।

সুরেন্দ্র বাবুর এই অদ্ভুত মত সম্পূর্ণ নূতন বা তাঁহার মনঃকল্পিত ও ভিত্তিবিহীন নহে। বার্ক্লে নামক ইংলণ্ডীয় দার্শনিকের জড়বাদ এবং এপিকিউরিয়ান্ নামক গ্রীক-সাম্প্রদায়িকগণের সুখবাদের অত্যাশ্চর্য্য সংমিশ্রণে সুরেন্দ্র বাবুর এই অত্যদ্ভুত মতের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহার সহিত যে আর কোন কোন অপূর্ব্ব মত মিশিয়া নাই, এমন নহে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ধর্ম্ম-মত অর্থাৎ তাঁহার 'থ্রি এসেস্ অন্ রিলিজিয়ন' এবং তাঁহার 'ইউটীলিটেরিয়া-নিজম্' অর্থাৎ হিতবাদের কোন কোন ভাব সুরেন্দ্র বাবুর ধর্ম্মমতের অভ্যন্তর হইতে কখন কখন মাথা ঝাড়া-

ইতে দেখা যায়। ফলতঃ সুরেন্দ্র বাবুর ধর্ম্মমত 'কেট কেট গরম' বিশেষ; ইহাতে ঘি আছে, মিছরি আছে, সুজি আছে, মরিচ আছে—জল নাই। নানাস্থান হইতে সংগৃহীত নানাপ্রকার মত ইচ্ছামত কাটিয়া, ঝুড়িয়া, ছাটিয়া এবং তাহার সহিত আপনার মত কিছু কিছু মিশাইয়া, সুরেন্দ্র বাবু এই অত্যদ্ভূত খিচুড়ী বানাইয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু যে ইংরাজিতে যথেষ্ট কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সুরেন্দ্র বাবু বিবাহিত পুরুষ। তাহার একটি পুত্র-সন্তান হইয়াছে। ছেলেটি দেড় বছরের—স্ত্রীর বয়স প্রায় কুড়ি। সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় থাকেন, কদাচ বাটী আসিলে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। স্ত্রী-পুত্র-সম্বন্ধেও সুরেন্দ্র বাবুর মত অদ্ভূত। তিনি বলেন, তাহারা আমার —এই ভাবটাই সুখের। তাহারা সুখসাধক বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং প্রয়োজন-ব্যতীত তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতার আবশ্যকতা নাই। তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বা বুকে করিয়া ফিরিবার কোন দরকার নাই। যেহেতু, তাহারা যে ভাবে যেখানেই থাক, আমারই থাকিবে। সংসারে যত বস্তু আমার হইবে, ততই সন্তোষের বৃদ্ধি হইবে। সুরেন্দ্র বাবুর দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্য-স্নেহের পরিচয় তাঁহার এই মতেই প্রকাশ। সুরেন্দ্র বাবুর উচ্চশিক্ষা সার্থক।

অধিকার-মাত্রেই শক্তি-সম্ভূত; এই মত সুরেন্দ্র বাবু অনেক স্থলেই প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন, আমি যদি ইন্দ্রিয়াসক্ত স্বেচ্ছাচারী হই, তাহাতে আমার স্ত্রীর আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই; কারণ শক্তি, সামর্থ্য, পদ ও মানে তাঁহার অপেক্ষা আমি বড়। তিনি ছোট, আমি বড়—তিনি দুর্ব্বল, আমি সবল—তিনি অধীন, আমি প্রভু: তিনি ব্যাভিচারিণী হইলে আমি তাঁহার যথোচিত দণ্ড দিব; যেহেতু, তাঁহার তাদৃশ ব্যবহারে তাঁহার দেহের উপর আমার যে আধিপত্য ছিল, তাহার অন্যথা ঘটিতেছে। তিনি আমার সম্পত্তি—আমি নিজ সম্পত্তি এক মুহূর্ত্তের জন্যও হস্তান্তরিত হইতে দিব কেন? আমি তাঁহার সম্পত্তি নহি—আমি যাহা কেন করি না, তিনি তাহাতে কথা কহিবার কে? বলবান্ দুর্ব্বলকে দখলে রাখাই জগতের নিয়ম। আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের দেশ—চিরদিন আমাদেরই ছিল। কোথা হইতে মাসিডনের অলেক্জণ্ডর ইহা দখল করিতে আসিলেন। তাঁহার দলিল কি? জোর। তাহার পর পাঠানেরা মালিক হইলেন। কেন? জোর। তাহার পর মোগলেরা এ দেশের বুক জুড়িয়া বসিলেন। অপ-রাধ? জোর। আর এখন ইংরাজেরা এদেশ মারিয়া লইয়া সুখের রাজত্ব বসাইয়াছেন। কারণ কি? জোর। ইতিহাস তো কাহাকেও নিন্দা করে না, বরং এবংবিধ

পরস্বাপহারীর বীরত্বেরই পূজা করে। সুতরাং দৈহিক শক্তি বা বল-প্রভাবে দুর্ব্বলকে অধীন করাই সাধুসম্মত সুব্যবস্থা। অতএব বলিতে হইবে, শুভক্ষণে সুরেন্দ্র বাবু হোয়টলে, হেমিল্টন, বেন, মিল, জেভনস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লজিক শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্র বাবু বিজ্ঞানের বড় ভক্ত। ইংরাজি বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বহু বিষয় তিনি আলোচনা করিয়াছেন। পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ণ, চিকিৎসা ও শারীরবিদ্যা, তাপশাস্ত্র ও তাড়িততত্ত্ব, তিনি বিশেষ করিয়া আলোচনা করেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে তিনি জগতের সার-সম্পত্তি ও জ্ঞানরাজ্যের পরমধন বলিয়া মনে করেন। কেবল মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র অর্থাৎ মেটাফিজিকস্, সাইকলজি প্রভৃতি মেণ্টাল সায়ান্সের প্রকার-ভেদ-সমূহ তাঁহার মতে অনর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র। তৎসমস্ত অধ্যয়নে সময়হানি ভিন্ন কোন লাভ নাই। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য অধ্যাপক-গণকে তিনি ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং কেবল এই বিষয়েই তাঁহার নিকট পাশ্চাত্য অধ্যাপকেরা হীন-পদস্থ। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের অঙ্গীভূত লজিক শাস্ত্রকে তিনি প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। তিনি বলেন, লজিকের গোলকধাঁদায় ফেলিয়া হয়কে নয় করিবার বড় সুবিধা, অতএব লজিক অবশ্য আলোচ্য ও অতি প্রয়ো-জনীয় শাস্ত্র।

সুরেন্দ্র বাবু বলেন, বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর জগতের কতই শ্রীবৃদ্ধি হইবে. তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না। বিজ্ঞানের অত্যুন্নতি অবশ্যই কালে হইবে। বিজ্ঞান-বলে জগতে জরা-মরণ থাকিবে না, যৌবনটা চিরদিনই বাধিয়া রাখা যাইবে, চুল পাকিবে না, দাঁত পড়িবে না, মৃত্যু হইবে না; যদি হয়, তবে ইচ্ছামৃত্যু হইবে, ইচ্ছাগামী রথ হইবে, সদ্য গাছ পুঁতিয়া সদ্যই তাহার ফল খাওয়া যাইবে, স্ত্রী-পুরুষে দেখাসাক্ষাৎ না থাকিলেও যন্ত্র-সাহায্যে সন্তান হইবে, মূল পদার্থ অর্থাৎ এলিমেণ্টসের রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগে এরূপ খাদ্য প্রস্তুত হইবে যে তাহাতে কৃষিকর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিস্ময়জনক ব্যাপার কালে ঘটিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। এ সকল আপাততঃ হাস্যজনক বলিয়া কেহ বিবেচনা করিলে, তিনি বলিয়া থাকেন, মনুষ্য চিরদিনই এইরূপ অবিশ্বাসী প্রত্যক্ষ ব্যাপার ভিন্ন বিজ্ঞান মূর্খ মানবেরা কিছুই প্রণিধান করিতে পারে না। যখন রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিজ্ঞানের সামান্য সামান্য আবিষ্কারের কথা উঠিয়াছে, তখনও মূর্খেরা এইরূপে হাসিয়াছে এবং বিদ্রূপ করিয়াছে। তাহাদের হাস্য-পরিহাস চিরদিনই আছে। বিজ্ঞান সে বিদ্রূপবাণে মরিয়া যায় নাই—কখনও যাইবে না। প্রাচীন আর্য্যগণের পুষ্পরথ, ইচ্ছামৃত্যু,

সহস্র বর্ষ পরমায়ু, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়া তিনি বলেন, এই সকল বিষয় বিচার করিয়া পূর্ব্ব-কালে ভারতে অত্যুন্নতি হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই; বিশেষতঃ তাহাদের ধর্ম্ম, এবং বহুবাহু, বহুবদন ও বহুনেত্রযুক্ত দেবতা দেখিয়া, তাহাদিগকে মানসিক উন্নতিবিহীন অতি বর্ব্বর ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যায় না। কৃতবিদ্য সুরেন্দ্র বাবুর জ্ঞান সর্ব্বতোমুখী বলিতে হইবে।

সুরেন্দ্র বাবু সতত কলিকাতায় থাকেন। সম্প্রতি তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাটী আসিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিয়া তিনি পুনরায় কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনিই বিষয়ের মালিক—বিষয়কর্ম্ম স্বয়ং না দেখিলে চলে না। কাজেই তাহাকে আবার বাড়ী আসিতে হইয়াছে। দুই মাস কাল নিয়ত তিনি বাটীতেই আছেন।

এই সুরেন্দ্র বাবু প্রায়ই সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অশ্বারোহণে বায়ু-সেবনার্থ বাহির হন। গ্রাম অতি কদর্য্য, তাহাতে বগিফীটন্ চলিবার পথ নাই। তিনি বাহির হইলে, ছেলে পিলে, মেয়ে-পুরুষ সকলেই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, পথের পাশে ধাইয়া আইসে। একে তিনি জমিদার তাহাতে তাঁহার প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়া, তাহার উপর তাঁহার অত্যদ্ভুত সাজ-সরঞ্জাম ও বেশ-ভূষা—সকলই

তাহাদের বিস্ময়জনক। আজি সুরেন্দ্রবাবু হারাধন নন্দীর বাটীর পাশ দিয়া অশ্বারোহণে হাওয়া খাইতে চলিয়াছেন। তাঁহার অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া, হারাধনের মা ও গিরিবালা বাহিরে আসিল। গিরিবালা গাঁয়ের মেয়ে সুতরাং একটু লজ্জা কম। গিরিবালার কোলে তাহার ভাইপো। তাড়াতাড়ি আসিতে হইতেছে, এজন্য বড় আলু-থালু বেশে গিরিবালা বাহিরে আসিয়াছে। তাহার আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি অবেণীসংবদ্ধ-তাহার বস্ত্র একটু স্থানভ্রষ্ট, অঞ্চলাগ্র ভূলুণ্ঠিত। সমুজ্বল নয়ন উৎসাহ ও কৌতুহল হেতু আয়ত ও প্রদীপ্ত। গিরিবালা কিয়দ্দূর আসিয়াই অশ্ব ও অশ্বারোহিকে দেখিতে পাইয়া আর পা বাড়াইল না। এক পা যেমন বাড়াইয়া ছিল, তাহা তেমনই থাকিল। গিরিবালা তখন ভুবনমোহিনী। এই শোভাময়ী সুন্দরী অশ্বাসীন সুরেন্দ্র বাবুর চক্ষুতে পড়িল। বলা বাহুল্য, তিনি মোহিত হইলেন। অশ্ব চলিতে লাগিল; কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর দৃষ্টি আর কোন দিকে ফিরিল না। অশ্ব অনেক দূরে গেলে, যখন গিরিবালাকে দেখার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল তখন সুরেন্দ্র অশ্ব ফিরাইলেন—পুনরায় গিরিবালার রূপরাশি তাহার নয়নে পড়িল। অশ্ববল্গা সংযত করিয়া ধীরে ধীরে গিরিবালার রূপসুধা পান করিতে করিতে সুরেন্দ্রনাথ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেদিন সুরেন্দ্র বাবুর আর বায়ুসেবন হইল

না। তিনি বৈঠকখানায় আসিয়া ডাকিলেন,—"মধু—মধু!"

করজোড়ে ঝটিতি মধু খানসামা বাবুর সম্মুখস্থ হইলে, তিনি আজ্ঞা করিলেন,—"বামা মালিনীকে এখনই ডাকিয়া আন্।"

মধু চলিয়া গেল। সর্ব্বনাশের বীজ রোপিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন দিন কাটিয়া গেল। ইহারই মধ্যে কি করিয়া কি হইল জানি না,—গিরিবালা কিন্তু আজি সুরেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায়। গিরিবালার ভাব দেখিয়া সে যে দায়ে পড়িয়া আসিয়াছে, বা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনা হইয়াছে, এরূপ বুঝা যায় না। মনুর আমলে আট প্রকার বিবাহ চলিত ছিল; তাহার মধ্যে রাক্ষস ও পৈশাচ দুই রকম। সুরেন্দ্র বাবু এই আর্য্যধর্ম্মবিলুপ্ত দেশে, শেষোক্ত দুই রকম বিবাহও চালাইবার জন্য কয়েকবার পথ দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান কালে একদল কৃতবিদ্য, পুরাতন ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার ইংরাজিমতে মাজিয়া ঘসিয়া পুনরায় বাহাল করিবার চেষ্টায় আছেন—অবশ্য নাম কিনিবার জন্য। তাঁহাদের একদল স্তাবক অর্থাৎ গোঁড়া আছে। স্তাবক নহিলে কাজের জুত বাঁধে না। কবির দলেও এই প্রকার গোঁড়া থাকিত। তাহারা বুঝুক না বুঝুক, বাহবা দিয়া দেশ মাথায় করিত। যে দলের গোঁড়া বেশী থাকিত ও গলাবাজিতে বিশেষ পটু হইত, সেই দলই প্রায়ই জিতিয়া যাইত। কিন্তু শেষ টিকিত কি না সেটা বড় সন্দেহের বিষয়। গোঁড়ারা প্রায়ই কিছু প্রত্যাশী।

যে বলিয়াছিল যে, আমি আলুরও চাকর নহি, পটলেরও চাকর নহি, চাকর হুজুরের—সুতরাং হুজুর যাহা ভাল বলিবেন, তাহাই ভাল, সে গোঁড়া বড় বেকুব—কিন্তু কথাটা বড় ঠিক বলিয়াছিল। এখনকার কালের লোকও শক্ত—তাহাদের গোঁড়াও শক্ত। এখনকার গোঁড়ারা, উচিত হউক অনুচিত হউক, যাহাকে খুব বাড়িতে দেখে এবং বুঝে যে,সে নামিবার যোগ্য হইলেও তাহাকে সহজে নামান যাইবে না, আর তাহার বাক্যে তাহার অনুগ্রহে অনেক উপকার হইবে, তাহারই গোঁড়ামি করিতে আরম্ভ করে। সে গোঁড়ামিও বেশ কায়দা-মাথা। সে গোঁড়ামি এমনই তেল মাথান যে, ধরিতে গেলেই ফস্‌কাইয়া যাইবে। এ গোঁড়ামির একটা প্রধান সুখ এই যে, যাহার গোঁড়ামি করা যায়, সে আবার গোঁড়াদের মর্য্যাদা বড় বাড়াইয়া দেয়। গোঁড়াদের বড়লোক খাড়া করিতে পারিলে, যাহার গোঁড়ামি করা যায়, সে খুব বড় লোক হইয়া পড়ে। গোঁড়ারাও খুব বড়লোকের সুখ্যাতি পাইয়া মনুমেণ্টের মত না হউক, অন্ততঃ লাল গির্জ্জার মত বড় হইয়া উঠে। ইংরাজিতে ইহাকে 'মিউচুয়াল এডমিরেসন্ বলে। ইহার মূল্য কি, ইংরাজেরা বেশ জানেন। আমরা ইংরাজদের নিকট হইতে মিউচুয়াল এডমিরেসন্ শিখিয়াছি' কিন্তু ইহার মূল্য শিখিতে পারিয়াছি বোধ হয় না। যাহা হউক বর্ত্তমান কালের গিল্টি করা হিন্দুধর্ম্ম-

প্রবর্ত্তকগণকে গোঁড়ারা 'রিভাইভালিষ্ট' অর্থাৎ পুনঃপ্রবর্ত্তক নাম দিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ, মনুর মতে যেরূপভাবে দুই-চারিবার আসুর ও পৈশাচ বিবাহ স্বয়ং প্রাকটিকালি অর্থাৎ হাতেকলমে চালাইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তিনি গোঁড়াদের দ্বারা 'রিভাইভালিষ্টগণের' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে সংস্থাপিত হইবার যোগ্য। সুরেন্দ্র বাবু যেরূপ অর্থশালী ও সুশিক্ষিত লোক, তাহাতে তাঁহার চারিদিকে বিস্তর গোঁড়া লাগিবার সম্ভাবনা ছিল। হায়! ধর্ম্মের সুমর্ম্মজ্ঞ অভাগা সুরেন্দ্রনাথ, কেন তুমি দলে না মিশিয়া হেলায় এই প্রতিপত্তির সুযোগ হারাইলে?

গিরিবালা ইচ্ছার সহিত সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় আসিয়াছে। তাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিতে হয় নাই। তাহার এই ইচ্ছাটি কিন্তু আপনি হয় নাই— এটুকু তৈয়ার করিবার জন্য সুরেন্দ্র বাবুর বামা মালিনীকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছে। বামা অনেক সুকৌশলে, আবশ্যকমত অনেক ছিটা-ফোটা লাগাইয়া, গিরিবালার মতি ফিরাইয়াছে। সে এ শাস্ত্রে বড় সুপণ্ডিতা।

হায় লোভ! হায় সুখের আশা! তোমরা এ সংসারে নিরন্তর কত অঘটনই না ঘটাইতেছ। তোমাদেরই হাতে পড়িয়া শূর্পনখা নাক কান হারাইয়াছেন, রাবণ সবংশে মরিয়াছেন, ইন্দ্র সহস্র-লোচন হইয়াছেন, চন্দ্র কলঙ্কী হই-

য়াছেন, আকবর বাদসাহ চোরের অধীন হইয়াছেন, বিধবা মেহরুন্নিসা নুরজাহাঁন হইয়াছেন, স্কটের রাণী মেরী মাথা হারাইয়াছেন, রোমের টাকুইন্স মারা পড়িয়াছেন, পৃথিবী জুড়িয়া কত অনর্থই না ঘটিয়াছে। তবে আর বেচারা গিরিবালার এত কি দোষ? সংসারের মহৎ অমহৎ অগণ্য লোকই যদি লোভের হাত না ছাড়াইতে পারিয়া থাকে, যদি এত লোক অধিক সুখ, অধিক ভোগ এবং অধিক বিলাসের আশায় দিশাহারা হইয়া থাকেন, তবে বালিকা গিরিবালা ঐ সাগরে ঝাঁপ দিবে, ইহা বড় আশ্চর্য্য কথা নহে।

ফলতঃ বামার অব্যর্থ সন্ধানে গিরিবালা-হরিণী বিদ্ধ হইল। তাহার পর সে সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায়। এ পাপ-পঙ্কিল ব্যাপারের অন্যান্য অংশ আমরা চিত্রিত করিব না। গিরিবালা বড় আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। পাপের পথ বড় ক্রমনিম্ন ও অতিশয় পিচ্ছল। একবার অসাবধানে নীচের দিকে পা ফেলিলে আর রক্ষা নাই। বিশেষ বলবান ব্যক্তি ভিন্ন, সে পিচ্ছল পথ হইতে কেহই উঠিয়া আসিতে পারে না; সকলকেই উত্তরোত্তর অধিকতর অধোগতির পথে নামিয়া অচিরে সমাজকলঙ্ক অতি জঘন্য জীব হইয়া উঠিতে হয়। পাপের পথের প্রথম ভাগটা সুরভিকুসুমাকীর্ণ, অতি মনোহর। সে পথে বেড়াইবার লোভ সংবরণ করা বড়ই কঠিন। লোভের

বশবর্ত্তী হইয়া যে একবার সে পথে পা দেয়, সে উজ্জ্বল আনন্দের মদিরায় প্রমত্ত হইয়া উঠে, এবং কোন প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য না করিয়া, সেই পথে বিচরণ করিতে করিতে শেষ-সীমায় উপস্থিত না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। শেষে যে জীবনান্তকর কণ্টকাকীর্ণ ঘোরারণ্য এবং অনন্ত বিষধরের অগণ্য দংশন, তাহা কেহ একবার ভাবেও না। গিরিবালা এখন অতি লোভে পাপের পথে পদার্পণ করিয়াছে। অতি আনন্দ-বিধায়ক কুসুম-সৌরভে তাহার প্রাণমন পুরিয়া গিয়াছে, অপূর্ব্ব আনন্দে তাহার মস্তিষ্ক প্রমত্ত হইয়াছে, সে এখন অননুভূতপূর্ব্ব সুখোপভোগ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে।

যাও গিরিবালা! হাসিতে হাসিতে পাপীয়সি, এই আপাতমনোহর পথে নামিতে থাক। কিন্তু ওকি!—তুমি অত ব্যস্ত কেন? এই সুখময় আনন্দময় পথে অগ্রসর হইবার জন্য তোমার ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই—আপনিই উত্তরোত্তর তোমার সুখসমূহ তোমাকে চেষ্টা করিয়া সবলে টানিয়া লইয়া যাইবে এবং তোমার পরিগৃহীত পন্থার শেষ সীমায় উপনীত করিয়া দিবে। কিন্তু হায়! তখন কি হইবে, তাহা একবারও তোমার মনে হইতেছে কি? তখন অনন্ত যন্ত্রণা তোমার সহচর, জীবন্ত নরক তোমার নিয়তি হইবে। অবিরত রোদন, নিরন্তর আর্ত্তনাদ, অবিশ্রান্ত চীৎকার, তখন তোমার অপরিহার্য্য

অবলম্বন হইবে। আর তোমার ফিরিবার সামর্থ্য নাই। তুমি ক্ষুদ্রহৃদয়া বালিকা—ফিরিবার মত বল তোমার হৃদয়ে নাই। কিন্তু, তুমি এত ব্যস্ত কেন? অচিরে সকল সুখ আয়ত্ত করিবার জন্য তোমার এত আকিঞ্চন কেন? ধীরে ধীরে, একটু দেখিয়া শুনিয়া, পা বাড়াইলে চলিত না কি? ওকি!—তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ কেন, রাক্ষসি? তোমার পা টলিতেছে কেন, অভাগিনি? তোমার বাক্য জড়তাপূর্ণ অসংবদ্ধ কেন, পাপীয়সি? বুঝিয়াছি, তুমি প্রাণনাথ সুরেন্দ্র বাবুর হুইস্কির প্রসাদ পাইতে শিখিয়াছ। ইহারই মধ্যে, এই দশ বারো দিনের মধ্যেই, যখন তুমি এত দূর আসিতে পারিয়াছ, তখন তোমার সর্ব্বনাশ অতি সন্নিকট। যাও মূঢ়ে, জীবন্ত নরকের দাবানলে পুড়িবার জন্য প্রাণকে প্রস্তুত করিয়া রাখ। তোমার সম্মুখে ঐ কাল বিষধর ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে—এখনই দংশন করিয়া, অসহ্য যাতনায় তোমার তাবৎ সুখের আলোক নিভাইয়া দিবে, তোমাকে জীবন্মৃত করিবে; কিন্তু মৃত্যু হইবে না—সে অনন্ত অবক্তব্য অচিন্ত্যনীয় যাতনা ভোগ করার অপেক্ষা মৃত্যুর জন্য তুমি সকাতরভাবে কতই প্রার্থনা করিবে. কিন্তু মৃত্যুও তখন তোমার উদ্ধারার্থ উপস্থিত হইবে না। কেন অভাগিনি! পূর্ব্বে মরিতে পার নাই? কেন গিরিবালা! এই নরকে ডুবিবার পূর্ব্বে তোমার জীবনান্ত হয় নাই?

এইরূপই চলিতে লাগিল—গিরিবালা সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিল। পোড়া পরশ্রীকাতর লোকে এ কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু গিরিবালার প্রথমে লোকনিন্দার যে ভয় ছিল, এখন আর সে ভয় নাই। এখন লোকে এ কথা কহিতেছে শুনিয়া, গিরিবালা সগৌরবে হাসে। যাহাদের দেখিলে গিরিবালা মুখ হেট করিবে ভাবা গিয়াছিল, তাহাদের দেখিলে সে এখন বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায়। একদিন, গিরিবালা মদ খাইয়া বড় ঢলাঢলি করিয়াছিল এবং সম্পর্কিত এক খুড়ার সহিত মুখোমুখী করিয়া বড় ঝগড়া করিয়াছিল। কথাটা নিতান্ত লজ্জাজনক হইলেও, গিরিবালা গৌরবাত্মক বলিয়াই স্থির করিয়া লইল। গিরিবালা, সোণার বালা হাতে দিয়া, সিমলার কাপড় পরিয়া, কাণে মাকড়ি ঝুলাইয়া, মদ খাইতে থাকিল ও প্রতিদিন সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় যাতায়াত করিতে লাগিল। আরও মাস দুই তিন এইরূপে কাটিয়া গেল। সুরেন্দ্র বাবুর প্রবল প্রতাপ। তথাপি লোকে হারাধন নন্দীর পরিবারবর্গের সহিত আহার-ব্যবহার বন্ধ করিল। গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব; সুতরাং খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার খুব কম। কাজেই এ কথাটা লইয়া আপাততঃ বড় গোল হইল না। গিরিবালা তখন পূর্ণবেগে পাপের পথে চলিয়াছে। অতএব এ সামাজিক শাসন সে ঘৃণার সহিত

উপেক্ষা করিল; কিন্তু স্পর্দ্ধিত লোকগুলার উপর তাহার বড় রাগ হইল। সে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে এক দিন সুরেন্দ্র বাবুকে সমস্ত কথা জানাইয়া প্রতিকারের জন্য সাগ্রহে অনুরোধ করিল। সমস্ত কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"তোমার অনুরোধ রক্ষা, না করিয়া আমার কোন কাজই হয় না। কিন্তু গিরিবালা, প্রাণেশ্বরি, তোমার এই অনুরোধটি নিতান্ত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। কেন, বুঝাইয়া দিই। ডাক্তার পার্কস্ সাহেবের স্বাস্থ্য-তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ 'হাইজিন' অর্থাৎ স্বাস্থ্য শাস্ত্রসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান পুস্তক—তিনি সেই গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গুরুভোজনের তুল্য স্বাস্থ্য-বিরোধী কার্য্য আর কিছুই নাই। নিমন্ত্রণে ভোজন করিলে, নানাবিধ আয়োজন হেতু বিশেষতঃ অন্যায় অনুরোধে পড়িয়া, লোকের গুরুভোজন ঘটে; তাহাতে সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি শরীরের বিরুদ্ধে অতিশয় অত্যাচার করা হয়। হিন্দুরা বলেন, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।' অতএব গিরিবালা, যাহাতে শরীর সুরক্ষিত না হয়, সে কর্ম্ম নিতান্ত অন্যায়। এরূপ আহার করিলে অতি ভয়ানক দোষ হয়, তাহা চিকিৎসক-প্রধান শ্রীযুক্ত সার্জ্জন মেজর ধর্ম্মদাস বসু মহাশয় তাঁহার 'স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গিরিবালা. তোমরা আমার পরমাত্মীয়, এবং তোমাদিগের ইষ্টানিষ্টের

সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এরূপ স্থলে তোমাদের নিমন্ত্রণ খাওয়া বন্ধ করিতে পরামর্শ দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। যখন সমাজ আপনিই তোমাদের এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার পক্ষে কদাচ কর্ত্তব্য নহে।”

হরিবোল হরি! গ্রামের পোড়ারমুখো ও পোড়ারমুখীদের মাথায় জুতা মারিয়া গিরিবালা মনের রাগ মিটাইবে ভাবিয়াছিল, তাহার সফলতা হওয়া দূরে থাকুক, বাবু যে তাহাদের একটা মুখের কথা বলিবেন, সে আশাও থাকিল না। সে সুরেন্দ্র বাবুর শাস্ত্র ও বিজ্ঞান-সঙ্গত বাক্যাবলীর তাৎপর্য্য বুঝিল না—কোন প্রতিবাদও করিতে পারিল না; কিন্তু মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইল।

গিরিবালা অনেক আশা করিয়াছিল; বামা তাহার সম্মুখে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। প্রথমে গিরিবালা অননুভূত-পূর্ব্ব ইন্দ্রিয় সুখে এতই মোহিত হইয়াছিল যে, অন্যান্য সুখের প্রসঙ্গ তাহার বড় মনে পড়ে নাই। তাহার বসন-ভূষণ অনেকই হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অসীম আশার তুলনায় এখনও সকলই অপূর্ণ। গিরিবালা, স্বেচ্ছায় হউক, বা লোকের প্ররোচনায় হউক, একে একে, সুরেন্দ্র বাবুর নিকট আপনার প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। অনর্থক বাক্যাড়ম্বর শ্রবণে কর্ণকুহরের পরিতৃপ্তি ভিন্ন, আর কোন লাভ হইল না। গিরিবালার

মনস্তাপ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু সে তখন নিতান্ত অধঃপতিতা; সুতরাং সুসঙ্গত ক্রোধ ও তেজ তাহার নাই। কেবল ঘৃণিত চিন্তা ও কলঙ্কিত কামনাই তাহার তখন সহচর।

গিরিবালার এই কলঙ্কের ঢাক সজোরে বাজিতে বাজিতে ক্রমে শান্তিপুরে হারাধন নন্দীর কর্ণসমীপে শব্দায়মান হইয়াছে। অপদার্থ হারাধন, কথাটা শুনিয়া মর্ম্মাহত বা লজ্জিত হয় নাই; বরং ব্যাপারটা বিশেষ লাভজনক বলিয়াই সে মনে করিয়াছে। সে স্বয়ং একটা বেশ্যার কৃপায় গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেছে, আবার তাহার গুণবতী ভগ্নী একটা লম্পটের অনুগ্রহ ভোগ করিতেছে; সুতরাং সংসারের সকল কষ্টই অতঃপর ঘুচিয়া যাইবে মনে করিয়া, সে বড় আহ্লাদিত হইয়াছে।

ক্রমে তিন চারি মাস কাটিয়া গেল, তথাপি হারাধনের ঘরে চন্দ্র-সূর্য্যের উঁকি দেওয়া বন্ধ হইল না, লক্ষ্মী ঠাকুরাণীও দুই বেলা ভাল করিয়া তাহার পুত্র, কন্যা, জননী ও পত্নীর উদরে প্রবেশ করিলেন না, এবং চারিদিকে অনন্ত লজ্জার রাশি দেখিয়া, লঘু সূতার কাপড় তাহাদের লজ্জা নিবারণ করার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। হারাধন এ সকল সংবাদ পাইয়া বড়ই চটিয়া উঠিল, এবং ইহার যথাসম্ভব প্রতিকার করিবার বাসনায় সে জন্মভূমিতে আসিয়া দর্শন দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হারাধন বাটী আসিয়াছে বলিয়া গিরিবালাকে সঙ্কুচিতা হইতে হইল না; সে সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় যেরূপ যাতায়াত করিতেছিল, সেইরূপই করিতে থাকিল। সে হারাধনের সম্মুখে হাতের বালা, কাণের মাকড়ি বা পরিধানের কালাপেড়ে ধূতি কিছুই লুকাইল না। ভাই-ভগ্নী উভয়েই অতুলনীয়। হারাধন প্রতিদিনই গিরিবালার সহিত ফুস্‌ফুস্ গুজ্‌গুজ্ করিয়া অনেক কথা কহিতে লাগিল। তিন চারিদিন পরে, একদিন সন্ধ্যার পর, গিরিবালা সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, বাবু সেখানে নাই। এরূপ ঘটনা আর কোন দিন হয় নাই, এমন নহে। ইদানীং বাবুর অন্তর্দ্ধান সততই ঘটিত, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হইত না। অদ্য বাবুর অদর্শন বহুকালব্যাপী হইল। রাত্রিশেষে বাবু সুরাপহতবুদ্ধি হইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। গিরিবালা তখন রাগের অভিনয় দেখাইবার জন্য সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, শয়ান রহিয়াছে। সে স্থির জানিত যে, সুরেন্দ্র এই অপরাধের নিমিত্ত কুণ্ঠিত হইবে ও তাহার নিকট মানভিক্ষা চাহিবে। কিন্তু সুরেন্দ্র, তাহার আশানুরূপ

কোন ব্যবহারই না করিয়া নীরবে এক সোফার উপর শয়ন করিলেন। অনেকক্ষণ গিরিবালা অপেক্ষা করিল, কিন্তু বাবুর মানভিক্ষার কোন লক্ষণই বুঝিতে পারিল না; বরং তিনি স্বচ্ছন্দে নিদ্রিত হইয়াছেন বলিয়াই তাহার মনে হইল। তখন সে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক-রূপ জল্পনা করিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল এবং সুরেন্দ্র বাবুর সোফার নিকট আসিয়া তাঁহার গায়ে হাত দিল। যে অতি মধুর তেজ স্ত্রীজাতির ভূষণ-স্বরূপ, তাহা গিরিবালার আর নাই। কেন সে মরিল না?

করস্পর্শে সুরেন্দ্র বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বলি-লেন,—"কে ও গিরিবালা? তুমি ঘুমাইতেছিলে না? তোমাকে ঘুমাইতে দেখিয়া আমি বড় নিশ্চিন্ত হইয়াছি-লাম। যাও, ঘুমাও গিয়া। রাত্রি আর বড় নাই; শেষ রাত্রিতে জাগরণ বড়ই অনিষ্টকর।"

আর কোন স্ত্রীলোক হইলে অভিমানে মরিয়া যাইত। সে গৌরবের অভিমান অধঃপতিতা গিরিবালা কোথায় পাইবে? সে রাগও করিল না, সুরেন্দ্র বাবুর পরামর্শানু-সারে শয়ন করিতেও গেল না। বলিল,—"অসুখ হয় হউক, আমি এখন আর ঘুমাইব না। আমার—"

তাহাকে বাক্য সমাপ্ত করিতে না দিয়া, সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"তবে আমাকে আর ত্যক্ত করিও না; আমি এখন ঘুমাইব।"

এ উপেক্ষাও হতভাগিনী সহিয়া রহিল। ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় সে তো সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া উঠিল না; উৎপীড়িতা সিংহিনীর ন্যায় সে তো গর্জ্জন করিল না; অপমানিতা নায়িকার ন্যায় সে তো আরক্ত নয়নে গ্রীবা বক্র করিয়া দাঁড়াইল না। সে হাসি হাসি মুখে বলিল,—"তোমাকে আমি কয়টা কথা বলিব; সেই কয়টা কথা শুনিয়া তুমি ঘুমাও বাবু আমি আর ত্যক্ত করিব না।"

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"বল—শীঘ্র শীঘ্র কথার শেষ করিয়া ফেল—রাত্রি আর নাই।"

সুরেন্দ্র বাবুর আগমনে বিলম্ব হেতু, বুঝি বা গিরিবালা ঝগড়া করিবে; সুরেন্দ্র বাবু তাহার মান ভাঙ্গেন নাই বলিয়া, বুঝি বা সে বড় অভিমান করিবে; তাহার সহিত একটাও কথা না কহিয়া সুরেন্দ্র বাবু নিদ্রাগত হইয়াছেন বলিয়া, বুঝি বা সে বকাবকি করিবে; সুরেন্দ্র বাবুর বাক্যে বিস্তর অনাস্থার পরিচয় পাইয়া, বুঝি সে রোদনের হাট বসাইবে। গিরিবালার এত প্রয়োজনীয় কথা কটা কি, শুনিবার জন্য বড়ই আগ্রহ হইতেছে। গিরিবালা বলিল,—"তুমি যে আমাকে বাড়ী করিয়া দিবে কথা ছিল, তাহা কবে দিবে?"

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"এই কথা, না আরও কিছু আছে?"

গিরিবালা বলিল,—"আমাকে এক গা গহনা দিবে

বলিয়াছিলে, তা কই? কালই আমাকে সব গহনা দিতে হইবে।”

সুরেন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞাসিলেন,—“আর কিছু বলিবে কি?”

গিরিবালা বলিল,—“নির্ভাবনায় আমার খাওয়া পরা চলে, এমন টাকা আমাকে দিবে কথা ছিল, তাহা আমাকে কালই দিতে হইবে।”

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—“তোমার কথা শেষ হইয়াছে বোধ হয়।”

গিরিবালা বলিল,—“হাঁ। ইহার কি উত্তর, বল।”

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—“উত্তর কাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিব। আজি থাক্।”

গিরিবালা বলিল,—“না, তা থাকিলে চলিবে না। উত্তর আজই দিতে হইবে।”

তখন সুরেন্দ্র হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া বলিলেন,—“তবে শুন গিরিবালা,—তোমাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাই আমি যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেছি, তাহার উপর আর একটি পয়সাও দিতে আমার ইচ্ছা নাই, আমি দিবও না।”

এতক্ষণে গিরিবালার ক্রোধ হইল এবং সে ঝগড়া করিতে সঙ্কল্প করিল। বলিল,—“দিবে না কেন? আমাকে মজাইয়া, আমার সর্ব্বনাশ করিয়া, আমাকে এত লোভ দেখাইয়া, এখন তোমার এই কথা?”

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"তোমার মত দুঃখিনী, সামান্যা স্ত্রীলোক আমার এই চমৎকার বৈঠকখানায় আসিতে পাইয়াছে, আমার এই অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিয়াছে এবং আমার মত লোকের সহিত তুমি আমি করিয়া কথা কহিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়াছে, ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য। তুমি যে সর্ব্বনাশের কথা বলিতেছ, তাহার এক বর্ণও আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার মত নীচঘরের স্ত্রীলোককে যে আমি গ্রহণ করিয়াছি, ইহাই তোমার অসীম আনন্দের ও গৌরবের কারণ হওয়া উচিত। আর তোমাকে লোভ দেখাইবার কোনই দরকার আমার নাই। যে ইচ্ছা করিলে ঘর জ্বালাইয়া দিতে পারে, মাথা কাটিয়া ফেলিতে পারে, স্বামীর শয্যা হইতে যুবতী স্ত্রীকে উঠাইয়া আনিতে পারে, একটা নিঃসহায় নিরাশ্রয় বিধবাকে আনিবার নিমিত্ত, তাহার কোনই লোভ দেখাইবার প্রয়োজন হইতে পারে কি?"

গিরিবালার মাথা ঘুরিয়া গেল। হায়! অভাগিনি! এ কলঙ্ক মনস্তাপ ধৌত করিয়া পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিবার জন্য তোর এখন ব্যাকুলতা হইতেছে না কি? না—না! গিরিবালা যখন পাপের ব্যবসায় করিতে শিখিয়াছে, সে যখন দেহ বিক্রয় করিয়া অর্থ অলঙ্কার ও অট্টালিকার কামনা করিতেছে, তখন তাহার হৃদয়ে অনুতাপের স্থান থাকিতে পারে না; তখন তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ও আত্ম-

সংশোধনের আশা একান্ত অসঙ্গত। সে ইন্দ্রিয়ভোগ-লালসায় এই পাপে ডুবিয়াছে, তাহার পাশব প্রবৃত্তি স্বল্প উপভোগেই নূতনত্ব-বিহীন হইয়াছে, এখন পাপীয়সী রূপ-যৌবনের বিনিময়ে অন্য লালসা-সমূহ চরিতার্থ করিবার উপাদান অন্বেষণ করিতেছে। মূঢ়ে! মন্দভাগিনি! তোর এই ঘৃণিত কলঙ্ক-কাহিনীর বহুলাংশই আমাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে হইল। লোক-শিক্ষার অনুরোধে যে সামান্য ভাগ লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে, তাহাই লিখিতে লেখনী কাতর ও অবসন্ন হইতেছে।

গিরিবালা অনেক দিন সুরেন্দ্র বাবুর সহিত এক প্রকার সমান ভাবে কাটাইয়াছে; সুতরাং কতকটা সমান সুরে কথা কহিতে তাহার সাহস হইয়াছে। সে বলিল—"সুরেন্দ্র বাবু, তুমি যে খুব বড়লোক, তোমার যে অনেক ক্ষমতা, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি তোমার কথা ঠিক রাখিবে না, আমার মত দুঃখি-নীকে আশা দিয়া নিরাশ করিবে, ইহা তোমার উচিত নয়। তুমি আমাকে যতদূর নিঃসহায় মনে করিতেছ, আমি ততদূর নিঃসহায় নহি। আমার দাদা আছেন, তারও কাজ-কারবার আত্মীয়-বন্ধু আছে। আমি দাদাকে কি বলিব, বল দেখি?"

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"তোমার দাদা অবশ্যই অতি বড় লোক। তিনি যখন ভগ্নীর উপার্জ্জনে অক্ষমতার

কৈফিয়ৎ চাহিবেন, তখন তাঁহাকে কি বলিয়া তুষ্ট করিতে হইবে, ইহা বাস্তবিকই একটা অতিশয় ভয় ও ভাবনার কথা। আমি তাঁহার ভয়ে কোথায় লুকাইব, ভাবিয়া আকুল হইতেছি। তুমি দয়া করিয়া তোমার ভাইকে বলিও, তিনি যেন রাগের ভরে আসিয়া, হাতে আমার মাথাটা কাটিয়া না ফেলেন?"

গিরিবালা এখন ভিখারিণী, সুতরাং তৃণাদপি লঘু; তাহাতে চরিত্রহীনা। সে আবার স্বর ফিরাইয়া বলিল,— "দেখ বাবু, তোমার অতুল সম্পত্তি। আমার ন্যায় দুঃখিনীকে কিঞ্চিৎ দিলে তোমার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, আমাকে তুমি দয়া না করিলে কে দয়া করিবে?"

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"দয়া—দয়া কেন করিব? দয়া আমি কাহাকেও করি না। যে দাসীর অযোগ্যা, তাহাকে আমি এত অনুগ্রহ করিয়াছি, আবার দয়া কি? দয়া অতি দুর্ব্বল হৃদয়ের কার্য্য—আমি কাপুরুষ নহি।"

গিরিবালা বলিল,—"ভাল, আমাকেই যদি দয়া করা তোমার অমত হয়, তাহা হইলেও তোমার ঔরসে আমার যে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এ কথা, এখনও আর কেহ না জানিলেও, তুমি তো জান—সেই গর্ভস্থ শিশুর প্রতি দয়া করিতে তুমি বাধ্য। ভাল, তাহারই একটা ব্যবস্থা কর।"

সুরেন্দ্র বাবু আবার হাসিয়া বলিলেন,—"এতকাল

বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা করিলাম কি জন্য? এইরূপ স্থলে কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক, বিজ্ঞান-পাঠে যদি তাহা না শিখিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে বৃথাই আমার জ্ঞান ও বিদ্যা। যে শিশু চিরদিন মনুষ্য-সমাজে লজ্জা পাইবে, পিতার নাম বলিতে কুণ্ঠিত হইবে, মাতার কথা উঠিলে, অধোমুখ হইবে,সে যাহাতে ভূমিষ্ঠ হইতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করাই তাহার প্রতি বিশেষ দয়া। বিজ্ঞান আমাকে সেরূপ দয়া প্রকাশের উপায় অনেক দিন শিখাইয়াছে, এবং আরও দুই চারি স্থলে বিজ্ঞানবলে আমি সেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান স্থলেও আমি যে তোমার গর্ভস্থ শিশুর প্রতি সেইরূপ দয়া প্রকাশ করিব, তাহার আর সন্দেহ কি?"

এত বিজ্ঞানের কথা গিরিবালা বুঝিতে পারিল না। সে স্থূলতঃ বুঝিল, সুরেন্দ্র বাবুর কথা বড় শুভসূচক নহে। সে আরও দুই চারিবার দুই চারি প্রকার কথা বলিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তখন সে অনর্থক বকাবকি অনাবশ্যক মনে করিয়া, শয্যায় গিয়া শয়ন করিল! সুরেন্দ্র বাবুও হাঁফ ছাড়িয়া অনতিকাল মধ্যে নাক ডাকাইয়া বাঁচিলেন।

ঘরের প্রান্তভাগে এক মার্বেল টিপয়ের উপর অসুরের বাটীর চেম্বর ল্যাম্প দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল; সুতরাং আলোকের অভাব ছিল না। গিরিবালা অনেক

ক্ষণ শুইয়া শুইয়া কি ভাবিল তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া সুরেন্দ্র বাবুর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। বুঝিল, বাবু গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। বাবুর বাক্স, ড্রয়র, চেষ্ট প্রভৃতির চাবি যেখানে থাকে, তাহা গিরিবালা জানিত। সে ধীরে ধীরে যথাস্থান হইতে চাবি সংগ্রহ করিল। একার্য্যে যে শব্দ হইল, তাহাতে বাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না দেখিয়া সে ধীরে ধীরে বাক্স প্রভৃতি খুলিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এবং বারবার নিস্পন্দ-ভাবে স্থির থাকিয়া, সে একে একে বাক্স প্রভৃতি হইতে বাছিয়া বাছিয়া বিস্তর সামগ্রী সংগ্রহ করিল। সংগৃহীত সামগ্রী-সমূহ সে একটি পুঁটুলি করিয়া বাঁধিল। তাহার পর চাবিগুলি যথাস্থানে রাখিয়া, বাবুর নিকটস্থ হইয়া দেখিল, তিনি সমান ভাবেই নিদ্রিত আছেন।

এ দিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। তখন গিরিবালা সাবধানে বস্ত্র-মধ্যে পুঁটুলি লইয়া বৈঠকখানা হইতে অবতরণ করিল, এবং ক্রমে নিম্নে সদর দরজার নিকটস্থ হইল। সেখানে রামসিংহ নামক দ্বারবান, কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে নিদ্রোত্থিত হইয়া, পিতলবাঁধান হুঁকায় প্রকাণ্ড নল লাগাইয়া, ভড়র্ ভড়র্ শব্দে সমস্ত দিনে যত তাম্রকূট ভস্মসাৎ করিবেন, তাহার প্রাথমিক অনুষ্ঠান করিতে-ছিলেন। গিরিবালা তাহাকে দরজা খুলিয়া দিতে বলিল। গিরিবালার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র, রামসিংহ হুঁকা রাখিয়া

ব্যস্ততা-সহকারে দ্বার খুলিয়া দিলেন। গিরিবালা ইদানীং বড় মাত্রা চড়াইয়া তুলিয়াছিল—সে আর দ্বারবান-সঙ্গে যাওয়া-আসার অপেক্ষা রাখিত না; সুতরাং নিঃসঙ্কোচে একাকিনী চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গিরিবালা বাটী আসিয়া দেখিল, একটি নূতন স্ত্রীলোক তাহাদের ভাঙ্গা ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। সে স্ত্রীলোক তরঙ্গিণী। হারাধন তরঙ্গিণীর নিকট দুই দিনের ছুটী লইয়া বাটী আসিয়াছিল; কিন্তু দুই দিনের স্থানে দশ দিন হইয়া গেল, তথাপি হারাধন-দিবাকর শ্রীমতী তরঙ্গিণীর-কুঞ্জাকাশে উদিত হইলেন না দেখিয়া. বিরহ-বিধুরা তরঙ্গিণী হারাধনের অন্বেষণে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। মূর্খ কালিদাসকে একটা প্রবোধ দিয়া আসা, তরঙ্গিণীর ন্যায় চতুরা স্ত্রীলোকের পক্ষে একটুও কঠিন কাজ নহে। সে সহজেই মূঢ় চক্রবর্ত্তীর চক্ষুতে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া এবং দুই তিন দিনের মধ্যে ফিরিবার আশ্বাস দিয়া, কালিদাস-রূপ আয়ানের নিকট অবসর লাভ করিল এবং হারাধন-রূপ শ্যাম নটবরের নিকটস্থ হইয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিল। তাহার আগমনে হারাধনের অহঙ্কার সীমা ছাড়াইয়া গেল। তরঙ্গিণী যে তাহাকে কত ভাল বাসে, তাহা এই ঘটনায় স্পষ্ট জানা যাইতেছে। এত ভালবাসার পাত্র যে, তাহার অহঙ্কার হইবে না কেন? হারাধন ও তরঙ্গিণী নিঃসঙ্কোচে

অনেক ভালবাসা-বাসির অভিনয় করিয়া, সকলের সমক্ষে আপনাদের দেবত্ব সপ্রমাণ করিল। আমরা তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম।

গিরিবালা বাটী আসিয়া, এই অলঙ্কৃতা সুপরিষ্কৃতা সুন্দরীকে আপনাদের ভগ্ন কুটীরে দেখিয়া সবিস্ময়ে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইল। গুনবান ভ্রাতা গুনবতী ভগ্নীর নিকট তরঙ্গিণীর পরিচয় প্রদান করিলেন। তরঙ্গিণীকে দেখিয়া গিরিবালা মোহিত হইল, এবং দাদার কৃপায় এই দেবীর সহিত পরিচয় হওয়ায়,সে সৌভাগ্যবান দাদার নিকট অনেক প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিল। তরঙ্গিণীর সহিত গিরিবালা নানাপ্রকার আলাপ করিতে লাগিল, এবং তাহার পরিগৃহীত পন্থা যে পরম সুখময় ও অতি শ্লাঘনীয়, তাহাতে তাহার আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। সে যখন সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ সহকারে তরঙ্গিণীর সহিত আলাপে রত আছে, সেই সময় তাহার দাদা অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসিল—"বলি, যা বলিয়াছিলাম, তাহার কি হইল, গিরি?"

গিরিবালা তখন আপনার কুক্ষি-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র পুঁটুলিটি বাহির করিয়া দাদার হস্তে দিল এবং বলিল,—"খোসামোদে, ঝগড়ায়, কিছুতে কিছু হয় নাই; শেষে তোমার পরামর্শ-মতে ইহাই সংগ্রহ করিয়াছি।"

হারাধন পুঁটুলির ক্ষুদ্রতা দেখিয়া, ভগ্নীর উপর বড়

অসন্তুষ্ট হইতেছিল। শেষে তাহা খুলিয়া ও তদন্তর্গত পদার্থ-সমূহ ভাল করিয়া দেখিয়া, তাহার আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তখন হারাধন, তরঙ্গিণী ও গিরিবালা তিনজনে সেই পুঁটুলির-মধ্যস্থ সামগ্রী-সমূহের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে ঘড়ী, চেন, আঙটি, মোহর, নোট, টাকা প্রভৃতি যে সকল সামগ্রী ছিল, তাহার সকলগুলির দাম নির্ণয় করা তাহাদের সাধ্যাতীত হইলেও ইহা তাহারা স্থির নিশ্চয় করিল যে, গিরিবালা প্রভূত বিত্ত সংগ্রহ করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

তখন তরঙ্গিণী বলিল,—"এ সকল দেখিয়া আমোদ করিলে তো চলিবে না। এখান হইতে না পলাইলে কোন মতেই রক্ষা নাই। তাহার ব্যবস্থা আগে কর।"

হারাধন বলিল, "তা তো বটেই। এখন পরামর্শ কি, বল।"

তরঙ্গিণী বলিল,—গিরিবালাকে লইয়া চল আমরা কৃষ্ণনগরে যাই। এই সকল জিনিস বেচিয়া যে টাকা হইবে, তাহার কিছু ভাঙ্গিয়া গিরিবালার অলঙ্কার গড়াইয়া দেও, আর কিছু দিয়া তাহার খাট বিছানা জিনিষ পত্র করিয়া দেও, আর কিছু তাহার হাতে রাখিয়া দেও। আর বাকী তুমি আপনার কারবারে লাগাও।"

হারাধন বলিল,—"বেশ কথা।"

পরামর্শটা গিরিবালারও বড় মনের মত হইল। এই-

বার সে তরঙ্গিণীর ন্যায় সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবে!

তরঙ্গিণী আবার বলিতে লাগিল,—"গিরিবালার শ্রীছাঁদ ভাল। দশ দিনের মধ্যেই একটা না একটা রাজা কি জমিদারের চখে পড়িয়া যাইবে। তাহার পর রাণীর হালে থাকিবে।"

এমন সুন্দর পরামর্শ সুবুদ্ধিমতী তরঙ্গিণী ছাড়া আর কেহ দিতে পারে কি? গিরিবালা তো আহ্লাদে আট-খানা। স্থির হইল, অপহৃত দ্রব্য-সামগ্রী আপাততঃ তরঙ্গিণীর হাতেই থাকিবে। কারণ, এমন বিশ্বাস-পাত্র এজগতে আর কে আছে? হারাধন, তরঙ্গিণী ও গিরি-বালা স্থির করিল, এ গ্রাম হইতে সরিয়া গেলেই তাহাদের সকল আশঙ্কা কাটিয়া যাইবে। তখন কেহই তাহাদিগের সন্ধানই পাইবে না; সুতরাং ধরিতেও পরিবে না।

যে টিপ, সেই ফোঁড়। যেমন পরামর্শ ধার্য্য হইল, অমনই তদনুযায়ী কার্য্যও হইল। তরঙ্গিণী যে গো-যানে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল, তিন জন তাহাতেই আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিল। হায় পাপ! তুমি মানুষকে কি হৃদয়হীন পশুই করিয়া দেও! অভাগিনী গিরিবালা প্রস্থান-কালে একবার বৃদ্ধা মাতার নিকট বলিয়াও আসিল না। সে কালামুখী বলিবেই বা কি? যে পথে পদার্পণ করিতে সে অগ্রসর হইল, তাহার কথা

জগতে কাহাকেও জানাইবার নহে। হারাধনের যে পুত্র-কন্যাকে গিরিবালা লালন-পালন করিত, গৃহত্যাগের সময় অভাগিনী একবার তাহাদিগকেও দেখিয়া গেল না; কীৰ্ত্তিকুশলেরা প্রস্থান করিল। এই যাত্রায় তাহাদের মহাপ্রস্থান না হইল কেন?

গিরিবালা বৈঠকখানা হইতে চলিয়া আসার প্রায় ৫ ঘণ্টা পরে, অর্থাৎ বেলা প্রায় ১১টার সময় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। এইরূপ প্রাতেই তিনি প্রায় প্রতিদিন শয্যাত্যাগ করেন। খানসামা বেলা ৫টার সময়, হাওয়া খাইতে যাইবার জন্য বাবুকে সাজাইতে আসিল। তখন সেখানে একটা বড় গোলের কথা উঠিয়া পড়িল। খানসামা চাবি লইয়া বাবুর বাক্স খুলিল; কিন্তু ঘড়ি পায় না, চেন পায় না, আংটী পায় না। একথা বলিতে গেলে হয় তো চির-দিনের জন্য মাথাটি হারাইতে হইবে; সে বেচারা থতমত খাইয়া কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। এদিকে বাবু সুরেন্দ্রনাথ সাজগোজের বিলম্ব হওয়ায়, চটিয়া লাল হইতে লাগিলেন। কাজেই খানসামা প্রকৃত কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। তখন একটা বিষম গণ্ড-গোল পড়িয়া গেল। গোলমাল শুনিয়া দেওয়ানজি পর্য্যন্ত সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিবালার প্রতি সন্দেহ অনেকেরই হইতে থাকিল; কিন্তু সে কথা

বলে কাহার সাধ্য? গিরিবালা বাবুর প্রণয়িনী—সে চুরী করিয়াছে, এ কথা কেহ বলিতে পারে কি? অবশেষে সেই খানসামাটা সাহসে ভর করিয়া, রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে বুঝিয়া, বলিল,—"হুজুর, কাহাকেও এ সকল জিনিস্ বথ্‌সিস্ দেন নাই তো?"

সুরেন্দ্র বাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—'বথ্‌সিস্! হারামজাদা, বথ্‌সিস্ কেন দিব আমি? যখন তুই ছাড়া বাক্স আর কেহ খোলে না, আর যেখানে চাবি থাকে তুই ছাড়া আর কেহ যখন তাহা জানে না, তখন তুই হতভাগাই চুরি করিয়াছিস্। তুই যদি আকাট মুর্খ না হইতিস্, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিতিস্, এ চুরির দায় তোড় ঘাড়ে ভিন্ন আর কোথাও পড়িতে পারে না। আজি তোর সর্ব্বনাশ করিয়া তবে ছাড়িব, জানিস্!"

খানসামাটা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু সে তখন মরিয়া। তাহাকে যমে ধরিয়াছে। কাজেই মরণকালে মুখ ফুটিয়া কথা বলা আবশ্যক বোধ করিল। বলিল,— "দোষ তো আমার ঘাড়েই পড়িতেছে বটে, কিন্তু হুজুর কোন বিবিকে এ সকল জিনিস্ দিতে না পারেন, বা কোন বিবি হুজুরের সহিত তামাসা করিবার জন্য এ সকল জিনিস লইতে না পারেন, এমন নহে। ধর্ম্মা-

বতার! গরিবকে মারিয়া পৌরুষ নাই। আপনি একবার মনে করিয়া দেখুন।”

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—“আমার সহিত তামাসা করিতে পারে এমন লোক দুনিয়ায় নাই। তোর ও সকল বকামি রাখিয়া দে! মনে করিয়াছিস্ কি মুখের কথায় অপরাধ ঢাকিয়া দিবি, পাজি?”

সুরেন্দ্র বাবু রাগের ভরে এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে একটা ধোঁকা লাগিয়া গেল। গিরিবালার অর্থাদি ভিক্ষা, তাহার সহিত কথান্তর, তাহার না বলিয়া চলিয়া যাওয়া, ইত্যাদি সমস্ত কথা তাঁহার মনে পড়িল। তথন তিনি অনেকক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিলেন। তাহার পর রামসিংহ দরওয়ানকে ডাকিয়া গিরিবালার সন্ধানে নন্দী-বাড়ী যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

রামসিংহ অনতিকাল মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, গিরিবালা, তাহার ভাই হারাধন, আর শান্তিপুরের একটা স্ত্রীলোক এই তিন জনে আজি বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছে।

তথন প্রায় সন্ধ্যা। সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—“ঘোড়া তৈয়ার আছে?”

একজন ভৃত্য সভয়ে নিবেদন করিল,—“আজ্ঞে হাঁ।”

তথন সুরেন্দ্র বাবু দ্রুতপাদবিক্ষেপে নিম্নে অবতরণ করিলেন। দরওয়ান মহাশয়রা তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া,

খাটিয়া ছাড়িয়া, গোঁপে তা দিয়া, দাড়ি চুমড়াইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং লম্বা লম্বা সেলামে বাবুকে অভিনন্দিত করিলেন। বাবু কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, লাফ দিয়া ঘোড়ায় উঠিলেন। বলিলেন,—"পাঁচ জন দরওয়ান, ঢাল তলোয়ার লইয়া, আমার সঙ্গে আসুক।"

পাঁচ জন দরওয়ান তখনই মাথায় পাগড়ি জড়াইতে জড়াইতে এবং জামার বন্ধ আঁটিতে আঁটিতে, বাবুর সহিত ধাবিত হইল। সকলেই বুঝিল, আজি নিশ্চয়ই একটা বিষম ব্যাপার ঘটিবে।

বিষম ব্যাপারই ঘটিল বটে। হারাধন নন্দীর গৃহ-সমীপস্থ হইয়া, বাবু সুরেন্দ্রনাথ, তাহার জননীকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। বৃদ্ধা থরথর কাঁপিতে কাঁপিতে, দরওয়ানের ধাক্কা খাইতে খাইতে, বাবুর সম্মুখে হাজির হইল। বাবু তাহার পৃষ্ঠদেশে চাবুক মারিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বল্ হারামজাদী, তোর ছেলে মেয়ে কোথায় আছে?"

বৃদ্ধা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দোহাই বাবা, তাহারা কোথায় গিয়াছে, আমি তাহার কিছুই জানি না; আমাকে তাহারা কোন কথা বলে নাই।"

বাবু বলিলেন,—"চুলের মুঠা ধরিয়া হারাধনের বউকে আমার সম্মুখে লইয়া আয়।"

নিমকহালাল দ্বারবানগণ, চুলের মুঠা ধরিয়া, বাড়ীর ভাগ গলা ধাক্কা দিয়া, হারাধনের যুবতী ভার্য্যা ভুবনমোহিনীকে সেই নরপ্রেতের সম্মুখে উপস্থিত করিল। তাহার পুত্র-কন্যা ক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ করিতে থাকিল।

বাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। হারাধনের মাতা বাবুর পা জড়াইয়া বলিল,—"তুমি মান-অপমানের কর্ত্তা; দোহাই তোমার, তুমি আমার ঘরের বউকে বে-এজ্জত করিও না, বাবা।"

সুশিক্ষিত সুরেন্দ্রনাথ পদাঘাতে হারাধনের মাতাকে দূরে ফেলিয়া দিলেন, এবং বজ্রনির্ঘোষে ক্রন্দনশীলা বধূকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুই নিশ্চয়ই জানিস্—হারাধন আর গিরিবালা কোথায় আছে? যদি ভাল চাহিস্, তাহা হইলে বল্, তাহারা কোথায়?"

ভুবনমোহিনী অধোমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আপনি বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই জানি না। আমরা গরিব—নিরুপায়—আপনি আমাদের উপর অত্যাচার করিয়া খুসী হন, করুন; কিন্তু মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, তিনি সকলই দেখিতেছেন।"

সুরেন্দ্র বাবু অতি ক্রোধে বলিলেন,—"ছোটমুখে বড় কথা—চুপ রহ হারামজাদী।" তাহার পর আপনার দলবলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"ইহাদের

বাটীর টিকটিকি সমেত বদ্‌মায়েস্‌। গিরিবালা আমার জিনিসপত্র চুরী করিয়া কোথায় পলাইয়াছে, তাহা ইহারা নিশ্চয়ই জানে। ইহারা সহজে তাহা বলিবে না। ইহাদের প্রতি দয়া করিবার কোনই দরকার নাই। তোমরা ইহাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেও।"

হারাধনের মা উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু হারাধনের স্ত্রী এখন আর কাঁদিল না। সে, আপনার শিশু পুত্র ও কন্যার হাত ধরিয়া এবং আকাশের দিকে চাহিয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্য সত্যই ঘরে আগুন দেওয়া হইল। জীর্ণ ঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ঘর হইতে ঘটী বাটী, বা কাঁথা বালিস, বা কাপড়খানা মাতুরটা, কিছুই বাহির করা হইল না। কে বাহির করিবে? কেহ এক ফোঁটা জল দিয়া আগুন নিভাইবারও যত্ন করিল না। কাহার ঘাড়ে দুইটা মাথা?

সুশিক্ষিত সুরেন্দ্র বাবু ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া গেলেন। যাহাদের আশ্রয়হীন করিয়া পথে বসাইয়া গেলেন, যাইবার সময় একবার তাহাদের দিকে চাহিয়াও গেলেন না।

ধন্য সুরেন্দ্রনাথ! ধন্য তোমার বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য! গিরিবালার পাপে, হারাধনের পুত্র কন্যা ও পত্নীকে পথের ভিখারী করা যে লজিক শাস্ত্রের অনুমোদিত, তাহা

অবশ্যই অত্যদ্ভুত। কেন সুরেন্দ্রনাথ, তুমি মূর্খ হও নাই? কেন সুরেন্দ্রনাথ, তুমি নীচবংশে জন্মগ্রহণ কর নাই? তাহা হইলে তোমার মূর্খতা স্মরণ করিয়া, তোমার হীনজন্ম আলোচনা করিয়া, হয় তো জগৎ তোমার অপরাধ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষমা করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু তুমি সুপণ্ডিত, তুমি জ্ঞানগর্ব্বে-গর্ব্বিত, তুমি আত্মভিমানপূর্ণ, তুমি বুদ্ধিমদে অহঙ্কৃত—হায়! তোমার এই ব্যবহার? হায় ধন সম্পত্তি! এ সংসারে তোমার লীলা নিরতিশয় দুর্জ্ঞেয়। পাত্র-বিশেষে তুমি অশেষ শুভ সংগঠনের নিদানভূত হইয়া, বসুন্ধরার দুঃখস্রোত মন্দীভূত করিতেছ। আবার স্থলবিশেষে, তোমারই প্রতাপ জগতের হাহাকার-ধ্বনি সংবর্দ্ধিত করিয়া, নিদারুণ নরকের বিভীষিকা-পূর্ণ চিত্র নর-নয়নের সম্মুখে পরিস্থাপিত করিতেছে। যাও—বিলাসী, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, অবিবেকী সুরেন্দ্রনাথ! বেগগামী অশ্বপৃষ্ঠে দেহ দুলাইতে দুলাইতে, বসুন্ধরাকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতে করিতে, মানবগণকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটের তুল্য বোধ করিতে, আপনার বিলাস-মন্দিরে গমন কর। আজি যে নিরপরাধ নারী ও শিশুগণকে, অত্যাশ্চর্য্য সুবিচার সহকারে, তুমি বৃক্ষতলাশ্রয়ী করিয়া গেলে, তাহাদের কথা মনে করিয়া তোমার ও পাষাণ হৃদয় এক তিলও কাতর হইবে না। যদি হয়, তাহা হইলে সে কথা স্মরণ করি-

বার প্রয়োজন কি? কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ!' তোমার এই অমার্জ্জনীয় অপরাধ কোন মতেই প্রক্ষালিত হইবে না। আজি হউক, কালি হউক, বা বহুকাল পরেই হউক, তোমাকে এই দারুণ দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতে হইবে। ঐ যে দুঃখিনী পুত্র-কন্যার হাত ধরিয়া—ঐ যে আশ্রয়-হীনা যুবতী নীরবে আকাশে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, জান তুমি মূঢ়, ও কাহার নিকট আপনার দুঃখ-কাহিনী জানাইতেছে? কোন্ বিচারালয়ে ঐ কামিনী আপনার অবস্থা দেখাইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিতেছে? কাহাকে ঐ অভাগিনী আপনার দুর্দ্দশার সাক্ষী করিয়া রাখিতেছে? সেই ন্যায় ও ধর্ম্মের স্থাপয়িতা, জ্ঞান ও যুক্তির প্রতিষ্ঠাতা, সত্য ও সততার নিদান, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বদর্শী, বিপন্নবান্ধব, আর্ত্তসহায়, নারায়ণের ধর্ম্মাধিকরণে হারাধনের স্ত্রী আজি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া রাখিল। সেখানে ধনসম্পত্তির প্রভাবে বিচারের তারতম্য নাই, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য নাই, প্রভু-ভৃত্যের ইতরবিশেষ নাই, রাজা প্রজার বিভিন্নতা নাই। তোমার ধনসম্পত্তি, তোমার অহঙ্কার, তোমার স্বার্থপরতা, তোমার অলৌকিক যুক্তি, তোমার অত্যদ্ভুত জ্ঞান ও বিদ্যা কিছুই তোমার রক্ষা-সাধনে সমর্থ হইবে না। সে দিন, সে বিচারকালে, এ পদবিদলিতা নারী তোমার অপেক্ষা অত্যুচ্চ স্থানে সমাসীনা হইবে। আর

তুমি? তোমার দুঃখের তখন ইয়ত্তা থাকিবে না। অহঙ্কৃত সুরেন্দ্রনাথ! সেই ভয়ানক দিন আগতপ্রায়।

অগ্নিদেব অতি সত্বরেই সেই সুজীর্ণ সামান্য গৃহ দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষে পরিণত করিলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। কোন লোকই, সুরেন্দ্রনাথের ভয়ে, হারাধনের পরিবারবর্গকে আপনাদের বাটীতে আশ্রয় দিবার প্রস্তাব করিতেও সাহসী হইল না। যখন শেষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অদৃশ্য হইল, তখন হারাধনের স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমি যদি সতী সাধ্বী হই, তবে ভগবান আমার দুঃখের কথা অবশ্যই বিচার করিবেন। আজি হইতে গাছতলা আমার আশ্রয়। উত্তম।"

কথা সমাপ্তির সম-সময়ে পার্শ্বস্থ বৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া এই বিপন্ন পরিবারের সমীপবর্ত্তী হইল এবং অতি কোমলস্বরে বলিল,—"অবশ্যই ভগবান্ এ অত্যাচারের প্রতিকার করিবেন। কিন্তু গাছতলা তোমার আশ্রয় হইবে কেন মা? আমি কন্যাটি কোলে লই, তুমি পুত্রটিকে কোলে লইয়া, বৃদ্ধা শ্বাশুড়ির হাত ধরিয়া আমার সঙ্গে আইস। আমি তোমার সন্তান। আমি তোমাদিগকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইব।"

এই ব্যক্তি কৃষ্ণনগরের দোকানদার আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত মূর্খ যদু হালদার। সে এই অসময়ে এখানে কেন?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বড় ভয়ে ভয়ে হারাধন, তরঙ্গিণী ও গিরিবালা রাজীবপুর হইতে প্রস্থান করিল। অনেক ধন রত্ন তখন তাহাদের আয়ত্ত, সুতরাং তাহারা বড়ই আনন্দিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু অতি সহজেই যে তাহারা ধরা পড়িতে পারে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যে তাহাদের সকল আনন্দের অবসান হইতে পারে, এ সকল দুশ্চিন্তা তাহাদিগকে নিতান্ত বিমর্ষ করিয়া রাখিয়াছে। গিরিবালা বলিয়াছে, সুরেন্দ্র বাবু দুই চারি দিনের মধ্যেই এ সকল অপহৃত সামগ্রীর অনুসন্ধান করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা নাই। গিরিবালা অবশ্যই বাবুর রীতি-প্রকৃতি বেশী জানে; সুতরাং তাহার কথা সবিশেষ বিশ্বাসযোগ্য, সন্দেহ নাই। তথাপি তিন জনের কেহই আশঙ্কা বর্জ্জিত নহে। বিধাতঃ! ধন্য তোমার সুব্যবস্থা। অপরাধীর শাস্তি, এইরূপে অবিরত তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে।

টাকা ছাড়া আর যে যে জিনিষ ছিল, তাহার কতক কৃষ্ণনগরে ও কতক শান্তিপুরে বিক্রয় করিতে তাহারা সঙ্কল্প করিয়াছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমস্ত আপাততঃ তরঙ্গিণীর নিকট গচ্ছিত থাকিবে; পরে আবশ্যক মতে

তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার হইবে। কয়েক দিন মাত্র শান্তিপুরে থাকিয়া, তাহারা কৃষ্ণনগরে যাইবে স্থির করিয়াছে। সেখানে গিরিবালার জন্য একটা বড় গোছ মাছ জালে ফেলিতে হইবে। হারাধন গিরিবালার বড় ভাই, সুতরাং তাহার শুভাশুভ না ভাবিয়া থাকিতে পারে কি? সৌভাগ্যক্রমে জগতে ঘর ঘর এমন বড় ভাই জন্মগ্রহণ করেন না!

এই পরম ধর্ম্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিত্রয়কে বহন করিয়া গো-যান অতি সত্বর শান্তিপুর সন্নিহিত হইল। নগরের মধ্যে প্রবেশ করার বহুপূর্ব্বে, শকটারূঢ় ব্যক্তিত্রয় দেখিতে পাইল, অদূরে বৃক্ষতলে একখানি পাল্কী রহিয়াছে, আর একটি বাবু, বাহিরে দাঁড়াইয়া, পাল্কীর ছাতে গুড়গুড়ি রাখিয়া তামাকু খাইতেছেন। গাড়ি অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইল। হারাধন ও গিরিবালা দেখিল, বাবুর বেশভূষা বড় জাঁকাল। তরঙ্গিণী দেখিল, বাবুটি যুবাপুরুষ। হারাধন ও গিরিবালা দেখিল, বাবুর গুড়গুড়ি রূপার, রূপার কলিকায় রূপার সরপোষ জিঞ্জির আঁটা, মুখনলটা সোণার। তরঙ্গিণী দেখিল, বাবু অতি সু-পুরুষ, তাঁহার মুখখানি হাসিভরা। হারাধন ও গিরিবালা দেখিল, বাবুর ঘড়ির সোণার চেনটা খুব মোটা, তাহাতে হীরাও আছে। তরঙ্গিণী দেখিল, বাবুর চক্ষু দুটি যেন বিধাতার আঁকা, রঙটি যেন কাঁচা সোণা, গোঁফ জোড়াটি অপরূপ!

হারাধন ও গিরিবালা দেখিল, বাবুর গায়ে সিল্কের জামা, পায়ে বাণিস করা বিলাতী জুতা। তরঙ্গিণী দেখিল, বাবুর কি চওড়া বুক, সর্ব্বাঙ্গের কি অদ্ভুত গঠন। বাবুর তামাকের গন্ধ হারাধনের নাকে প্রবেশ করিল। এমন সুগন্ধ তামাক হয়, তাহা হারাধন জানিত না। তাহার মনপ্রাণ আমোদিত হইয়া উঠিল। হারাধন এ অপূর্ব্ব তামাকু একবার টানিবার লোভ অসংবরণীয় বলিয়া জ্ঞান করিল। তখন হারাধন গাড়ি থামাইয়া নামিয়া পড়িল এবং অতীব বিনীতভাবে বাবুর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিল,—"মহাশয় ব্রাহ্মণ ?"

বাবু উত্তর দিলেন,—"হাঁ।"

হারাধন বিশেষ নম্রতার সহিত প্রণাম করিল।

বাবু হাস্যমুখে অতি মধুর কণ্ঠে বলিলেন,—"কল্যাণ হউক। তুমি তামাক খাইবে কি ?"

হারাধন পরমানন্দে হাত জোড় করিয়া বলিল,—"বড়ই ভাল তামাক—আমরা গরিব লোক; এমন তামাক কখন খাই নাই।"

ধন্য তামাকু দেবী! অতি শুভক্ষণেই তুমি ভূভার হরণ করিতে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূতা হইয়াছ! তোমার প্রসাদে কত নগণ্য লোক গণ্য লোকের আত্মীয় হইয়াছে এবং কত গণ্য লোক কত নগণ্য লোকের আত্মীয় হইয়াছে। যেখানে পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতার কোন সম্ভাবনা

নাই, সেখানেও তুমি পরিচয় ও সৌহৃদ্য সঙ্ঘটন করিতেছ; নচেৎ এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-যুবার সহিত বেশ্যান্নসেবী তিনি হারাধনের কথাবার্ত্তা কিরূপে ঘটিতে পারে?

দূরে অন্য এক বৃক্ষতলে বাবুর আট জন বেহারা, এক জন দ্বারবান্, একজন খানসামা এবং একজন সরকার ছিল। একজন অপরিচিত আগন্তুক বাবুর নিকটস্থ হইতেছে দেখিয়া, তকমা আঁটা, গালপাট্টাধারী, ঢাল তলোয়ার যুক্ত, দ্বারবান্ ছুটিয়া আসিল। বাবু তাহাকে দূরে থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—"রামা! শূদ্রের হুঁকায় জল করিয়া লইয়া আয়।"

হারাধনের গাড়ি নিকটস্থ হইল। গাড়ির মধ্যগতা সুন্দরীরা গাড়ি থামাইতে বলিলেন বোধ হয়। বাবুর দৃষ্টি গাড়ির ভিতরে গেল, এবং একবার তরঙ্গিণী একবার গিরিবালার সহিত মিলিল। তরঙ্গিণী একটু অতি মধুর অতি মৃদু হাসি হাসিল। গিরিবালা মুগ্ধার ন্যায় চাহিয়া রহিল। এত বড় বাবুর সম্মুখে খানসামা হারাধনকে হুঁকা আনিয়া দিবে, এটা বড় লজ্জার কথা বোধ করিয়া, হারাধন স্বয়ং সেই দূরস্থ বৃক্ষতলে গেল এবং সরকারের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিল যে, কি সর্ব্বনাশ! যাঁহাকে সে বাবু মনে করিয়াছে, তিনি যে সে লোক নহেন, রামপুরের রাজা, নাম অরবিন্দকুমার রায়, আয় চারি পাঁচ লক্ষ

টাকা, জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়স চব্বিশ পঁচিশ। শান্তিপুরে অসংখ্য বিগ্রহ দেখিবার জন্য তাঁহার আগমন হইয়াছে; তিনি এখন কিছুদিন শান্তিপুরেই থাকিবেন, এস্থান তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছে। এরূপ একটা অসাধারণ লোকের সহিত এমন অসম্ভাবিত উপায়ে পরিচয়ের সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় হারাধন আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া বোধ করিল এবং এই সুসংবাদ শকটারূঢ় আত্মীয়গণকে জানাইবার জন্য সে ধাবিত হইল। সে গিয়া দেখিল, যাহা তাহার হৃদয়ের বাসনা তাহারই অনুকূল কার্য্য ভগবান ঘটাইতেছেন। রাজার দিকে চাহিয়া গিরিবালা ঈষৎ হাস্যের সহিত মুখ নত করিতেছে, রাজাও সেই হাসির প্রতিদান না করিতেছেন এমন নহে। তাহাকে শকট সন্নিহিত দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ তুমি তামাক খাইলে না?"

হারাধন বলিল,—"আজ্ঞে যাই।"

হারাধন শকটে প্রবেশ করিয়া রাজার সমস্ত পরিচয় তরঙ্গিণী ও গিরিবালাকে জানাইল। তরঙ্গিণী সমস্ত শুনিয়া মনে করিল, "দাঁউ তো একেই বলি।" সে আবার একবার রাজার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত করিয়া একটু মধুর হাসি হাসিল। রাজা দুই একবার গিরিবালার প্রতি নেত্রপাত করিয়াছেন, ইহা শুভলক্ষণ না হইলেও, তরঙ্গিণী লালসাসূচক নয়নবাণ ছাড়িতে ক্ষান্ত হইল না। সে মনে

করিল, একবার দুইটা কথা কহিতে পাইলেই রাজাকে সে বাঁধিয়া ফেলিবে, তাহার আর ভুল নাই। রাজা হারাধনকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ইঁহারা তোমার কে?"

হারাধন বলিল,—"একটি আমার ভগ্নী, আর একটি—আজ্ঞে আর একটা আমার বড় আত্মীয় লোক।"

রাজা একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"যাহার বয়স কম, তিনিই বোধ হয় তোমার ভগ্নী। তুমি এ সুন্দরীদের লইয়া কোথায় যাইতেছ?"

রাজার এই কথায় তিন জনের মনে তিন রকম ভাব জন্মিল। তরঙ্গিণী মনে মনে ভাবিল, এত বড় মাছটা কি শেষে গিরিবালার জালেই পড়িবে। পোড়া বয়সই কি সব? গিরিবালা আমার কিসে লাগে? গিরিবালা ভাবিল, রাজা জমিদার মজাইবার মত আমার সকলই আছে। আমার ভাল পড়তাই পড়িয়াছে; একটা জমিদার ছাড়িয়া আসিতে না আসিতে একটা রাজা জুটিতেছে, আমাকে ভগবান এমনই করিয়াছেন। হারাধন ভাবিল, যা ভাবিয়া বাহির হইয়াছি তাই। এত বড় রাজাটা যদি গিরিবালার ফাঁদে পড়ে, তবে আর চাই কি? হারাধন অপরিসীম আনন্দ সহকারে বলিল,—"আজ্ঞে, আমরা শান্তিপুর যাইতেছি। শান্তিপুরের বড়বাজারে আমার দোকান আছে। আমরা সেখানে আজি থাকিব।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"আজি দোকানে থাকিবে, তার পর ?"

"আজ্ঞে তার পর—তার পর মহারাজের যেমন হুকুম হইবে।"

রাজা একটু হাসিয়া ফেলিলেন। লোকটার ইতরতা দেখিয়া কি ? হইবে। বলিলেন,—"তা বেশ তো। বেলা বেশী হইতেছে। তোমরা এখানে এখন জলটল খাও না কেন ? পাল্কী-বেহারাদের কাছে তোমাদের গাড়োয়ানকে বসিতে বলিয়া,তোমরা কিছু খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও না কেন ? শান্তিপুরে তো আসাই হইয়াছে। ঐ যে মাঠের মধ্যে তাঁবু পড়িয়াছে দেখিতেছ, ও আমারই। তোমাদের ইচ্ছা হয় তো ওখানেও আসিতে পার। আমি এখন ওখানেই যাইতেছি।"

হারাধন বাসনা-সিদ্ধির এমন সহজ পন্থা দেখিয়া চরিতার্থ হইল। সে তরঙ্গিণী ও গিরিবালাকে লইয়া এবং অপহৃত জিনিসের পুঁটুলি লইয়া, রাজার সঙ্গে সঙ্গে চলিল এবং অবিলম্বে সেই সুদৃশ্য পটমণ্ডপে উপস্থিত হইল। সেখানকার শোভা ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হারাধন ও তাহার সঙ্গিনীরা অবাক্ হইল। গালিচা, পর্দ্দা, খাট, চেয়ার, টেবিল, গদি, বিছানা, বালিস সকলই তাহাদের পক্ষে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অতি চমৎকার। তাহারা সেখানে গিয়া বসিলে, রাজার আদেশক্রমে ভৃত্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রূপার

থালে করিয়া, কতকগুলা লুচি, কচুরি, আলুর দম প্রভৃতি সামগ্রী দিল, রূপার গ্লাসে করিয়া জল দিল। আর রাজা স্বয়ং আলমারীর ভিতর হইতে একটা তার জড়ান বোতল বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন,—"দোষ কি? যদি অভ্যাস থাকে, তবে ইহাও ইচ্ছামত খাও না কেন? আমি প্রাতে ওটা খাই না, নতুবা আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতাম।"

বোতলের সহিত আত্মীয়তা তিন জনেরই যথেষ্ট আছে। সুতরাং তিন জনেই বোতল দেখিয়া বড়ই পরিতুষ্ট হইল। হারাধন আনন্দে আটখানা, তরঙ্গিণী কিছু বিমর্ষ, গিরিবালা অহঙ্কৃতা। গিরিবালা এখন মনে ভাবিতেছে, তাহার রূপ-যৌবন অবশ্যই অলৌকিক, নচেৎ ব্রহ্মাণ্ডের বড়লোকেরা তাহাকে দেখিয়া মজে কেন? তাহার অধঃপতন সম্পূর্ণ হইয়াছে কি? তরঙ্গিণী যে কিছু বিমর্ষ, একথা রাজা মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, এবং অবিলম্বে ইহার প্রতিকার করিতেও সঙ্কল্প করিলেন। দুইচারি বার গ্লাস ঘুরিয়া আসার পর, তরঙ্গিণী ছাড়া সকলেরই কথা উঁচু উঁচু হইয়া উঠিল। রাজাকে আর বড় তফাৎ বলিয়া বোধ থাকিল না। গিরিবালাই রাজার সহিত কিছু বেশী কথা কহিতে লাগিল। একথা সে কথার পর, সে বলিল,—"তোমার মত আমারও আংটা আছে। দেখিবে?"

হতভাগিনী একেবারেই তুমি বলিয়া ফেলিল। রাজা বড়ই হাসিলেন। বলিলেন,—"তা তোমার থাকিবে বই কি ?"

গিরিবালা অপহৃত পুঁটুলি খুলিতে আরম্ভ করিল। হারাধন বলিল,—"থাক্ থাক্—ও সব খুলিয়া কি কাজ ? রেখে দে!"

গিরিবালা, সে কথা শুনিল না। আপন মনে পুঁটুলি খুলিতে থাকিল। রাজা তরঙ্গিণীকে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, —"তুমি ভাই আমার সহিত কথা কহিতেছ না কেন ?"

তরঙ্গিণী অগাধ জলের মাছ। রাজা ভাই বলাতেই সে গলিল না। মনের ঝাল মিটাইয়া বলিল,—"আমরা বুড়াহাবড়া মানুষ, আমাদের আবার কথা !"

সঙ্গে সঙ্গে রাজা বলিলেন,—"কুন্তীদেবীর বয়সে কি যৌবন যায়। রসের পরিপাক তো তোমাতেই। মানুষ তো তুমিই।"

কথাটা তরঙ্গিণীর মনের মত হইল। সে ঢুলুঢুলু নয়নে কটাক্ষ ছাড়িয়া একটু হাসিল। গিরিবালা পাঁচটা আংটী লইয়া রাজার নিকটে আসিল। এত নিকটে আসিল যে, রাজার গায়ে তাহার অঙ্গ স্পর্শ হয় হয় হইল। রাজা অতি সাবধানে আপনার শরীর বক্র করিয়া বলিলেন,—"বাঃ বেশ, বেশ আংটী ! এ আংটী সকল কাহার বখ্‌সিস ? বাঃ এটিতে যে কি লেখা রহিয়াছে—সুরেন্দ্রনাথ

মিত্র জমিদার। রাজীবপুরের সুরেন্দ্র বাবু বুঝি! তুমি কি তাঁহারই হিরামন?”

হারাধন অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবুর নামটা কাণে যাওয়ায় সে উঠিয়া বলিল,—“কি সুরেন্দ্র বাবুর নাম লেখা—আংটীতে? ওটা ফেলিয়া দাও—ধরা পড়িতে হবে নাকি?

রাজা বলিলেন,—“তবে এ সব বথ্‌সিস্‌ নয়? লইয়া আসা? তা বেশ তো। সে লোকটা কখন একটি পয়সা কাহাকে দিতে চায় না। তাহার নিকট হইতে এরূপে না লইলে উপায় কি?”

গিরিবালা বলিল,—“হতভাগার নাম বুঝি খোদা আছে? তা ভাই তোমার সঙ্গে আমাদের আলাপ হইয়াছে। আমরা গরিব বলিয়া যদি কেহ ধরে, তার উপায় তোমাকে করিতে হবে। তা—তা—আমাকে সে বড় কষ্ট দিয়াছে।”

রাজা সকলই বুঝিলেন। হারাধন আবার তন্দ্রাগ্রস্ত। গিরিবালা বলিতে লাগিল,—“আমার দোষ নাই—আমাকে সে অনেক দিব বলিয়া কিছুই দেয় নাই। তা আমি না লইব কেন? তা রাজা, আমি সুরেন্দ্রের মুখে ঝাঁটা মারি—তুমিই আমার সব।”

এই বলিয়া সেই উন্মাদিনী কুলটা রাজার গলা 'জড়াইয়া ধরিতে গেল। রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং

বলিলেন,—“তা তুমি বেশ করিয়াছ। কিন্তু ধরা পড়িতে পার; একটু সাবধান হওয়া উচিত।”

তখন টলিতে টলিতে গিয়া গিরিবালা হারাধনকে উঠাইল। এরূপ মূল্যবান্ সামগ্রী সকল তাহাদের নিকট থাকিলে তাহারা যে সহজেই চোর বলিয়া ধরা পড়িবে, তাহা তাহারা স্থির বুঝিল। তখন তরঙ্গিণী প্রস্তাব করিল,—“এ সকল জিনিস রাজার নিকট থাক্ না কেন? রাজা বড় ভদ্র, অমায়িক, খুব বড় লোক। উঁহার কাছে থাকিলে কার সাধ্য কে কি বলে?

প্রথমতঃ তাহার বয়সাধিক্য তাহার প্রতি অনুরাগ উৎপাদক বলায়, তাহার পর গিরিবালা অঙ্গস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে রাজার সাবধানতা দেখিয়া, তরঙ্গিণী স্থির করিয়াছে, মুখে রাজা গিরিবালার সহিত যেমন করিয়া কথা কহুন, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তরঙ্গিণীরই অনুরাগী হইয়াছেন। হইবারই কথা। বারনারীর যদি এ গৌরব না থাকে, তবে তাহার থাকে কি? তরঙ্গিণী স্থির করিয়াছে, দুইটা শত্রু সঙ্গে না থাকিলে রাজা তাহারই গোলামী করিতেন। সুযোগ উপস্থিত হইলে সে সৌভাগ্য অবশ্যই তাহার ঘটিবে। সে রাজার হস্তে সেই অপহৃত পুঁটুলি ন্যস্ত করিতে বলিবে, ইহা বিচিত্র নহে। তাহার মনে আরও লোভ ছিল। রাজার হাতে পড়িলে, এ সকল জিনিষ সে একাই হস্তগত করিতে পারিবে।

তা ছাড়া সে বুঝিয়াছিল, এ চোরাই মাল আপাততঃ কাছছাড়া করাই আবশ্যক। নচেৎ তাহাকেও চোর হইতে হইবে। সুতরাং জলে ফেলিয়া দেওয়ার অপেক্ষা, পাওয়া যাইবার আশা থাকে, এমন স্থানে রাখাই ভাল।

তরঙ্গিণীর রায়ে হারাধনও রায় দিল; গিরিবালাও সুতরাং সম্মত হইল। তাহাদের অনুরোধে রাজা নোট-বহি বাহির করিয়া প্রত্যেক জিনিষের ফর্দ্দ করিয়া লই-লেন। বলিলেন,—"আমাকে যদি শীঘ্র এদেশ ছাড়িয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে তোমাদের জিনিষ তখনই ফিরাইয়া লইতে হইবে।"

গিরিবালা বলিল,—"তুমি যদি যাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। আমার জিনিষ তখনও তোমার সঙ্গেই থাকিবে।"

রাজা বলিলেন,—"তা বেশ কথা। আপাততঃ প্রায় অপরাহ্ন হইয়াছে। আমার শান্তিপুরে যাইবার দরকার; তোমরাও চল, শান্তিপুরে আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমার সরকার সঙ্গে যাইয়া তোমাদের বাসস্থান চিনিয়া আসিবে। গঙ্গার ধারে বড় থামওয়ালা বাটীতে আমার বাসা। যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই আমার বাসা দেখাইয়া দিবে।"

এখান হইতে উঠিতে হারাধনের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু রাজা যখন থাকিতেছেন না, তখন থাকিতে কাহারও মত

হইল না। তাহারা টলিতে টলিতে গাড়িতে উঠিতে চলিল।

রাজা সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ইহারা বড়ই মন্দ লোক। ঐ স্ত্রীলোকটা কালিদাস চক্রবর্ত্তীর উপপত্নী তরঙ্গিণী, আর ঐ স্ত্রীলোকটা হারাধনের ভগ্নী গিরিবালা। বোধ হয় গিরিবালা অন্তঃসত্ত্বা। ইহাদের সঙ্গে যাও। দেখিও, ইহারা কোথায় যায়, কি করে। আমি অনেক কথা আদায় করিয়াছি। তুমি যতদূর যাহা জানিতে পার, চেষ্টা করিবে।"

রাজা পাল্কীতে উঠিলেন। দ্বারবান ও খানসামা পশ্চাতে ধাবিত হইল। গোল করিতে করিতে মাতালের-দলেরা গাড়ি ছাড়িয়া দিল। সরকার গাড়ির পশ্চাতে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হারাধনের দল বড়ই মাতলামি করিতে করিতে বেলা ৩টার সময় শান্তিপুরে পৌঁছিল। শান্তিপুরে আসিয়া তাহারা কালিদাসের বাটীতে গেল না; হারাধনের যে একটা নামমাত্র দোকান ছিল, সেখানেও গেল না। বাজারের নিকট একটা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিল। এরূপ থাকিতে তরঙ্গিণীরই বেশী আগ্রহ। তরঙ্গিণী যাহা মনে করিবে, হারাধন তাহাতেই সায় দিবে। কেন তরঙ্গিণী আপনার বাটীতে গেল না? কয়দিন অসাক্ষাতের পর, সে কেন তাড়াতাড়ি বাটী যাইয়া বিরহবিধুর কালিদাসকে সুস্থ করিতে ব্যাকুল হইল না? এ সকল প্রশ্নের ঠিক উত্তর আমরা দিতে পারি না, কিন্তু একটা অনুমান করিতে পারি। আমাদের বোধ হয়, রাজাকে দর্শন করার পর হইতে, তরঙ্গিণীর হৃদয়ে অনেক দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুরভিসন্ধি জন্মিয়াছে। সে একবার একাকিনী সুযোগ মতে রাজার সহিত কথা কহিতে পাইলেই যে তাঁহার হৃদয়েশ্বরী হইতে পারিবে, সে বিষয়ে তাহার কোনই সংশয় নাই। বাটীতে গিয়া সেরূপ সুযোগ ঘটিবার সুবিধা হইবে না। আর রাজার হস্তে যে সকল অপহৃত সামগ্রী

গচ্ছিত করা হইয়াছে, রাজার সহিত আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা ও প্রণয় স্থাপন করিয়া, সে যে তৎসমস্ত হস্তগত করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে তাহার কোনই সন্দেহ নাই। রাজার সহিত আলাপ পরিচয়ের এই অবসর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, এসকল কিছুই হয় না। অনেক ভাবিয়া তরঙ্গিণী ঘর ভাড়া করিয়া থাকিল। গিরিবালার বেশী নেশা হইয়াছিল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। হারাধন একবার বমি করিল। তরঙ্গিণী খাড়া ছিল।

সরকার, উহাদিগকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, প্রস্থানের উপক্রম করিল, এবং হারাধনের নিকট বিদায় চাহিল। হারাধন তাহাকে বিদায় দিবার সময় বলিল,— "তোমার সঙ্গে গিয়া রাজবাড়ী একবার দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল—তা এখন শরীর ভাল নাই। একটু পরে যাইব। কি জান ভাই, রাজার কাছে আমাদের সর্ব্বস্ব গচ্ছিত আছে। কে জানে রাজা লোক কেমন? কোন ভয় নাই তো বাবু?"

তরঙ্গিণী বলিল.—"বুড়া হইতে গেলে, মানুষ চিন্‌তে পার না? রাজা লোক কেমন, তা আর জানিতে হয়? তুমি যা অতুল সম্পত্তি ভাবিতেছ, রাজার তাহাতে সম্বৎসরের জুতার কড়িও হয় না। ভাল, তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, আমি জামিন থাকিতেছি। টাকায় জিনিষে যা রাজার কাছে আছে, তা আমি দিব।"

হারাধন নীরব। সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। তরঙ্গিণী তখন সরকারকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া, একটু তফাতে সরিয়া গেল! সেখানে গিয়া তরঙ্গিণী একটু হাসির সহিত মিশাইয়া জিজ্ঞাসিল,—"সরকার মহাশয়! তোমার নামটি কি ভাই?"

সরকার উত্তর দিল,—"আমার নাম শ্রীনীলরতন চৌধুরী।"

"চৌধুরী মহাশয়েরও কি রামপুরে বাড়ী?"

"হাঁ।"

আলাপটা পাকাপাকি করিবার বাসনায়, তরঙ্গিণী অনেক কথা ফাঁদিল, এবং অনেক প্রকারে চৌধুরীর মনোরঞ্জন করিতে প্রস্তুত হইল। সকল কথা গ্রন্থে লিখিবার অযোগ্য।

নীলরতন সরকার লোকটা বড়ই গম্ভীর ও সাবধান। কথাবার্ত্তা শুনিলে ও ব্যবহারাদি দেখিলে, সামান্য সরকার অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক উচ্চশ্রেণীর লোক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ। চৌধুরী মহাশয় লম্বা চওড়া মন্দ ছিলেন না।

তরঙ্গিণীর কথা শুনিয়া চৌধুরী বলিলেন,—"তুমি যেরূপ সুন্দরী ও রসিকা, তাহাতে রাজা তোমাকে পাইলে যে বড়ই আদর করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ ছুঁড়িটার উপর যে তিনি তুষ্ট হন নাই, তা আমি জানিতে

পারিয়াছি। তোমার উপর তাঁহার খুব মন পড়িয়াছে। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ; তোমার অবশ্যই একজন আপনার লোক আছে। তুমি রাজার প্রণয়িনী হইলে, সে লোকটা চটিয়া যাইবে এবং হয় তো হাঙ্গামা বাধাইবে। রাজা ওরূপ গোলমালে বড় ভয় করেন।”

তরঙ্গিণী বলিল,—“সে জন্য কোন ভয় নাই, আমার প্রতি রাজার মন পড়িয়াছে জানিতে পারিলেই, আমি ঠিক করিয়া লইব। আমার গহনা গাঁটি, যা কিছু আছে, হস্তগত করিয়া এমন সরিয়া পাড়িব যে, কেহই আমার সন্ধান করিতে পারিবে না ; আছি কি মরিয়াছি, তাহাও জানিতে পারিবে না।”

নীলরতন বলিলেন,—“তা বেশ—আট ঘাট বাঁধিয়া কাজ করিও—দেখিও যেন শেষে গোল না হয়। আমাকে কোন কথা বলিতে হইবে না। আমি তোমার পক্ষেই আছি—থাকিবও। তবে ভাই আমি গরিব মানুষ। চাকরী কার সত্য, দশ টাকা পাইও সত্য, কিন্তু খরচ অনেক, ডাহিনে আনিতে বায়ে কুলায় না। আমার বিষয় তোমায় বিবেচনা করিতে হইবে। রাজার রাণী আছেন বটে, কিন্তু জানই তো তুমি, ওরূপ ইয়ার লোকের রাণীকে কেবল কাঁদিয়াই দিন কাটাইতে হয়! তুমি জুটিয়া গেলে, রাণী যে বাদী হইবেন, তাহার আর ভুল নাই—তখন তুমিই আদত রাণী হইবে।”

বড়ই লোভের কথা। তরঙ্গিণী চতুরা, বুদ্ধিমতী; কিন্তু ধন-রত্ন-সুখ-সৌভাগ্যের লোভ তাহার হৃদয়ে বড়ই প্রবল। কুৎসিতদর্শন, সামান্য দোকানদার, অপদার্থ কালিদাসের সেবা সে অনেক দিন করিয়াছে। তাহাতে তাহার অনেক বাসনাই অতৃপ্ত রহিয়াছে। রাজার অপরিসীম রূপ, অতুলনীয় ধনসম্পত্তি, অত্যদ্ভুত বিলাসিতা এবং হৃদয়-মোহকর সরলতা ও রসিকতা তাহার শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তরঙ্গিণী বড়ই মজিয়াছে! হিতাহিত জ্ঞান তাহার আর নাই। সম্ভব অসম্ভব বিচার করিবার শক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। সে বলিল,—"তোমার বিষয় বিবেচনা করিব, তাহা আর বলিতে! যদি আমার বাসনা সিদ্ধি হয়—তাহা যে তোমার সাহায্যেই হইবে, তাহা কি আমি বুঝিতেছি না—তোমাকে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট করিব। আমার হাতে এখন কিছু নাই, থাকিলে আমি এখনই তোমাকে একশত টাকা দিতাম, ভাই। তা—তা আমার হাতের তাগা তোমাকে খুলিয়া দিতে পারি, তুমি লও না কেন?"

চৌধুরী বলিলেন,—"তা আমি লইব না—রাজা জানিতে পারিলে আমার উপর রাগ করিবেন। যদি কিছু দেওয়া মত হয়, নগদ দিও—জিনিসপত্র লইয়া রাজার হাতে মারা পড়িব নাকি?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তাহাই হইবে। আমি তোমার জন্য নগদ টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আবার কখন তুমি আসিবে? কখন তুমি আমাকে রাজার কাছে লইয়া যাইবে?"

চৌধুরী বলিলেন,—"সন্ধ্যার পর। আমি রাজার সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া তোমার সহিত দেখা করিব, তুমি তৈয়ার থাকিও। কিন্তু ওরা যে থাকিবে?—হারাধনের সম্মুখে আমার আসাও ভাল নহে, তোমার যাওয়াও ভাল নহে। অত বড় একটা রাজা কি শেষে একটা ছোট লোকের সহিত দাঙ্গা বাধাইবেন? এ কথা তুমি বেশ করিয়া বিবেচনা কর।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"সে জন্য ভয় নাই। আমি এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব যে ওরা কিছুই জানিতে পারিবে না।"

নীলরতন বলিলেন,—"যেন গোল না হয়। আর একটা কথা—গিরিবালা আর হারাধনের ব্যবহারে রাজা অসন্তুষ্ট। এটা নিগূঢ় কথা। গিরিবালার কথা রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি ওরূপ লোকের সহিত তোমাকে কথাবার্ত্তা কহিতে দিবেন না, থাকিতেও দিবেন না। রাজার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা হইতেছে, তখন আগেই উহাদের সকল কথা তোমার জানাইয়া রাখা উচিত। তাহা হইলে তুমি যে উহাদের

মত নও, এ বিষয়ে রাজার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।”

তখন তরঙ্গিণী, আপনার সততা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, গিরিবালা-সুরেন্দ্র-বাবু-ঘটিত সমস্ত কথা—প্রথম আলাপ হইতে গিরিবালার চৌর্য্য ও পলায়ন পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়, ব্যক্ত করিল এবং হারাধন যে অতি সামান্য ও জঘন্য লোক, তাহাও সে বার বার বলিল। সুরেন্দ্র বাবুর স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কাহিনী, তাঁহার অবিচার ও অত্যাচার সকলই তাহার বাগ্মী রসনা ব্যক্ত করিল। গিরিবালার গর্ভসঞ্চার ও সে গর্ভ নষ্ট করিবার সঙ্কল্প পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয়ের গোচর করা হইল। এ কুৎসিত পরামর্শের সে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রণাদাত্রী ও উদ্যোগকর্ত্রী হইলেও, অধুনা আপনার সাধুতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশয়ে, সমস্ত অপরাধ হারাধনের ঘাড়ে চাপাইয়া দিল। হারাধন আপনার ভগ্নীকে লইয়া ব্যবসায় করিতে বাহির হইয়াছে, ইহাও সে বলিল। সত্যের সহিত সে মিথ্যাও অনেক মিশাইল। গিরিবালার বয়স সম্বন্ধে সে প্রধান মিথ্যা কথা বলিল, সে বলিল গিরিবালার বয়স ত্রিশ বৎসরের কম নহে, ইহা সে ঠিক জানে। তাহার অপেক্ষা গিরিবালা ৫।৭ বৎসরের বড় ইহা সে প্রতিপন্ন করিল। রোগা ও খর্ব্বাকার বলিয়া গিরিবালাকে ছোট দেখায়।

সমস্ত কথা শুনিয়া নীলরতন বলিলেন,—“এখন আসি

তবে। সন্ধ্যার পর আসিব। দেখিও, কোন গোল হয় না যেন—হারাধন যেন জানিতে না পারে। রাজাকে ঠিক করিয়া আসিব। কোন ভাবনা নাই। আমার বিষয় যেন মনে থাকে।”

তরঙ্গিণী তাঁহাকে অনেক আশ্বাস দিয়া বিদায় করিল। তরঙ্গিণী গৃহগতা হইয়া, দেখিল, হারাধন সুনিদ্রিত। তখন সে যথাবিহিত যত্নে আপনার দৈহিক পারিপাট্য সাধনে ব্যাপৃতা হইল। সে জানে, তাহার রূপ তো কম নহে; এ রূপের ফুল রাজার উদ্যানেই ফুটা উচিত। কুৎসিত কালিদাস চক্রবর্ত্তী কি ইহার উপযুক্ত পাত্র? কেবল সুযোগের অভাবে, কেবল অনুকূল ঘটনা না ঘটায়, এ মুক্তমালা এতদিন বানরের গলায় দুলিতেছে। সে সুযোগ—সে অনুকূল ঘটনা যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর ফস্‌কাইবার যো আছে কি? অনেক আশা করিয়াই তরঙ্গিণী গা ঘসিতে ও চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

তরঙ্গিণীর বেশ-ভূষা সাঙ্গ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হারাধনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সন্ধ্যার বেশী বিলম্ব নাই। বেশের ঘটা হইতেছে দেখিয়া হারাধন বলিল,—“কাণ্ডখানা কি? এ জায়গায় এত রূপের জৌলস কেন বাহির করিতেছ ভাই?”

তরঙ্গিণী বলিল,—“আজি যদি রূপ না ছড়াইব, তবে ছড়াইব কবে? আজি তুমি আমি একা—এমন সুযোগ

কবে হইবে? চিরদিনই চক্রবর্ত্তীর ভয়ে লুকোচুরি করিয়া কাটাইতে হয়। তোমাকে লইয়া মন খুলিয়া আমোদ করিতে পাই না। বিধাতা যদি সুযোগ ঘটাইয়া দিয়াছেন, তবে ছাড়িব কেন? এই লোভেই আমি বাড়ী যাই নাই। কালিও যাইব না, মনের সকল সাধ মিটাইব।" হারাধন গলিয়া জল হইল। তরঙ্গিণী আবার বলিল,—"বাড়ীতে চক্রবর্ত্তীর জন্য ভাল করিয়া মদ খাওয়া প্রায়ই হয় না। আজি তোমাতে আমাতে ভাল করিয়া মদ খাইব। তুমি তিনটি টাকা লইয়া যাও। এক টাকার খাবার, দুই টাকার মদ লইয়া আইস। দেরি করিও না।

এরূপ সৎকর্ম্ম ও শুভকার্য্যে দেরি করিবার লোক হারাধন নহে। সে তখনই গামছা কাঁধে ফেলিয়া ও টাকা টেঁকে রাখিয়া প্রস্থান করিল। তরঙ্গিণী সমস্ত কাজ শেষ করিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা। হারাধন ফিরিয়া আসিল। তরঙ্গিণী তাহাকে বড় আদর করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সেখানে গিরিবালা ঘুমাইতেছিল। তাহার ঘুম আপাততঃ যাহাতে না ভাঙ্গে, তজ্জন্য তরঙ্গিণী সাবধান করিয়া দিল।

অধিক মাত্রায় সুরা প্রয়োগ করিয়া হারাধনকে অচেতন করাই তরঙ্গিণীর অভিপ্রায়। তাহা হইলে, নীলরতন আসিলে কথাবার্ত্তার অসুবিধা বা রাজার ভবনে যাইবার প্রয়োজন হইলে, কোনই ব্যাঘাত ঘটিবে না।

সুতরাং কালব্যাজ না করিয়া তরঙ্গিণী একটা প্রদীপ জ্বালিল এবং খাদ্যসামগ্রী, মদ ও গ্লাস লইয়া বসিল। বড় আদর ও যত্ন সহকারে সে হারাধনকে মদ ঢালিয়া দিল। বিনীত ও আজ্ঞাবহ হারাধন তাহা গলাধঃ করিলেন। হারাধন মধ্যে মধ্যে তরঙ্গিণীর মুখে খাদ্য তুলিয়া দিতে লাগিল এবং তাহাকে মদ খাইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। অনুরোধ রক্ষার জন্য খালি গ্লাস মুখে ধরিয়া তরঙ্গিণী মুখ বিকৃত করিতে থাকিল। এক বোতল শেষ হইল, দ্বিতীয় বোতল আরম্ভ হইল। সুরা হারাধনের মস্তিষ্ক ও শোণিত অধিকার করিয়া দেহকে অধীন করিয়া ফেলিল, সে আর মদ গিলিতে পারে না। কিন্তু তরঙ্গিণীর যে আদর, যে মধুমাখা কথা, তাহাতে না বলা যায় কি? হারাধন সুখের সাগরে ভাসিতেছে। অনেক ধান্যেশ্বরী তাহার সুবিশাল উদরে প্রবেশ করিল। তখন হারাধন বলিল,—"না—না—তরি—আর না।"

তখন তরঙ্গিণী, হারাধনের গলদেশ আপনার সুগোল বাম বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া, দক্ষিণ হস্তে একপাত্র সুরা লইয়া তাহার মুখের নিকট ধরিল। হারাধন তখন তরঙ্গিণীর চিবুকে হাত দিয়া, অতি বিকৃতস্বরে একটা কুৎসিত গান ধরিল।

ঠিক এই সময়ে সেই পাপ কুটীরদ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং এক কৃষ্ণকায় পুরুষ চক্ষুর নিমিষ মধ্যে গৃহ-

মধ্যস্থ হইয়া, হস্তস্থিত লগুড়ের দ্বারা হারাধনের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। হারাধন তৎক্ষণাৎ রুধিরাক্ত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইল। অতঃপর তরঙ্গিণীর মস্তকে অনুরূপ আঘাত করিবার নিমিত্ত প্রহরকারী সেই লগুড় উত্তোলন করিল; এমন সময়ে, পশ্চাদ্দিক হইতে এক সুদীর্ঘ শ্মশ্রুধারী বিষালোরস্ক ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রহারকারীর হস্ত ধারণ করিলেন। প্রহারকারী বহু চেষ্টাতেও সেই ব্রাহ্মণের বজ্রমুষ্টির মধ্য হইতে আপনার বাহু উন্মুক্ত করিতে পারিলেন না। ভয়বিকলিতা তরঙ্গিণী দেখিল, প্রহারকারী কালিদাস চক্রবর্ত্তী। কিন্তু কে এ ব্রাহ্মণ?

তৃতীয় খণ্ড ।

"বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥"

অর্থ।—যিনি আত্মা দ্বারা মনকেও জয় করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির আত্মা বন্ধু; কিন্তু অজিতমনা ব্যক্তির আত্মাই শত্রুর ন্যায় অনিষ্ট-সাধনে নিযুক্ত থাকে।

তাৎপর্য্য।—যিনি বুদ্ধিবলে বিষয়াসক্ত, ভোগানুরত, কার্য্যকারণ-সংঘাতরূপ মনকে পরাভূত করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন, এবং আমার প্রাধান্য প্রণিধান করিয়াছেন, তাঁহারই আত্মা শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-স্বরূপ। আর যে আত্ম-জয় করিতে সক্ষম নহে, তাহার আত্মা চিরদিনই অনিষ্ট-কারী শত্রু-স্বরূপ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৬ষ্ঠ অধ্যায়। ৬ষ্ঠ শ্লোক। শ্রীমদ্ভগবদুক্তি।)

কর্ম্মক্ষেত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তুমি জ্ঞানগর্ব্বিত দার্শনিক মহাশয়! তোমাকে কোটী কোটী নমস্কার করিয়া তোমার মহিমা স্বীকার করিতেছি, কিন্তু তোমার সকল মত গ্রহণ করিতে কদাপি প্রস্তুত নহি। তুমি অদৃষ্ট মান না, পূর্ব্বজন্ম স্বীকার কর না, জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফলাফল গ্রাহ্য কর না, প্রারব্ধ কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহ, এবং সকলই মানবের বর্ত্তমান কর্ম্মা-কর্ম্মের পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ কর, অথবা অনুকূল বা প্রতিকূল ঘটনার ফল বলিয়া যাবতীয় রহস্যের মীমাংসা কর। তোমার এই তত্ত্ব যথেষ্ট সারবান ও যুক্তিযুক্ত হই-লেও, সংসারের ব্যাপারসমূহ ইহার নিতান্ত বিরুদ্ধ। জগতে সে সকল কাণ্ড অনুক্ষণ, পদে পদে, প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহার অধিকাংশ স্থলে তোমার এই সারবান তত্ত্ব

প্রয়োগ করিলে কোনই মীমাংসা হয় না। কেন নিরপরাধ মা, অপরিসীম দুঃখ ভোগ করিয়া, হায় হায় করিতে করিতে দিন কাটাইতেছে? কেন ঘোর দুষ্ক্রিয়ান্বিত মহাপাপী, আনন্দোন্মত্ত হইয়া, কালাতিপাত করিতেছে? কেন সাধু পুণ্য-প্রাণ মহাজন মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য লালায়িত হইতেছে? কেন নরহন্তা দস্যু ভোগের উপর ভোগ্য ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে? কেন একজন যৎপরোনাস্তি অপরাধ করিয়াও স্বচ্ছন্দে নিষ্কৃতিলাভ করিতেছে? কেন পাপসংস্পর্শশূন্য ব্যক্তি দণ্ডভোগ করিতেছে? কেন হত্যাকারী রাজদ্বারে মুক্তিলাভ করিয়া বুক ফুলাইতেছে? কেন পরম অহিংসুক ব্যক্তি হত্যাপরাধে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিতেছে? ইত্যাদি যে সকল বিসদৃশ ব্যাপার সংসারের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহা আলোচনা করিলে, তোমার ঐ সুমহান্ তত্ত্বে অবশ্যই অশ্রদ্ধা হয়। তখনই মনে হয়, এ সংসার এক সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র মাত্র। জীব এই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত। কেহ বা উৎসাহ সহকারে, কেহ বা নিরুৎসাহে, কেহ বা স্বেচ্ছায়, কেহ বা অনিচ্ছায়, কেহ বা দায়ে, কেহ বা সখে, কর্ম্ম করিতেছে। ক্রিয়াশীলতাই জগতের ব্যবস্থা—নিষ্ক্রিয় কেহই নাই। যে মুহূর্ত্তে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিতে হইয়াছে, যে ক্ষণে মানবকে এই সীমাশূন্য সমুদ্রে জলবুদ্বুদের ন্যায় ভাসিতে হইয়াছে, তখনই, নিরুদ্ধদর্শন

বলীবর্দ্দের ন্যায়, তাহাকে কর্ম্মে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আর তাহার কর্ম্মের বিরতি নাই। কর্ম্ম তাহার সঙ্গী ও অপরিহার্য্য সহচর। স্নেহময় পিতামাতা তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, প্রিয় সুহৃদ্গণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, নয়ন-বিনোদন নন্দন তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, প্রাণাধিক প্রণয়িণী তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু কর্ম্ম তাহাকে কদাপি পরিত্যাগ করিবে না। সে ধনী বা দরিদ্র হউক, ভিক্ষুক বা রাজ্যেশ্বর হউক, একক বা বহু-পরিবার-যুক্ত হউক. বিদ্বান্ বা মুর্খ হউক, বুদ্ধিমান্ বা নির্ব্বোধ হউক, সক্ষম বা অক্ষম হউক, কর্ম্ম করিতে সে জন্মিয়াছে, কর্ম্ম করিতে সে বাধ্য ; কর্ম্ম তাহাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। কর্ম্ম করিতে মনুষ্য এত বাধ্য বটে, কিন্তু ইহার ফলাফল-সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ। তাহারা কর্ম্মের দাস, কর্ম্ম তাহাদের দাস নহে। ফলের আকাঙ্ক্ষায় তাহারা কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু ফল তাহাদের দুর্জ্ঞেয়, অনায়ত্ত ও ইচ্ছাতীত। চিকিৎসক বহু যত্নে রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন ; কিন্তু বলিতে পারেন কি তিনি, রোগীর পরিণাম কি হইবে ? আজি যাহা সহজ জ্বর, কালি তাহা সান্নিপাতিক বিকার হইয়া চিকিৎসকের সকল বিদ্যা-বুদ্ধিকে বিদ্রূপ করিবে ! বহুদিনের পর প্রবাসী, আপনার প্রিয়জনবর্গকে দেখিবার জন্য, বস্ত্রালঙ্কার লইয়া গৃহে ফিরিতেছেন—আর কয়েক ব্যাম মাত্র অতিক্রম করিলে

তাঁহার সুখময় আবাস নয়নগোচর হয়; কিন্তু হায়! পশ্চাদ্বর্ত্তী তস্করের মুদ্গরাঘাতে সেই স্থানে তাঁহার প্রাণান্ত হইল! উপায়ক্ষম যুবক, অনন্ত সুখের আশা করিয়া, সুন্দরী ও গুণবতী ভার্য্যার সহিত বড় আনন্দের গৃহস্থালী পাতিয়াছে; নির্ম্মম যম সেই যুবার প্রাণান্ত করিয়া, সেই আনন্দময়ী যুবতীকে পথের ভিখারিণী করিয়া দিতেছে। এইরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, উপলব্ধ হয়, মনুষ্য কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে তাহার কোনই ক্ষমতা নাই! অদৃষ্ট তাহার ব্যবস্থাপক—ক্রিয়াশীল মানবের ক্রিয়াফল বিধিনিয়োজিত।

আমাদের পরিচিত রাজীবপুরের জমিদার, শ্রীযুক্ত বাবু বা সাহেব সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, সুবিদ্বান ও সুশিক্ষিত হইলেও,অন্যান্য সকল মনুষ্যের ন্যায় কর্ম্মের দাস। ভগবান্ বলিয়াছেন,—'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য-কর্ম্মকৃৎ।' এ মহাবাক্যের তিনিও একজন দৃষ্টান্তস্থলীভূত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবান্ স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' এই মহদুক্তির প্রয়োগস্থল তিনি কোন ক্রমেই হইতে পারেন না। কর্ম্ম-ফলে তাঁহার আসক্তি যথেষ্ট, এবং কর্ম্মফল ইচ্ছাধীন ও অবধারিত বলিয়া, তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস। এইরূপ বিশ্বা-সের বশবর্ত্তী সুরেন্দ্রনাথ বাবু যথেচ্ছাচারের মূর্ত্তিমান অব-তার হইয়া উঠিয়াছেন, এবং অনুগত ও অধীনস্থ মানব-

গণকে যদৃচ্ছাক্রমে পদবিদলিত করিতেছেন। সতী স্ত্রীর ধর্ম্মনাশ, নিরপরাধ ব্যক্তির নিরতিশয় দণ্ডবিধান, গুণবানের প্রতি অযথা অত্যাচার প্রভৃতি নিষ্ঠুরাচরণ, এই সুশিক্ষিত পাষণ্ডের নিত্যব্রত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিরঙ্কুশভাবে, ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, এবং ইচ্ছানুরূপ ফলভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। কিন্তু তিনি যাহাই মনে করুন, বসুন্ধরা ভগবদ্বিহীন নহে, এবং ক্রিয়াফল মনুষ্যের প্রতাপ বা ধনসম্পত্তি, বিদ্যা বা কৃতিত্বের অধীন নহে। এ জ্বলন্ত সত্য কথনই মিথ্যা হইবে না।

যে দিন হারাধনের গৃহদাহ করিয়া সুরেন্দ্র বাবু কীর্ত্তিবিস্তার করেন, তাহার কয়েক দিন পরে, তিনি এক সম্ভ্রান্ত প্রজার পৃষ্ঠদেশে বিলক্ষণ বেত্রাঘাত করিয়া আপনার মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রজার অপরাধ, সে অশ্বারোহী সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া হস্তস্থিত হুঁকা ফেলিয়া, উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। গ্রামস্থ তাবৎ লোকেই সুরেন্দ্র বাবুকে যথেষ্ট সম্মান জ্ঞাপন করে; এ ব্যক্তিরও তাহা করা উচিত ছিল। তথাপি তাহার এ ত্রুটি কেন হইল, বলা যায় না। সুরেন্দ্র বাবু মনে করেন যে, এ ব্যক্তি অত্যহঙ্কৃত সুতরাং ইহার দমন একান্ত আবশ্যক। যদিই সুরেন্দ্র বাবুর অনুমান যথার্থ হয়, বাস্তবিকই যদি এ ব্যক্তি অহঙ্কৃত হয়, তাহা হইলেও সুরেন্দ্র বাবুর প্রযুক্ত দণ্ড যে যৎপরোনাস্তি অযথা হইয়াছে, তাহার আর ভুল নাই।

সেই দিন সন্ধ্যার পর, সুরেন্দ্র বাবু আপনার উদ্যান-মধ্যস্থ বিলাস-গৃহে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। চারি পাঁচটি বয়স্ক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। সুরা চলিতেছে না, কুকর্ম্ম হইতেছে না, কুচর্চ্চাও বড় নয়—চলিতেছে কেবল খোস্ গল্প। দিনের কুকীর্ত্তি সুরেন্দ্র বাবুর একটুও মনে আছে, এমন বোধ হয় না। থাকিবার কথা নয়। যে সকল লোমহর্ষণ কার্য্য তিনি সতত অনুষ্ঠান করেন, তাহার তুলনায় আজিকার কাজ এতই কি ভয়ানক যে, সে জন্য হৃদয়ে দাগ পড়িবে? বড়ই হাসির রোল চলিতেছে। সকলেই গল্পে ডুবিয়া আছেন।

সহসা সেই সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের উন্মুক্ত দ্বারদেশ হইতে শব্দ হইল,—"হর হর, বম্ বম্।" সকলেরই দৃষ্টি সেইদিকে পড়িল। কি গম্ভীর ও মিষ্ট, উন্নত ও কোমল, ভীতিজনক ও মধুর কণ্ঠস্বর! সকলে দেখিল—অপূর্ব্ব দর্শন! দেখিল, এক বিভূতি বিলেপিত-কলেবর, জটাজুটধারী, বিশালবক্ষ, সুস্থূল, হসন্মুখ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান, ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী, সজীব শিবের ন্যায়, সেই প্রকোষ্ঠদ্বারে দণ্ডায়মান। এই দেবকল্প পরম শোভাময় সন্ন্যাসী-সন্দর্শনে সকলেই বিমুগ্ধ ও বাক্যহীন। হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী সুরেন্দ্রনাথও প্রথমতঃ কিয়ৎকাল অবাক্ হইয়া, সেই স্থির ও পাষাণ-গঠিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সভ্যতার ভাষায় এরূপ অনুরাগ, আগ্রহ

বা আবেগ প্রভৃতিকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলে। কোন্‌টী হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও কোন্‌টী সবলতা, তাহা আমরা ভাল জানি না বলিয়া, সে কথার কোন মীমাংসা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমাদের বিশ্বাস, যে সকল লম্বা লম্বা কথার আবরণে জুয়াচুরীর অঙ্গ ঢাকিয়া, এবং তাহাকে ভদ্র সাজাইয়া সভ্যসমাজে চালাইবার সুব্যবস্থা সভ্যতার শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কথাটা তাহারই অন্যতম। যাহাই হউক, সভ্য সুরেন্দ্র বাবু হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সবলতাকে ডাকিয়া আনিয়া, বলিলেন,—"কে তুমি? কেন সং সাজিয়া এখানে আসিয়াছ? কে তোমাকে এখানে আসিতে দিল? জান, আমি এখনই তোমার সর্ব্বনাশ করিতে পারি।"

নির্ভীক সন্ন্যাসী, মৃদুতা ও গাম্ভীর্য্য-মিশ্রিত অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরে বলিলেন,—"আমি সন্ন্যাসী। সং সাজি নাই, সন্ন্যাসী সাজিয়াই এখানে আসিয়াছি। কেহ আমাকে বলে নাই, আমি আপনি আসিয়াছি। আমি জানি, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিতে পার না, পারিলেও করিবে না।"

এই বলিয়া, সেই সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তত্রত্য সুপরিষ্কৃত বিছানার উপর উপবেশন করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু,

সন্ন্যাসীর সাহস ও ভরসা দেখিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। বলিলেন,—"তুমি কি পাগল! এখানে বসিতেছ কোন্ সাহসে? জান, এখনই আমার দ্বারবানগণ তোমাকে গলাধাক্কা দিতে দিতে তাড়াইয়া দিবে?"

সন্ন্যাসী অপূর্ব্ব স্বরে হাসিয়া উঠিলেন। সে হাস্য-ধ্বনি যেন ঘরের মধ্যে হাসিয়া হাসিয়া দুলিতে লাগিল। বলিলেন,—"আমি পাগল নহি। শুনিয়াছিলাম, তুমি লেখা-পড়া জান। আমার সহিত কোন্ শাস্ত্রের বিচার করিতে চাহ, কর। পাগলে কি শাস্ত্র-বিচার করিতে পারে? আমি আপনার সাহসে এখানে বসিতেছি। তোমার অপেক্ষা অনেক বড়লোক ভারতবর্ষে আছেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই, বোধ হয়। আমি তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বড়লোকদের নিকটে যে সাহসে বসি, সেই সাহসেই এখানে বসিয়াছি। তোমার দ্বারবানগণ কখনই আমাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইতে পারিবে না। তোমার কয়জনই বা দ্বারবান আছে? বড় জোর দশ জন! একটা ফৌজ আসিলেও আমাকে নড়াইতে পারে কি না, সন্দেহ। ইচ্ছা হয়, তোমার দ্বারবানদের ডাকিয়া, বিশেষ বথ্সিস্ দিবার লোভ দেখাইয়া, আমাকে ফেলিয়া দিতে হুকুম দেও দেখি। যদি তাহা পারে, তখন ধাক্কা দিয়া তাড়াইবার কথা হইবে। কিন্তু সুরেন্দ্র! আমাকে তাড়াইবার জন্য তুমি কেন এত ব্যস্ত হইতেছ?

আমি তোমার গৃহে বসিয়াছি মাত্র—কোন অনিষ্ট করি নাই তো ?”

সুরেন্দ্র বড়ই বিরক্ত হইলেন। তাঁহাকে সুরেন্দ্র বলিয়া কথা কহে, এমন সাধ্য কাহার ? কোথা হইতে একটা প্রায় উলঙ্গ, ছাইমাথা, নিতান্ত অসভ্য সন্ন্যাসী আসিয়া, তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল—তাড়াইয়া দিলে উঠিতে চায় না—লম্বা লম্বা কথা কয়—এত অত্যাচার সুরেন্দ্র বাবুর সম্মুখে! তিনি দারুণ ক্রোধের সহিত বলিলেন,—“তুমি এখনই আমার ঘর হইতে উঠিয়া যাইবে কি না, শুনিতে চাহি।”

সন্ন্যাসী বলিলেন,—“এখনই তো দূরের কথা—আজি রাত্রিতে যাইব না—কালি দিবারাত্রেও বোধ হয় যাইব না—পরশু হয় তো যাইতে পারি!”

“আমি তোমাকে এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিতে দিব না। তুমি আপন ইচ্ছায় এখানে থাকিবে ?”

সন্ন্যাসী বলিলেন,—“যতক্ষণ এখানে আমার দরকার, ততক্ষণ আমাকে থাকিতে দিতেই হইবে। আমি আপন ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছি, আপন ইচ্ছায় থাকিব, এবং আপন ইচ্ছায় যাইব। কেন তুমি এত বিরক্ত হইতেছ ? তোমার বিরক্তি আমার বিপজ্জনক হইতে পারে, কিন্তু আমার কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। প্রথমতঃ আমি সন্ন্যাসী, সুতরাং বিপদসম্পদের অধীন নহি।

দ্বিতীয়তঃ আমার দেহে যে শক্তি আছে, তাঁহাতে হেলায় আমি মত্তহস্তীকে ধরিয়া রাখিতে পারি। তৃতীয়তঃ, আমার যে বিদ্যা আছে, তাহাতে কোন মতেই পরাভূত হইবার নহি। অতএব সুরেন্দ্রনাথ, তোমাকে ভয় করিবার আমার কোনই কারণ নাই। বরং আমাকে ভয় করিবার তোমার যথেষ্ট কারণ আছে। তোমাকে শাসন করিতেই আমি আসিয়াছি। হয় তোমাকে শাসন করিব, না হয় তোমার সর্ব্বনাশ করিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। বসুন্ধরায় তোমার ন্যায় দুরাত্মার স্থান হইতে পারে না।”

সুরেন্দ্রনাথের এতই ক্রোধ হইল যে, তাঁহার বাক্য-কথনের ক্ষমতা তিরোহিত হইল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে দেরাজ খুলিয়া একটা রিভল্‌ভর বাহির করিলেন, এবং তাহা ঠিক আছে দেখিয়া বলিলেন,—“যে হতভাগা বিনা-হুকুমে আমার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া শান্তিভঙ্গ করে, আমাকে শাসন করিতে চাহে, আমাকে নাম ধরিয়া ডাকে, আমার সহিত সমানভাবে কথা কহে, তাহাকে মারিয়া ফেলাই আবশ্যক। ভণ্ড সন্ন্যাসী, এই তোমার মৃত্যু উপস্থিত।”

গুড়ুম করিয়া শব্দ হইল, গুলি লাগিয়া একটা গ্ল্যাস-কেশ ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল, অগ্নি ঝলসিয়া উঠিল, সুরেন্দ্র বাবুর বয়স্যগণ চমকিয়া উঠিল, ধূম ও গন্ধ ছড়াইয়া পড়িল। রুধিরাক্ত মৃত সন্ন্যাসীর দেহ দেখিবার

জন্য সকলেই আগ্রহে ও উৎকণ্ঠায় সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু সেখানে সন্ন্যাসী নাই! সন্ন্যাসী কোথায়? সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রনাথের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। সুরেন্দ্রনাথ সেই দিকে ফিরিয়া সন্ন্যাসীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইবামাত্র, সন্ন্যাসী তাঁহার হস্ত হইতে রিভলভর কাড়িয়া লইলেন। তখনই সুরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিকই এ সন্ন্যাসীর শরীরে মত্তহস্তীর বল আছে। সন্ন্যাসী পিস্তল লইয়া, হেলায় তাহা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং বামহস্তে সুরেন্দ্রনাথকে ধরিয়া শূন্যে উত্তোলন করিলেন। বলিলেন,—"মূঢ়, অহঙ্কৃত, দুরাত্মন্, এখন বুঝিয়াছ তুমি, আমার দেহে কত শক্তি? জানিতে পারিয়াছ তুমি, তোমার দেহ তৃণের ন্যায় লঘু? আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে এখনই বিচূর্ণিত করিতে পারি; কিন্তু তাহা করিলে সকলই তো শেষ হইয়া যাইবে! তোমাকে অন্যরূপ শাস্তি দেওয়াই আমার অভিপ্রায়। সে শাস্তি দিতে যে আমার যথেষ্ট শক্তি আছে, তাহা তুমি বুঝিয়াছ? কি শাস্তি দিব তাহা তুমি ক্রমশঃ জানিতে পারিবে।"

সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রনাথকে নামাইয়া দিলেন। সুরেন্দ্র, কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় থাকিয়া, বলিলেন,—"মনে করিও না, তোমার দেহে অসুরের ন্যায় বল আছে দেখিয়া, আমি ভীত হইব। দেহে শক্তি থাকিলেই যে

লোকের গৃহে জোর করিয়া প্রবেশ করিবে, বা তাহার উপর বিনা কারণে অত্যাচার করিবে, ইহা কখনই ন্যায়-সঙ্গত ব্যবস্থা নয়। তুমি সন্ন্যাসী সাজিয়াছ, অথচ এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান তোমার নাই? তুমি ক্ষমার অযোগ্য।”

সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিলেন। সে অট্টহাসির ধ্বনিতে সুরেন্দ্র ও তাঁহার বয়স্যগণ চমকিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী ভৈরবস্বরে বলিলেন—“তুমি মূর্খ, তুমি হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য পশু, তাই তুমি ন্যায়-বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছ। আমার দেহে শক্তি আছে বলিয়া যদি অত্যাচার করা অসঙ্গত হয়; তোমার ধন-সম্পত্তি ও প্রভুতা আছে বলিয়া, অনবরত উৎপীড়নে ও অবিচারে, নিরীহ প্রজা-বৃন্দের সর্ব্বনাশ করা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? যে মূঢ় রাজ-শাসন উপেক্ষা করিয়া অকাতরে পরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে, যে পাষণ্ড ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদা-ঘাত করিয়া একের পাপে অন্যের গুরুতর দণ্ডবিধান করে, যে দুরাত্মা সামাজিক বিধি ব্যবস্থা বিদলিত করিয়া অনবরত কুল-কামিনীর সতীত্ব সম্পত্তি অপহরণ করে, যে দুর্বৃত্ত স্নেহমমতা-বর্জ্জিত হইয়া স্বার্থের অনুরোধে পুনঃ পুনঃ ঔরসজাত ভ্রূণের সংহার করে, যে নরকুল-কলঙ্ক পিশাচ যদৃচ্ছাক্রমে নিরপরাধ মানবগণকে আশ্রয়-বিহীন করিয়া দেয়, যে হৃদয়হীন বর্ব্বর, সামান্য ক্রোধের বশ-বর্ত্তী হইয়া, ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া, অতি দুষ্কর

নরহত্যা করে. তাহার সহিত যুক্তির কথা কহিতে আমি কদাচ সম্মত নহি। প্রতাপ ও ধন-সম্পত্তির প্রভাবে সে নরাধম যদি এবংবিধ অত্যাচারে বসুন্ধরা পরিপ্লাবিত করিতে পারে ও নিরীহ মানবকুলের সর্ব্বনাশ করিয়া হাহাকারধ্বনিতে অবনীমণ্ডল পরিপূরিত করিতে পারে, তাহা হইলে আমি দৈহিক বলের প্রভাবে তাদৃশ পিশাচের নিপাত সাধন কেন করিব না? এরূপ পাষণ্ড এ বসুন্ধরায় কদাপি থাকিতে পাইবে না! নরাধম সুরেন্দ্রনাথ, তুই আমার বধ্য। আজি তোর বিধি-নিয়োজিত হন্তা উপস্থিত।"

সেই প্রদীপ্তকায় সন্ন্যাসী, বিকট হুঙ্কার ধ্বনি ত্যাগ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের গলদেশ ধারণ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ 'বাবা গো' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সহচরগণ কম্পান্বিত কলেবরে পলায়ন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে, রাজীবপুরে একটা বড় ভয়ানক জনরব উঠিল,—কৈলাস হইতে হরগৌরী আসিয়া, ত্রিশূলের আঘাতে সুরেন্দ্র বাবুকে বধ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছে,—'কেবল শিব আসিয়াছিলেন।' কেহ তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া বলিতেছে,—'তুই ছাই জানিস্, উমা-মহেশ্বর দুইজনেই ছিলেন, নন্দী-ভৃঙ্গীও সঙ্গে ছিলেন।' একজন বলিতেছে,—'বাবুদের বাড়ীর পিছনে, আমবাগানে ভৃঙ্গী মহাশয় মহাদেবের ষাঁড় বাঁধিয়াছিলেন।' অন্যত্র একজন খুব হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতেছেন,—'ত্রিশূল দিয়া মারেন নাই; মহাদেব দাঁড়াইবামাত্র তাঁহার কপাল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া, একেবারে সুরেন্দ্র বাবুকে ছাই করিয়া ফেলিয়াছে! যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন, সেখানে কতকগুলা ছাই পড়িয়া আছে মাত্র।' আর এক যুবা বলিলেন,—'খুড়া মহাশয় যাহা বলিলেন তাহাই বটে, তবে সকল কথা উনি ঠিক করিয়া জানিতে পারেন নাই। আগুনে পোড়া নয়, সাপে খাওয়া। যেই মহাদেব আসা, সেই তাঁহার মাথার সাপটা সুরেন্দ্র বাবুর কপালে কামড়াইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু! লাস এখনও

পড়িয়া আছে।' খুড়া মহাশয় বড়ই রাগের সহিত বলিলেন,—'এখনকার ছেলেগুলা বড়ই বেল্লিক হইয়াছে। হতভাগা দেখে আয়, সেখানে ছাই—ছাই—ছাই পড়ে আছে। দেখ দেখি মহাশয়, কোথা থেকে সাপের গল্প নিয়ে এসে উপস্থিত! এ কি গুলির আড্ডা রে হারাম-জাদা?' ভাইপো থামিয়া গেলেন। আর এক স্থানে একজন বলিতেছেন,—'সুরেন্দ্র বাবু মরার পরে বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে খুব ঝগড়া বাধিল। মহাপাপী হইলেও, শিবের হাতে মৃত্যু, বড় ভাগ্যের কথা। যমদূতের সাধ্য কি, সে দেহ স্পর্শ করে! বিষ্ণুদূত বাবুকে লইয়া গেল।' একটা ফচ্‌কে ছোঁড়া জিজ্ঞাসিল,—'ঠাকুরদাদা! হেলায় হারাইলে—তুমি কেন সঙ্গে মিশিয়া গোভাগাড়ের হাত এড়াইলে না?' ছোকরা পলাইয়া বাঁচিল, নচেৎ বৃদ্ধের হাতের এক লাঠি তাহার খাইতেই হইত। মৃত সিংহকে গাধাও লাথি মারিয়াছিল; আজি মুখ ফুটিয়া অনেক নিন্দাবাগীশ সুরেন্দ্র বাবুর কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া বাঁচিল।

জনরব শতমুখে ইত্যাকার কাহিনী চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এই প্রসঙ্গ প্রচারিত হইল। রাজীবপুরের ক্রোশ দুই উত্তর-পশ্চিমে, কাননমধ্যস্থ এক ক্ষুদ্র কুটীরে এ সংবাদ পৌঁছিল। বড় ঝর্ ঝরে ঘরখানি—অতি পরিষ্কার উঠানটুকু—বেশ সমান বেড়াঘেরা। সেই উঠানে বসিয়া এক যুবতী কাঁথা

সেলাই করিতেছে। যুবতী কৃষ্ণবর্ণা। যাহার রঙ্ কালো তাহাকে সুন্দরী বলিলে অনেকেই হয়তো ভ্রূকুটী করি-বেন। সেই ভয়ে, আমরা এ যুবতীকে সুন্দরী বলিব কি না স্থির করিতে পারিতেছি না। কিন্তু কালো হইলে যদি সুন্দরীর শ্রেণীতে স্থান না পাওয়াই নিয়ম হয়, তাহা হইলে দ্রুপদনন্দিনীকে লাভ করিবার জন্য আর্য্যাবর্ত্তের রাজা-গুলা দ্বাপরযুগে মারামারি করিয়াছিল কেন, বলিতে পারি না। যাহা হউক, ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, যুবতী একে কাঁথা সেলাই করিতেছে, তাহাতে কালো, তথাপি সুন্দরী। অদূরে একটী বৃক্ষমূলে একটি বালক ও একটী বালিকা খেলা করিতেছে। আমরা এ যুবতীকে জানি না কি? এই সুন্দরী হারাধনের স্ত্রী ভুবনমোহিনী। ভুবনমোহিনী মনঃসংযোগ করিয়া কাজ করিতেছে, আর এক একবার ছেলে-মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, আবার কাজ করিতেছে।

বেলা অপরাহ্ন হইয়াছে। তিনটা বাজিয়া গিয়াছে—প্রায় চারিটার আমল। ধীরে ধীরে এক প্রবীণা স্ত্রীলোক, ভিজা কাপড় পরিয়া ও কাঁধের উপর এক বোঝা ভিজা কাপড় লইয়া, সেই কুটীরাঙ্গনে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র ভুবনমোহিনী তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিয়া গেল; এবং তাহার স্কন্ধের বোঝা উঠাইয়া বলিল,—"মা, কাপড়গুলা ভিজিয়া ভারি তো কম হয়

নাই। তখনই বলিয়াছিলাম, তোমার বড় কষ্ট হইবে, রাখিয়া দেও, কালি আমি স্নানের সময় কাচিয়া আনিব। আমি থাকিতে এত কষ্ট কেন কর মা তুমি ?” ভুবনমোহিনী শীঘ্র একখানি শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিল। বস্ত্র পরিধান করিয়া বৃদ্ধা বলিল,—“তুমি একা কত করিবে মা ? তুমিই কি এক দণ্ড বসিয়া থাক ? বাছা! অনেক সাধ করিয়াই তোমাকে ঘরে আনিয়াছিলাম ; তোমাকে অনেক সুখে, অনেক আদরে রাখিব ভাবিয়াছিলাম। পোড়া গর্ভের দোষে আমার সকল সাধেই বাদ হইল। এখন এই লক্ষ্মীর এই কষ্ট! আমার যা হইবার হইয়াছে ; আজি বাদে কালি মরিব—সকল জ্বালা জুড়াইব। তোমার এই বয়স—এই সোণারচাঁদ ছেলে-মেয়ে ; কাহার আশ্রয়ে তুমি জাতিকুল বাঁচাইয়া দিন কাটাইবে, ইহাই আমার ভাবনা। যাহারা আমার পেটে আসিয়াছিল, তাহারা আমার মুখে চুণ-কালি দিয়া গিয়াছে। তাহারা বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরাই ভাল। কিন্তু মা, তোমার কি হইবে ? যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার পায়ে আর কাঁটাটিও না ফোটে, ছেলে-মেয়ে নিয়ে তোমায় যেন কোন কষ্ট পাইতে না হয়, তুমি যেন রাজার মা হও। কিন্তু আমার মত অভাগিনীর কথা ভগবান শুনিবেন কেন ? এত পাপী যাহার সন্তান, তাহার অনেক পাপ। সে মহাপাপীর আশীর্ব্বাদ ফলিবে কেন ?”

বলা বাহুল্য, এই বৃদ্ধা কুলধ্বজ হারাধন ও গিরিবালার জননী। ভুবনমোহিনী সিক্ত বস্ত্র সমূহ বেড়ার গায়ে শুখাইতে দিতে দিতে বলিল,—"তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার সব হইবে। যদি তোমার পায়ে আমার মতি থাকে, অবশ্যই তুমি যাহা বলিতেছ, সকলই হইবে।"

এ কথা তখন চাপা পড়িয়া গেল। বৃদ্ধা বলিল—"ওমা, এতক্ষণ বলা হয় নাই—গঙ্গার ঘাটে লোকের মুখে বড় আশ্চয্য কথা শুনিলাম। কাল রাত্রিতে নাকি সুরেন্দ্র বাবু মারা পড়িয়াছে।"

ভুবনমোহিনী চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"মরিয়া গিয়াছেন? কেন? কি হইয়াছিল?"

তখন বৃদ্ধা, কৈলাস পর্ব্বত হইতে শিবের আগমন অবধি আরম্ভ করিয়া, সুরেন্দ্র-বধ-পর্ব্ব সমস্ত বর্ণনা করিল। ভুবন-মোহিনী নীরবে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল—শুনিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল—কিন্তু কোন উত্তর দিল না। তাহার হৃদয় তখন সেই অত্যাচারী সেই পীড়নকারী, দুরাত্মার জন্য কাঁদিতেছে। সে তখন ভাবিতেছে—সুরেন্দ্রনাথের এত ধন সম্পত্তি, এত সুখ-সম্পদ, এত ক্ষমতা ও প্রতাপ ছিল, কিন্তু কেন তাহার ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না? কেন অনবরত পাপানুষ্ঠান করিয়া সে দেবতার বিরাগভাজন হইল? কেন সে পতঙ্গের ন্যায় পাপের-আগুনে পড়িয়া এই নবীন বয়সে প্রাণ হারাইল!"

হারাধনের পুত্র কন্যা আসিয়া, ভাত খাওয়াইয়া দিবার জন্য বৃদ্ধাকে বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল; সুতরাং তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল। এ সম্বন্ধে আলোচনা তখন বন্ধ হইল। শিশুদের ভাত মাখিয়া দিয়া, হারাধনের মা উপকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। উপকথা বেশ জমিয়া উঠিল। ছেলেরা হুঁ দিতে দিতে অত্যন্ত মনঃসংযোগ সহকারে গল্প শুনিতে লাগিল।

"মা কোথায় গো? দাদা-দিদি ভাল আছে তো?"—বলিতে বলিতে একটী লোক বেড়ার দরজা ঠেলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল। আনন্দে ভুবনমোহিনীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ছেলেরা ভাত ফেলিয়া ও উপকথা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল। হারাধনের মা ভাতের হাতেই উঠিয়া আসিলেন। এক মুহূর্ত্তমধ্যে এই ক্ষুদ্র সংসার আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। আপনাদের অবস্থার কথা কাহারও মনে থাকিল না। ভুবনমোহিনী সেই অঙ্গন মধ্যে একখানি চট পাতিয়া দিয়া বলিল,—"ব'স বাবা! বাটী হইতে কখন আসিলে? শরীর ভাল আছে তো? মা ভাল আছেন? দাদা ভাল আছেন?"

আগন্তুকের হাতে একটা পুঁটুলি ছিল। সে তাহা ভূমিতলে রক্ষা করিল। কিন্তু আসন গ্রহণ করিয়া, ভুবনমোহিনীর অনুরোধ রক্ষা করিল না, তাঁহার এত প্রশ্নের একটা উত্তরও দিল না। "দাদা, দাদা" বলিয়া আহ্লাদে

আটখানা হইয়া হারাধনের পুত্রকন্যা তাহার নিকটস্থ হইল। সে বড় সোহাগের সহিত দুই কোলে ছেলে-মেয়েকে তুলিয়া লইল। আদরে তাহারা গলিয়া গেল। খোকার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। আগন্তুকের চক্ষু দিয়া দুই ফোটা জল পড়িয়া গেল।

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—“উহাদের সকড়ি মুখ বাবা —একবার নামাইয়া দেও—হাত মুখ ধুয়াইয়া দিই। উহারাই তোমার সব—আমরা কি কেহ নহি? আমি এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার একটাও উত্তর দিলে না?”

আগন্তুক খোকা-খুকিকে নামাইয়া দিয়া বলিল,—“কেন উত্তর দিব? দিদিমার বাড়ী—তুমি কোথাকার কে? দিদি-মা আমার সঙ্গে একটী কথাও কহিলেন না; তবে আমি এখানে বসিব কেন? এস দাদা-দিদি, আমরা রাগ করিয়া চলিয়া যাই।”

হারাধনের মা বলিলেন,—“তা যাবে বই কি? সবে আজ বাড়ী হইতে আসিয়াছ—এখন বুড়ার কথা ভাল লাগিবে কেন? আমি ভাই, ভয়ে ভয়ে কথা কহিতেছি না। যার কথা ভাল লাগিতে পারে, সেই গলা জড়াইয়া ধরিয়া কথা কহুক—আমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখি। রাধী, (হারাধনের কন্যার নাম রাধিকা) তোর দাদাকে ছাড়িস্ না। তোর মন জোগাইতেই তোর দাদা আসে—বুঝিয়াছিস্?”

বড় সেকেলে—বড় অশ্লীল রসিকতা। কিন্তু সেকেলে লোকের হাতে, সেকেলে লোকের মুখে, এরূপ অবৈধ ব্যবহার হইবারই কথা। সুরুচি-মার্জ্জিত সাধু পুরুষেরা দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। বৃদ্ধা আবার বলিল,—"রাধী, তোর দাদাকে বসিতে বল। আমার কথায় কি তোর দাদা বসিবে? বিশেষ আজি বাড়ী হইতে আসিয়া তোর সতীনের ভাবনায় দাদার মন কেমন করিতেছে।"

আগন্তুক যুবা পুরুষ, তথাপি তাহার রুচি নিতান্ত নিন্দনীয়। সে বলিল,—"সতীন রাধীর কেন হইবে? তোমারই সতীনকে আজি ছাড়িয়া আসিয়াছি। তা তোমার সতীন কিন্তু তোমার মত হিংসুটে নয়। সে তোমার ভাবনায় অস্থির। সেই তো তোমার কাছে আসিবার জন্য দিনরাত্রি আমাকে বলে!"

বৃদ্ধা বলিল,—"তা বলিবে বই কি? তাহার দিনকাল আছে—বুড়ীর কাছে আসিতে বলায় তাহার ভয় হইবে কেন? তা হউক, তিন দিন পরে আসিবে বলিয়া, দশ দিনেও যে তাহার হাত ছাড়াইয়া আসিতে পারিয়াছ, ইহাই আমার পরম ভাগ্য। এখন ব'স—বাড়ীর সব খবর বল।"

যুবা এবার বসিল—বিনা নিমন্ত্রণে হারাধনের পুত্র-কন্যা তাহার কোলে আসিয়া বসিল। বালক-বালিকা কোলে বসিতেছে দেখিয়া, ভুবনমোহিনী বলিল—"যাও, তোমরা

ভাত খাইয়া আইস—ভাত পড়িয়া আছে। তোমাদের দাদা বসিয়া থাকিবেন এখন। বাবাকে একটু জল খাইতে দেও মা! তুমি হাত পা ধোও বাবা, পায়ে কত ধূলা।”

যুবা বলিল—“দাদা দিদি ভাত খাইতে খাইতে উঠিয়া আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ! আমার ভাই-ভগ্নী এখন ভিজা ভাত কেন খাইবে? আইস, আমরা সন্দেশ খাই।”

এই বলিয়া, যুবা সেই পুঁটুলি খুলিয়া সন্দেশ বাহির করিল। বলিল,—“এই দিদিমার ভাগ, এই মার ভাগ, এই তোমাদের কালি খাইবার ভাগ, আর এই গুলা সব আমরা এখন খাই। কেমন?”

বলা বাহুল্য, খোকা-খুকী বড় আনন্দিত হইল। তখন সেই যুবা ছেলেদের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া, বালকের ন্যায় আনন্দে সন্দেশ খাইতে লাগিল। ভুবনমোহিনী জল আনিয়া দিলেন। খাওয়ার ব্যাপার শেষ হইলে, সে, মা ও দিদিমার সহিত নানাপ্রকার সাংসারিক কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইল। ঘরে চাউল, ডাউল, লবণ, তৈল ইত্যাদি সামগ্রী আছে কি না, তাহা সে সন্ধান করিল। কোন্ কোন্ সামগ্রী কালই চাহি, তাহা স্থির করিয়া লইল। নগদ পয়সা ফুরাইয়া গিয়াছে জানিয়া, সে একটা টাকা দিল। তাহার পর বলিল,—“আমি আজি যাইব, আবার পাঁচ সাত দিন পরে আসিব। তোমরা বড় সাবধানে থাকিবে। খাওয়া দাওয়ায় কোন কষ্ট করিবে না। যে

সকল জিনিস ফুরাইয়াছে, তাহা কালি প্রাতে আসিয়া পৌঁছিবে। যদি বিশেষ কোন দরকার পড়ে, তাহা হইলে যে জায়গা বলিয়া দিয়াছি সেখানে খবর দিবে। তাহা হইলেই হয় আমি নিজে, না হয় অন্য কোন আত্মীয় লোক আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ঈশ্বর-কৃপায় সকলেরই শরীর নীরোগ থাকিবে। যদি কাহারও পীড়া হয়, তাহা হইলে যে কবিরাজের কথা বলিয়া দিয়াছি, তাঁহার নিকট খবর পাঠাইবামাত্র, তিনি আসিয়া দেখিয়া যাইবেন—ঔষধ দিবেন। কোন বিষয়ে কোন ভয় নাই—ভাবনা নাই। যে স্ত্রীলোক তোমাদের দেখাশুনা করিবে, খবর লইবে, হাটবাজার করিয়া দিবে স্থির করিয়া দিয়াছি, সে সর্ব্বদা আইসে তো? আবশ্যক হইলে তাহাকে দিনরাত্রি বাটীতে রাখিয়া দিবে। তাহার বড় সাহস—রাত্রি দু'পরে তাহাকে কোন ভার দিলেও সে তাহাতে নারাজ হইবে না।"

সমস্ত কথা শুনিতে শুনিতে, ভুবনমোহিনীর চক্ষুতে জল আসিল। তিনি বলিলেন,—"আমাদের জন্য এত ভাবনা কেহ কখনও ভাবে নাই। অতি আপনার লোকেও এমন যত্ন করে না। বাবা! তুমি আমাদের কে?"

যুবা বলিল,—"আমি তোমার পেটের ছেলে মা। আর এই খোকার দাদা, কেমন রাধা!"

রাধা বলিল,—"না, আমাল।"

যুবার গলা জড়াইয়া খোকা বলিল,—"আমাল—

আমাল।” যুবা দু’জনকেই আদর করিয়া বলিল,—“আমি তোমারও দাদা, তোমারও দাদা—কেমন? দেখ দেখি মা, আমি তোমার পেটের ছেলে কি না! মা বোনের যত্ন সবাই করে তো মা!”

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—“তুমি দেবতা। তুমি আমার ছেলে হইয়াছ—আমি ভাগ্যবতী। ভগবান তোমাকে নিরাপদে রাখুন।”

যুবা বলিল,—“মার আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না; অবশ্যই ভগবান আমাকে নিরাপদে রাখিবেন।”

বৃদ্ধা বলিলেন—“কিন্তু ভাই, আমাদের জন্য তোমার যে অনেক খরচ হইতেছে! তুমি আপনার সংসার চালাইয়া, আবার আমাদের বোঝা কত দিন বহিতে পারিবে দাদা?”

যুবা হাসিয়া বলিল—“দিদি মা, তুমি তো বুড়া হইয়াছ। কয়খানা হাড়ে আর কতই বোঝা হইবে? আর এ দুইটি ছেলেও বড় ভারী বোঝা নয়। এক মা! তা মার বোঝা আর যোয়ান ছেলে বহিতে পারিবে না? কেন দিদি, তুমি এত ভাবিতেছ? আমার সংসারে আর তোমাদের সংসারে কি তফাৎ আছে দিদি? যদি সে সংসার চলে তবে এ সংসারও চলিবে। যদি সেখানে না চলে, এখানেও চলিবে না! সেখানেও আমার গৃহিণী এখানেও আমার গৃহিণী। জোর দু’জায়গাতেই সমান। কি বল দিদি?”

বৃদ্ধার চক্ষুতেও জল। তিনি নেত্র মার্জ্জন করিয়া বলিলেন—"তুমি কখনই মানুষ নও।"

যুবা বলিলেন—"তবে আমি কি বাঘ, না ভালুক? সরিয়া যাও দিদি—যদি কামড়াই।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"মা যাহা বলিয়াছেন তুমি তাহাই। তুমি দেবতা।"

যুবা বলিলেন,—"তবে দিদি, তোমার সশরীরে স্বর্গ! আমি দেবতা নই, কিন্তু দেবতা আমার সহায় বটেন। পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফলে ও তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমি দেবতার দাস হইয়াছি। সে দেবতার ঘর কন্না আছে, স্ত্রী পুত্র আছে, আহার ব্যবহার লোক-লৌকিকতা আছে। তিনিও তোমার আমার মত মানুষ—তথাপি তিনি দেবতা, তিনি কার্য্যময়। যেখানে বিবাদ, যেখানে দুঃখ, সেখানে তিনি। তাঁহাকে ডাকিতে হয় না, সংবাদ দিতে হয় না, তিনি স্বয়ং সর্ব্বত্র উপস্থিত। তিনি কখন দুরাত্মার দণ্ড দিতেছেন, কখন সাধুর সেবা করিতেছেন। কখন দুঃখীর জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন, কখন কখন ইচ্ছা করিয়া কাহাকে দুঃখ দিতেছেন। তিনি রাজা নন, ধনী নন; কিন্তু তাঁহার অভাব নাই, তাঁহার কার্য্যে অর্থের অভাব হয় না। তিনি ভিক্ষা করেন না, অথচ লোকে তাঁহার চরণে ধন ঢালিয়া দেয়। তাঁহার সঞ্চয় নাই—কেবল ব্যয়। তাঁহার কার্য্যে স্বার্থ নাই—

কেবল পরের জন্যই তাঁহার কার্য্য। তাঁহার ভয় নাই—কেহ তাঁহাকে অবসন্ন করিতে পারে না। তাঁহার ভয়ে অনেকে অস্থির। তিনি সাক্ষাৎ সাহস ও ভরসা। তিনি কখন কোথায় থাকেন, স্থির নাই—অথচ যেখানে আবশ্যক, সেখানেই তাঁহাকে দেখা যায়। তাঁহার আদালত নাই, তিনি হাকিম নহেন, অথচ সকল স্থানেই তিনি স্বাধীন ভাবে সূক্ষ্ম বিচার করিতেছেন। দিদি মা, তোমাদের আশীর্ব্বাদে, আজি দুই মাস হইল, আমি সেই দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। সে সময় একটা বিশেষ দরকারের জন্য আমার হাতে হাজার টাকা ছিল। আমি সেই টাকা তাঁহারই কাজে লাগাইয়া দিয়াছি। সেই অবধি আমি সেই দেবতার দাস হইয়া আছি। তাঁহার উপদেশে আমার কাজকর্ম্মের কোন অসুবিধা নাই—আমি সর্ব্ব-প্রকারে বড় সুখে আছি। আমি সেই দেবতার হুকুমে তোমাদের যত্ন করি। ভাগ্যে থাকিলে তোমরাও অবশ্য সে দেবতার সাক্ষাৎ পাইবে।”

যুবার মা ও দিদি-মা নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দিদি মা বলিলেন,—“এমন যিনি, তিনি তো দেবতাই বটেন। তোমার ন্যায় পুণ্যবান না হইলে অন্যে সে দেবতার সাক্ষাৎ পাইবে কেন? আমি মহাপাপী, আমি কি সে দেবতা দেখিতে পাইব?”

যুবা বলিল,—“অবশ্য পাইবে। কেন আমি দেখি-

লেই কি তোমার দেখা হয় না? তবে তোমার কিসের ভালবাসা? আমি এখন আসি। রাত্রি হইয়া পড়িল। আমাকে এখন শান্তিপুর যাইতে হইবে। দিদি-মা, তোমার ছেলে মেয়ের জন্য ভয় নাই, তাঁহারা ভাল আছেন।”

দিদি মা বলিলেন,—“তাহাদের নামে কাজ নাই। তাহারা আছে কি মরিয়াছে, তাহাও জানিতে আমার সাধ নাই। তুমি এখনই যাইবে কেন? যদি যাইতে হয়, তবে খাওয়া দাওয়া করিয়া যাইবে।”

যুবা বলিল,—“আমার অনেক কাজ আছে। এখনই না যাইলে নহে।”

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—“বাবা, তুমি দেবতার কথা বলিলে বলিয়া মনে হইতেছে। মা শুনিয়া আসিয়াছেন, কৈলাসপর্ব্বত হইতে শিব আসিয়া নাকি সুরেন্দ্র বাবুকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। এ কথা কি সত্য, বাবা!”

যুবা বলিল,—“একথা তোমাদের এখানেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বুঝি? কৈলাস পর্ব্বত না হউক, কোন বনজঙ্গল হইতে কোন সন্ন্যাসী সুরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় গিয়াছিলেন বটে। আমি সব জানি। সুরেন্দ্র বাবুর কোন অনিষ্টই সন্ন্যাসী করেন নাই। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন। কথাটা এরূপ হইয়া প্রচার হইল কেন, জানি না।”

ভুবনমোহিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"কে সে সন্ন্যাসী ?"

যুবা উত্তর দিলেন,—"তোমারই কোন বাবা হইবে।"

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—"আমার বাবা তো সন্ন্যাসী নহেন।"

যুবা উত্তর দিলেন,—"সন্ন্যাসী যেই হউন, তিনি সুরেন্দ্র বাবুর কোন অনিষ্ট করেন নাই। সুরেন্দ্র বাবু যদি সাবধান হইয়া না চলেন, যদি পাপে বিরত না হন, তাহা হইলে সন্ন্যাসী তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবেন বলিয়াছেন।"

ভুবনমোহিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"সন্ন্যাসী এখন কোথা ?"

"তাহা জানি না মা। আমি এই সকল গল্প শুনিয়া রাজীবপুরে জানিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, সন্ন্যাসী এইরূপ শাসন শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দেখিলাম, সুরেন্দ্র বাবু বারান্দায় বসিয়া মুখ ধুইতেছেন। কিন্তু যাহাই হউক মা, সন্ন্যাসীর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার মনে বোধ হইয়াছে, যদি সুরেন্দ্র বাবু সাবধান হইয়া না চলিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার গুরুতর বিপদ ঘটিবে। সন্ন্যাসী মহাপুরুষ সন্দেহ নাই। তিনি তোমাদের প্রতি সুরেন্দ্র বাবুর অত্যাচারের খবরও জানেন। সুরেন্দ্র বাবুকে যে যে কথা উল্লেখ করিয়া তিনি শাসন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এ কথাও ছিল।"

ভুবনমোহিনী বলিলেন,—"তোমার কথা শুনিয়া

আমি আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলাম। সুরেন্দ্র বাবুকে মারিয়া ফেলিয়াছে শুনিয়া আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল। একদিন না একদিন তাঁহার মতিগতি অবশ্যই ভাল হইবে। তাঁহার ধন আছে, ক্ষমতা আছে, তখন তাঁহার দ্বারা কত লোকের কত উপকার হইবে। সঙ্গ-দোষে এখন মন্দ বলিয়া, চিরদিন তিনি মন্দ থাকিবেন না। তিনি মারা যান নাই শুনিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইল।"

যুবা মনে মনে ভাবিলেন,—"এই জন্যই মা তোমাকে দেবী ভাবিয়া তোমার সন্তান হইয়াছি। দেবী যে তুমি, তাহার সন্দেহ কি?" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"তবে এখন আমি আসি মা। পাঁচ সাত দিন পরে আবার আসিব।"

যুবা, বালক-বালিকাকে কোলে লইয়া চুম্বন করিলেন, তাহাদের অনেক আদর করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

ভুবনমোহিনী, যুবার নিকটস্থ হইয়া, অবনত বদনে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"যাঁহাদের কথা বলিতেছিলে বাবা, তাঁহারা বাস্তবিকই ভাল আছেন কি?"

যুবা বলিলেন,—"হাঁ মা, নন্দী মহাশয় ও তাঁহার ভগ্নী দুজনেই ভাল আছেন। ভগবানের কৃপা হইলে তাঁহাদের মতিগতি ভাল হইবে। তাঁহারা যাহাতে কষ্ট না পান, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

ভুবনমোহিনী যেন একটু নিশ্চিন্ত হইলেন। যুবা

প্রস্থান করিলেন। যতদূর তাঁহাকে দেখা যায়, ভুবন-মোহিনী ততদূর তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"মা, আমার ছেলে চলিয়া গেলে সংসার অন্ধকার। এমন যার ছেলে, তার কিসের দুঃখ মা? আমার ছেলে কি সত্যই মানুষ?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"তোমার ছেলে যদিই মানুষ হয়, সহজ মানুষ কখনই নয়। দেবতা আর কাহাকে বলে বাছা?"

কাঁদিতে কাঁদিতে খোকা বলিল,—"মা মা, আমাল ডাডা কই?"

রাধিকা বড়। সে বলিল,—"মা, আমি ডাডার কাছে যাব।"

ভুবনমোহিনী উভয় শিশুকে কোলে লইয়া বলিলেন—"তোমাদের দাদা বাড়ী গিয়াছেন। আবার শিগ্‌গির আসিবেন যাদু।"

বৃদ্ধার নাতি, ভুবনমোহিনীর ছেলে, খোকা-খুকীর দাদা, এ লোকটা কে তাহা পাঠক মহাশয়রা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? বলা বাহুল্য, লোকটা আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, কৃষ্ণনগরের দোকানদার, সেই মূর্খ যদু হালদার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হারাধনকে লাঠি মারিয়া, তরঙ্গিণীকে মারিতে উদ্যত হইলে, অপরিচিত এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া, কালিদাস চক্রবর্ত্তী সেস্থান হইতে পালায়ন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিল। সে কাপুরুষ—ভাবী বিপদের বিভীষিকা কল্পনা করিয়া অবসন্ন হৃদয়ে পলায়ন করিল। বুক পাতিয়া এরূপ ব্যাপারের সম্মুখীন থাকিতে যে সাহসের প্রয়োজন হয়, তাহা তাহার নাই। সে চলিয়া গেলে অপরিচিত পুরুষ হারাধনের নিকটস্থ হইলেন, এবং সযত্নে আহত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"মারা যায় নাই, যত্ন করিলে এখনও বাঁচিতে পারে।"

তরঙ্গিণী এতক্ষণ প্রায় অজ্ঞান হইয়া ছিল। তাহার সম্মুখে সহসা যে ভয়ানক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল, যে লাঠির হাত হইতে এই ব্রাহ্মণের কৃপায় সে অব্যাহতি পাইল, কি ভাবিতে ভাবিতে কিরূপ কার্য্য ঘটিয়া গেল, ইত্যাদি সমস্ত ভয়-ভাবনা মিলিয়া তাহাকে অতিশয় অবসন্ন করিয়াছিল। সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কেন সেখানে আছে, সকল কথাই এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়া-

ছিল। এক্ষণে, ব্রাহ্মণের বাক্য কর্ণগোচর হওয়ায়, তাহার সংজ্ঞা হইল। সে তখন বলিল,—"তবে মারা যায় নাই। কেমন মহাশয়? এক্ষণে উপায়?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"যত্ন করিলে বাঁচিতে পারে! আমার সাহায্য কর—বাঁচিয়া উঠিবে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি—আমি কি করিব? আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, যত্ন করা দূরে থাকুক, এ স্ত্রী-লোকের দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তিনি বলিলেন,—"ওদিকে ঘুমাইতেছে, ও কে?

তরঙ্গিণী বলিল,—"ও ইহারই ভগ্নী। আপনি উহাকে উঠাইয়া যাহা করিতে হয় বলুন। আমি এখন কোথায় যাই মহাশয়?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তুমি যাইবে কোথায়? এখনই থানার লোকেরা তদারক করিতে আসিতে পারে। তুমি যে সঙ্গে ছিলে, তাহা অনেক লোকেই বলিবে। তোমার উপরই তখন সকল ঝোঁক পড়িবে। বিশেষ উহার ঐ ভগ্নী উঠিয়া তোমাকে দেখিতে না পাইলে, বলিবে—তুমি তাহার ভাইকে মারিয়া পলাইয়া গিয়াছ। এ ইংরাজের মুলুক—পলাইয়া কোথায় যাইবে? সহজেই ধরা পড়িবে এবং এই খুনের দায়ে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

তরঙ্গিণী কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল,—"আপনি আমাকে একবার বাঁচাইয়াছেন। দয়া করিয়া আর এক-বার আমার সাহায্য করিবেন না কি? আপনি না থাকিলে এখনই কালিদাসের লাঠিতে আমার প্রাণ যাইত। যখন প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তখন এ দায় হইতে রক্ষা করিবেন না কি? এখানে থাকিতে আমার বড় ভয় হইতেছে। আমি এখানে কোন মতেই থাকিতে পারিব না। আপনি দয়া করিলে আমি পলাইয়া যাইতে পারি। আপনি একটু সাহায্য করিলে আমি বাঁচিয়া যাই।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমাকে কি করিতে বল?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"এখানে গঙ্গার ধারে, মোটা থামওয়ালা বাটীতে একজন রাজা আছেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় আছে। আমাকে একবার সঙ্গে করিয়া সেখানে পৌঁছাইয়া দিলে আমার আর বিপদ থাকিবে না। আপনি দয়া করিবেন কি?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"এজন্য সাহায্য করিবার কোনই আবশ্যক দেখিতেছি না। রাত্রি এখনও বেশী হয় নাই। পথে—দোকানে এখনও লোক যথেষ্ট। সে রাজার বাড়ী বেশ সদর জায়গায়। সকলেই সে বাড়ী জানে। অতএব তুমি সহজেই সেখানে একা যাইতে পারিবে। কিন্তু তুমি তোমার সঙ্গীকে এই অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যাইবে কিরূপে?"

"কেন যাইব না? ও তো আমার কেহ নহে! আমি এখানে আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার বড়ই ভয় করিতেছে।

ব্রাহ্মণ।—আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তুমি ইহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মদ খাওয়াইয়াছিলে। অবশ্যই ইহার সহিত তোমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। ইহার এই বিপদ, আর তুমি ফেলিয়া যাইবে?

তরঙ্গিণী।—উহার সহিত আমার আলাপ ছিল বটে; তেমন আলাপ আমার কত লোকের সঙ্গেই আছে। কিন্তু এখানে তাই বলিয়া থাকিতে পারি না। যদি আবার কালিদাস চক্রবর্ত্তী আইসে? না মহাশয়, আমি এখানে থাকিব না।

ব্রাহ্মণ।—তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে সকল রকম দায়েই ফেলিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না। যদি দারোগা আইসে, আমি তোমার নাম-টিও করিব না, তোমার কোন সন্ধানও বলিব না; কিন্তু উহার ভগ্নী অবশ্যই সকল কথা বলিবে। তখন কি উপায় করিবে?

তরঙ্গিণী।—আমার সন্ধান করিতে পারিবে না। আমি রাজার নিকট নিশ্চয়ই আশ্রয় লইব। সে আশ্রয় হইতে আমাকে ধরে কাহার সাধ্য?

ব্রাহ্মণ।—আর যদি এই রাত্রিতে রাজার দরওয়ানেরা তোমাকে ভিতরে ঢুকিতে না দেয়, যদি তুমি রাজার সহিত দেখা করিয়া উঠিতে না পার, তাহা হইলে কি হইবে?

তরঙ্গিণী একটু চিন্তা করিল। এ সম্ভাবনাটা এক-বারও তাহার মনে হয় নাই। বাস্তবিকই এ বড় ভাবনার কথা! সে একটু ভাবিয়া বলিল,—"তা যা হয় হইবে, আমি এখানে থাকিতে পারিব না। আমি যাই।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন।—"যাইবে যাও—আমি তোমার কোনই অনিষ্ট করিব না, বরং যাহাতে কেহ তোমার সন্ধান না করে তাহারই ব্যবস্থা করিব। কিন্তু তুমি ঐ স্ত্রীলোকটার একটা ব্যবস্থা করিয়া যাও। ও তোমার সঙ্গিণী—উহাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"উহার আমি কি ব্যবস্থা করিব? আমি স্ত্রীলোক, আমার ব্যবস্থা কে করে ঠিক নাই; আমি আবার পরের কি ব্যবস্থা করিব! উহার ভাইয়ের জন্যই উহার সহিত আমার আলাপ। ও আমার কে যে আমি উহার ভাবনা ভাবিয়া মরিব? আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না। আমি যাই মহাশয়—যদি চক্রবর্ত্তী আবার আইসে!"

ব্রাহ্মণ।—তোমার ইচ্ছা হয় যাইতে পার। আমি

তোমার কোন অনিষ্ট করিব না, কিন্তু ঈশ্বর তোমার ব্যবহারে তুষ্ট থাকিবেন না। অবশ্যই তাঁহার বিচারে তোমায় দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

তরঙ্গিণী কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের বাহিরে আসিল এবং বারংবার চতুর্দ্দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বাস্তবিকই পলায়ন করিল।

দেখ্ হারাধন! তোমার সাধের প্রেমের আজি এই পরিণাম! যাহার প্রেমে তুমি গর্ব্বিত ছিলে, যাহার প্রেম তুমি তুলনা-রহিত বলিয়া মনে করিতে, যাহার প্রেমানু-রোধে তোমার স্বাধ্বী ধর্ম্মপত্নীকে তুমি অবহেলা করিতে, তোমার সেই সাধের কুলটা তরঙ্গিণী, তোমাকে এই দশাপন্ন দেখিয়াও, সচ্ছন্দে পলায়ন করিল! আর যে পত্নীকে তুমি কখন ভাল কথা বল নাই, কি খাইবে, না খাইবে ভাব নাই, নিকটস্থ হইলে যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছ, মুখ দেখিতে হইলে বিপদ জ্ঞান করিয়াছ, সেই দেবী আজি এখানে থাকিলে কি করিতেন, জান? তোমার চরণ বক্ষে ধরিয়া, তোমাকে বাঁচাইবার জন্য, প্রাণের প্রাণ লুটাইয়া ভগবানের নিকট কাঁদিতেন। হায়! তথাপি ভ্রান্ত মানব অবৈধ প্রেমের অনুরাগী কেন হয়?

ধন্য ব্রাহ্মণ তুমি! হারাধন তোমার কেহ নহে। তাহার সহিত কখন তোমার পরিচয় নাই। কোথা হইতে অতি সুসময়ে অবতীর্ণ হইয়া, তুমি তাহার জীবন

রক্ষায় ব্রতী হইয়াছ! কি তোমার শক্তি! কি তোমার কৌশল! কি তোমার অভিজ্ঞতা! তুমি কি চিকিৎসক? সকল বিদ্যাই কি তোমার আয়ত্ত? ধন্য তুমি! তৃণাদপি লঘু হারাধনের জীবনরক্ষার্থ এ আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হইবে না। তোমার কৃপায় হারাধন হয় তো বাঁচিয়া যাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তরঙ্গিণী ভয়ে ভয়ে চলিতে লাগিল। প্রতি পাদ-ক্ষেপেই নানা আশঙ্কায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকিল। সম্মুখ দিয়া একটা মানুষ বেগে চলিয়া যাই-তেছে—বুঝি বা কালিদাস! পার্শ্ব হইতে একটা লোক উঁকি দিয়া দেখিতেছে—ঐ বুঝি চক্রবর্ত্তী! পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিতেছে—বুঝি কালিদাস ধরিতে আসিল! একটা দোকানদার ঝুপ করিয়া বাক্সের ডালা ফেলিয়া দিল—বুঝি কাহার ঘাড়ে কে লাঠি মারিল! তরঙ্গিণী বড় ভয়ে চলিতে থাকিল। দুই একটা লোক তাহাকে দেখিয়া হাসিল—তরঙ্গিণী ভাবিল, তবে ইহারা হয় তো জানে কোথায় কালিদাস আছে—ধরাইয়া দিবে বা! দুই একজন দোকানের লোক তাহাকে দেখিয়া গা-টেপাটিপি করিল—তরঙ্গিণী ভাবিল, তবে হয় তো ইহারা তাহাকে চিনিয়াছে। দুই একটা লোক তাহাকে একা-কিনী দেখিয়া দুই চারিটা অতি কুৎসিত রসিকতা করিল। বারনারীর হৃদয় এ সম্বন্ধে চিরাভ্যস্ত, সুতরাং তরঙ্গিণী তাহা গায়ে মাখিল না। এইরূপে চলিতে চলিতে সে গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইল। বড় গুঁড়ায় নৌকা

বাঁধিবে, ইহাই তাহার কামনা। কালিদাসের নিকট অবিশ্বাসিনী হওয়ায়, সে এখন ক্ষতি বোধ করিতেছে না। কোনরূপে রাজার নিকটস্থ হইতে পারিলেই তাহার মনোরথ সফল হইবে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ নাই। হারাধন তাহার কে তাই তাহার জন্য সে ভাবিবে? যাহারা দেহ বিক্রয় করিয়া প্রেমের ব্যবসায় করে, তাহাদের হৃদয় এইরূপই হইয়া থাকে। দোকানদার যেমন বড় খরিদদার পাইলে, ছোট ক্রেতাকে উপেক্ষা করিয়া, বড়র সংবর্দ্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তরঙ্গিণীও তাহাই করিতেছে। রাজাকে হস্তগত করাই এখন তাহার একমাত্র বাসনা। সে যে কৃতকার্য্য হইবে, তদ্বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

তরঙ্গিণী গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইল। বড় থামওয়ালা বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইল না। বড় থামওয়ালা বাড়ীর নিকটস্থ হইয়া সে দেখিল, দ্বারে সঙ্গিনসমেত বন্দুকধারী, পোষাক আঁটা এক পাহারাওয়ালা পায়চারি করিতে করিতে, দরজায় পাহারা দিতেছে। তাহার নিকটস্থ হইতে প্রথমতঃ তরঙ্গিণী সাহস করিল না। অন্য উপায় থাকিলে, সে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালাকে দেখিয়াই পলাইয়া যাইত; কিন্তু তাহার তখন আর উপায় নাই। সে তখন সাহসে ভর করিয়া, সেই পাহারাওয়ালার নিকটস্থ হইল। অন্য

লোক এত কাছে আসিলে পাহারাওয়ালা চেঁচাইয়া দেশ মাথায় করিত। কিন্তু এই রাত্রিকালে একটা স্ত্রীলোক কাছে আসিতেছে দেখিয়া, সে গোল করিল না। বরং গোঁফ দাড়ি একবার ঠিক করিয়া লইয়া, একটু বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোক নিকটে আসিলে, পাহারাওয়ালা তত্রত্য আলোকের সাহায্যে দেখিল, স্ত্রীলোক সুন্দরী এবং যুবতী বটে। বলা বাহুল্য, সে বড়ই খুসী হইল। স্ত্রীলোক বলিল,—"পাহারাওয়ালাজী, তোমার সহিত আমার দুই একটা কথা আছে।"

পাহারাওয়ালা মনে করিল, আজি তাহার সুপ্রভাত বটে। বলিল,—"বল, আমায় কি করিতে হইবে?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"করিতে বড় কিছু হইবে না; কেবল তোমাদের রাজাকে একবার খবর দিতে হইবে।"

একে স্ত্রীলোক, তায় সুন্দরী, সুতরাং সাত খুন মাপ। পাহারাওয়ালা যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা হইল না। স্ত্রীলোকটা রাজার সন্ধান করে যে। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"রাজাকে তোমার কি দরকার? তিনি তো বাড়ী নাই—খানিকক্ষণ হইল বাহিরে গিয়াছেন। কখন ফিরিবেন ঠিক নাই।"

তরঙ্গিণী একটু দমিয়া গেল। বলিল,—"কোথায় গিয়াছেন জান?"

"রাজারাজড়ার কথা, কেমন করিয়া জানিব! কিন্তু

রাজার কাছে তোমার কি দরকার? তুমি কি রাজাকে জান?”

“জানি।”

পাহারাওয়ালা, এ উত্তরের পর, তরঙ্গিণীর সহিত কোন প্রকার আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা অসম্ভব বলিয়া মনে করিল। তরঙ্গিণী আবার জিজ্ঞাসিল,—“নীলরতন চৌধুরী মহাশয় বাড়ী আছেন?”

পাহারাওয়ালা এবার বুঝিল, রাজার সহিত এ স্ত্রীলোকের বাস্তবিকই বিশেষ পরিচয় আছে। রাজার পরিচিত স্ত্রীলোক, এমন ভাবে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে, ইহা একটু অসঙ্গত হইলেও, সে তরঙ্গিণীকে খাতির না করা অন্যায় বলিয়া মনে করিল! বলিল,—“আছেন। তাঁহাকে খবর দিতে হইবে কি?

তরঙ্গিণী বলিল—“যদি দেও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।”

পাহারাওয়ালা তরঙ্গিণীকে সঙ্গে আসিতে বলিল। তরঙ্গিণীকে নীচের একটা ঘরে রাখিয়া সে একটা খানসামার দ্বারা সরকার বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইল। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ নীলরতন চৌধুরী তথায় হাজির হইলেন এবং সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—“একি? মেঘ না হইতে জল! এই রাজার সঙ্গে এতক্ষণ তোমারই কথা হইতেছিল। তা তুমি কাহার সঙ্গে আসিলে? আমি

এখনই তোমার নিকট যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। কিন্তু ওকি! তোমাকে বড় কাতর ও উৎকণ্ঠিত দেখি-তেছি কেন?”

তরঙ্গিণী বলিল,—“আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। বসি আগে, তাহার পর সকল কথা বলিতেছি। বড় ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে।” এই বলিয়া, সে তত্রত্য এক চারিপাইয়ে বসিয়া পড়িল এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। যে যে ভয় ও ভাবনায় সে পলাইয়া আসিয়াছে, এ বিপদে রাজার আশ্রয় না লইয়া সে যে থাকিতে পারিতেছে না, ইত্যাদি কথাও সে বলিল।

সমস্ত কথা শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—ভালই করিয়াছ। তুমি যেমন রাজার জন্য ভাবিতেছ, রাজাও তোমার কথা তার চেয়ে দশ গুণ বেশী ভাবিতেছেন। তাঁহাকে আমি বেশ করিয়া ফাঁদে ফেলিয়াছি। আজি তাঁহার এমন একটা নিমন্ত্রণ আছে যে, কোন ক্রমে সেখানে না যাইলে চলিবার উপায় নাই। নিতান্ত অনি-চ্ছায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইয়াছে। সেখানে নাচগান আছে, তাঁহাকে যে ছাড়িবে এমন বোধ হয় না। তিনি যাইবার সময়, আমাকে তোমার নিকট যাইতে ও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে, বিশেষ করিয়া হুকুম দিয়া গিয়াছেন। আমিও যাইবার উদ্যোগ করি-তেছি, এমন সময় তুমি আপনি আসিয়া উপস্থিত। তা

ভাই, বলিতে গেলে তুমিই তো এখন আমাদের রাণী হইতে বসিলে। আর তোমার সহিত সমান ভাবে কথা কহিতেও আমাদের সাহস হইবে না। দেখিও ভাই, গরিবের দরখাস্তটা ভুলিও না।"

ভাল হউক, মন্দ হউক, আশা সফল হইলেই মানুষের অপরিসীম আনন্দ হয়। তরঙ্গিণী বড় আশা করিয়াছিল, বড় সুসংবাদ সে পাইল। আনন্দে বিগত ঘটনাসকল ভুলিয়া গেল। তখন তাহার চিরাভ্যস্ত রূপ-গৌরব মনে উদিত হইল। সে তখন মনে করিল, কালিদাস-বানরের হাতে পড়িয়া সোণার রূপ-যৌবন সে প্রায় মাটী করিয়াছে; কিন্তু এখনও যাহা আছে, তাহাও পর্ব্বত, তাহাও অবলীলাক্রমে রাজারাজড়ার মাথা ঘুরাইয়া দিতে সক্ষম। এখনই বা কি হইয়াছে? এই রাজাকে মুঠার মধ্যে না করিয়াই কি সে ছাড়িবে? থাকুক না কেন রাজার দশটা রাণী। তরঙ্গিণী তাহাদিগকে বিরাজমোহিনীর মত লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিবে, ইহাই তাহার সঙ্কল্প।

সরকার মহাশয় বলিলেন,—"ইহার পর আর বলিবার সময় ও সুযোগ হইবে কি না সন্দেহ। এই বেলা বলিয়া রাখি ভাই আমাকে দয়া করিয়া নগদ যাহা দিতে ইচ্ছা হয় দিও। আর একটা কথা—শীঘ্রই রাজার দেওয়ানের পদ খালি হইবে। বৃদ্ধ দেওয়ান আর কাজ করিতে পারিতেছে না, রাজা তাহাকে একটা জমিদারী দিয়া বিদায়

করিবেন। তোমার কাছে আমি এই সময় হইতে দরখাস্ত করিয়া রাখিতেছি, সে চাকরী আমি ছাড়া আর কেহ যেন না পায়। আমি জানি, কালি হইতে তোমার কথাতেই রাজা উঠিবেন বসিবেন; রাজার বিষয়কর্ম্ম তোমার হুকুমেই চলিবে। সুতরাং ভাই, তুমি কৃপা করিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।”

বড়ই আহ্লাদের কথা! দেখ্ আসিয়া মূঢ় হতভাগা কালিদাস, তরঙ্গিণীর আজি কত সৌভাগ্য উপস্থিত। তোর মত একটা জাম্বুবানের আনুগত্য সে এতদিন করিয়াছে, ইহাই তোর কত সৌভাগ্য! একটু অবিশ্বাসিনী হইয়াছিল বলিয়া—না বুঝিতে পারিয়া দৈবাৎ একটু বিপথগামিনী হইয়াছিল বলিয়া, তুই কি না তাহার মাথায় লাঠি মারিতে আসিস্। আশ্চর্য্য তোর স্পর্দ্ধা!

তরঙ্গিণী সে সম্বন্ধে নীলরতনকে বিশেষ ভরসা দিলে, নীলরতন বলিলেন,—“এক্ষণে কি করিবে, মনে করিতেছ?”

তরঙ্গিণী বলিল,—“রাজাই আমার প্রাণ—রাজাই আমার সর্ব্বস্ব। আমি রাজার জন্য সকলই ছাড়িয়াছি—রাজাকে এ জীবনে ছাড়িব না; এখানে আসিয়াছি, এই খানেই থাকিব।”

নীলরতন বলিলেন,—“তা তো বটেই। রাজার যে রকম ঝোঁক, তাহাতে তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে তিনিই

বা পারিবেন কেন? তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসার পর, আর এই পর্য্যন্ত রাজা আমার সঙ্গে কেবল, তোমারই কথা কহিয়াছেন। তোমার রূপ, গুণ, কথাবার্ত্তা, স্বভাব সকলই তাঁহাকে এত মজাইয়াছে যে, এখন তোমাকে না পাইলে, তাঁহার বিষয়কর্ম্ম সংসার-ধর্ম্ম সকলই রসাতলে যাইবে। সুতরাং রাজা যে তোমার হইয়াই থাকিবেন, তাহার আর ভুল নাই। কিন্তু তুমি বড় কাঁচা কথা কহিতেছ কেন? তোমার এত বুদ্ধি, অথচ তোমার কথা ছেলেমানুষের মত কেন। যেরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার এখানে থাকা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। এরূপ সুযোগ আর কখন উপস্থিত হইবে না। বলি, শুন আগে—তাহার পর যাহা বলিতে হয় বলিও। এখানে তোমার থাকা হইবে না। কালিদাস চক্রবর্ত্তীর যে বাটী, সে বাটী বাস্তবিক তোমারই। সেখানেই তোমাকে যাইতে হইবে—সেখানেই তোমাকে থাকিতে হইবে।”

তরঙ্গিণী বলিল—“এই ঘটনার পর, সেখানে আমি কোন্ সাহসে যাইব, কেমন করিয়া থাকিব? আমাকে চক্রবর্ত্তী মারিয়া ফেলিবে যে!”

নীলরতন হাসিয়া বলিল,—“তুমি পাগল। তোমার বয়সও যেমন কাঁচা, বুদ্ধিও তেমনই কাঁচা। কালিদাস চক্রবর্ত্তী তোমাকে মারিয়া ফেলিবে! কাহার ঘাড়ে দুটা

মাথা যে, রাজা অরবিন্দকুমার রায় বাহাদুরের প্রণয়িণীকে একটা কথা কহে ? চক্রবর্ত্তী তো সামান্য একটা দোকানদার, স্বয়ং লাট সাহেবকেও তোমাকে সেলাম করিয়া কথা কহিতে হইবে। এই সময় এই সুযোগে তোমাকে সেই ঘর বাড়ী জিনিস পত্র দখল করিয়া বসিতে হইবে। সে বাড়ী, সেখানকার দ্রব্যসামগ্রী, কখনই হাত ছাড়া করা হইবে না। চক্রবর্ত্তী এখন কোথায় ? সে খুন করিয়া পলাতক হইয়াছে। সে কি এই ঘটনার পর চুপ করিয়া বাটীতে গিয়া বসিয়া আছে ? সে এখন প্রাণের ভয়ে কোথায় গিয়া লুকাইয়াছে ; ছয় মাসের মধ্যে সে এ মুখো হইবে না, ইহা স্থির জানিবে। এই সময় সব দখল করিতে হইবে।”

তরঙ্গিণী বলিল,—“যদিই সে পলাইয়া থাকে, তাহা হইলে দশ দিন পরেও তো আসিবে। তখন আমার দশা কি হইবে !”

নীলরতন আবার হাসিয়া বলিল—“যদিই আইসে, আমরা তাহাকে বাটীতে ঢুকিতে দিব কেন। রাজার সঙ্গিন আঁটা পাহারাওয়ালা তোমার দরজায় পাহারা দিবে জান ? কাহার সাধ্য সেখানে প্রবেশ করে ? মাথাটি দরজায় রাখিতে হইবে না ? তুমি কে, তাহা যে তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। যমে তোমাকে ছুঁইতে পারিবে না, তায় চক্রবর্ত্তী কোন্ ছার ! তাহার মত লোক তো তখন তোমার

রাঁধুনি হইবে। আরও দেখ, একটা আলাহিদা বাটীতে তুমি না থাকিলে, তোমার বা রাজার আমোদ আহ্লাদ হইবে না। এটা আমি অনেক বিবেচনা করিয়া একটা ঘরাও কথা বলিতেছি। রাজা এ পরামর্শের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। বিবেচনা কর, তোমাদের আমোদ আহ্লাদের স্থান যেখানে, সেখানেই, যদি রাজার কাছারি, বিষয় কর্ম্ম, দেখা সাক্ষাৎ, সকল বিষয়ের স্থান হয়, তাহা হইলে দেখিতে শুনিতেও ভাল হইবে না, তোমাদেরও আমোদ হইবে না, আর রাজার কাজ কর্ম্ম সকলই মাথায় উঠিবে। তিনি নিশ্চয় দিবারাত্রি তোমাকে লইয়া বসিয়া থাকিবেন, এদিকে বিষয়কর্ম্মের সর্ব্বনাশ হইবে। যখন তুমি সর্ব্ব-প্রধান আত্মীয়, তখন যাহাতে রাজার সর্ব্বনাশ না ঘটে, তাহার ভাবনা তুমি না ভাবিলে কে ভাবিবে বল? বুঝিতেছ না তুমি, রাজার বিষয়কর্ম্মের যত শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ততই তোমার সুবিধা? রাজা হয় তো তোমাকে এখানে দেখিলে, আর নয়নের আড় করিতে চাহিবেন না। কিন্তু সেটা তো ভাল নয়।”

তরঙ্গিণী বলিল,—“তা আচ্ছা—কিন্তু রাজা কি আর সেখানে যাইবেন?”

নীলরতন বলিলেন,—“যাইবেন—তা আর বলিতে? তুমি যেখানে থাকিবে, সেখানেই তাঁহার মন পড়িয়া থাকিবে। কালি প্রাতে তিনি গিয়া তোমার শ্রীমন্দিরে

হাজির হইবেন। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, একটু তফাতে থাকিলে পাওয়া নেওয়ার সুবিধা বেশী হয়। এক বাড়ীতে থাকিয়া সকল জিনিস কি স্বতন্ত্র করিয়া লওয়ার সুবিধা হইবে? রাজার তো বিষয় সহজ নহে। আয়ই তো চার লক্ষ! তা ছাড়া সোণা রূপা হীরা মুক্তা নগদ টাকা কত, বলিয়া শেষ হয় না। ইহার যদি যথেষ্ট ভাগ তোমার ঘরে না যায়, তবে রাজার সহিত প্রণয় করিয়া লাভ কি? কিন্তু ভাই বলিয়া রাখিতেছি আমাকে যেন সুখের সময় ভুলিও না। আমি আজিও যেমন ভাল পরামর্শ দিতেছি, চিরদিনই সেইরূপ দিব। আমি রাজার জন্মের পূর্ব্ব হইতে এই সংসারে আছি। তাঁহার স্বভাব প্রকৃতি আমি যেমন জানি, এমন, আর কেহ জানে না। আমি তোমাকে যেমন যেমন পরামর্শ দিব, সেইরূপ চলিলে, চিরদিনই তুমি সর্ব্বেশ্বরী হইয়া থাকিবে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তোমার মত লোক আমি আর কখন দেখি নাই। তুমি আর জন্মে আমার কে ছিলে! আমার লাভেই তোমার লাভ হইবে, তাহা তুমি নিশ্চয় জানিবে। কিন্তু ভাই, এ রাত্রিতে আমি সে বাটিতে যাইতে পারিব না।"

নীলরতন বলিলেন,—"কেন? কিসের ভয়? তুমি একা তো যাইবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব, দুই জন বরকন্দাজ সঙ্গে যাইবে। তোমাকে সেই বাটীতে

রাখিয়া, সকল ব্যবস্থা করিয়া বরকন্দাজ-পাহারা রাখিয়া, তবে আমি বাটী ফিরিব। সে জন্য তোমার কোন ভয় নাই।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"তা যাহা ভাল হয় কর। আমি তোমার মন্ত্রণা ছাড়া চলিব না।"

তরঙ্গিণী, নীলরতন, আর দুইজন বরকন্দাজ, সেই গভীর রাত্রিকালে সেই রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে গোপীনাথপল্লী বা নূতনগ্রাম নামে একটী অতি সামান্য পল্লী আছে। এই পল্লী শান্তিপুর-সংলগ্ন এবং শান্তিপুরমিউনিসিপালিটীর অন্তর্ভূত। এখানে কয়েক ঘর অতি দুস্থ লোকের বাস। পল্লী শ্রীহীন এবং উৎসাহশূন্য। শাকান্নভোজী একাহারী পল্লীবাসীগণের নিকট হইতে, মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষ-গণ টেক্স আদায় করিতে কদাপি ক্ষান্ত নহেন এবং তাহা-দের ভাঙ্গা ঘটী, ফুটা থালা ক্রোক করিতেও কখনও কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু তাহাদের যাতায়াতের পথ আছে কি না, তাহাদের পানীয় জলের সুবিধা আছে কি না, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা আছে কি না, তাহাতে কাহারও দৃষ্টি নাই। সুতরাং গোপীনাথপল্লীতে ভাল পথ নাই, ভাল জল নাই, গ্রাম ও বন মলিনতায় পরিপূর্ণ, অধিবাসীগণ স্বাস্থ্যবিহীন। কিন্তু তত্রত্য দরিদ্র, অসুস্থ, কাতর অধিবাসীবর্গের একটি আনন্দজনক, উৎসাহপ্রদ, প্রীতিকর সামগ্রী তথায় আছে। তাহাদের সেখানে জেঠা গোপীনাথ নামে এক শ্রীবিগ্রহ আছেন। সেই শ্রীবিগ্রহ

তাহাদের পরমানন্দের উৎস, এবং সর্ব্বপ্রকার প্রীতির নিকেতনস্বরূপ। গোপীনাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি দারুময়; কিন্তু সুবিশাল এবং অলৌকিক শ্রীযুক্ত। এই দেববিগ্রহ কত দিনের, কে ইহাঁর আদি-প্রতিষ্ঠাতা, কিরূপে ইনি শান্তিপুরে স্থাপিত হন, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যায় না। প্রথমে শান্তিপুরের যে ভাগে ইহাঁর শ্রীমন্দির বিরাজিত ছিল, সে স্থান ভাগীরথীর গর্ভসাৎ হইবার উপক্রম হইলে, তদানীন্তন সেবক ইহাকে জাহ্নবীতট হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী এই পল্লীমধ্যে স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে এই স্থানে লোকের বসতি ছিল না; এজন্য সেই সময় হইতে এই স্থান নূতন পল্লী বা নূতনগ্রাম নামে অভিহিত হয়। শান্তিপুরে এই শ্রীবিগ্রহের আবির্ভাব ও স্থাপনার সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। নানাপ্রকার কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির সমন্বয় করিয়া যে বিবরণ সঙ্গঠিত হয়, তাহা এই ভগবদ্বিগ্রহের অলৌকিক মহিমা ও অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। এই শ্রীবিগ্রহের দেবত্ব ও মহিমা এতই অবিসংবাদিতরূপে প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত ও পরিজ্ঞাত যে, তৎসম্বন্ধে কোনই প্রমাণ প্রয়োগ সর্ব্বথা অনাবশ্যক। এই দেববিগ্রহ বহু প্রাচীন এবং পিতৃপদবাচ্য অন্যান্য বিগ্রহাপেক্ষা প্রবীণ বলিয়াই, ইহাঁর নামের অগ্রে পিতার জ্যেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক জেঠা শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই শ্রীবিগ্রহের বর্ত্ত-

মান সেবক দরিদ্র এবং দরিদ্র-স্থানে ইনি অধিষ্ঠিত। সুতরাং শ্রীমন্দির শোভাবিহীন, দেবতা বসন-ভূষণ-শূন্য এবং দেবালয় আড়ম্বর ও উৎসাহ বর্জ্জিত। কিন্তু এই আড়ম্বর-বিহীন দেবালয়, এই বসনভূষণ বিহীন দেববিগ্রহ, দরিদ্র গ্রামবাসিগণের অতীব গৌরবের স্থল, পরম আনন্দের আধার। সম্প্রতি নূতনপাড়াকে অনেকে গোপীনাথপল্লী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই পল্লীর এক প্রান্তভাগে হরিদাস নামে একজন অতি দরিদ্র তন্তুবায়ের বাস। হরিদাসের বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। হরিদাসের স্ত্রী, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক একটি পুত্র, দুইটি অবিবাহিতা কন্যা এবং একটি বিধবা ভগ্নী, এইগুলি লোক তাহার পোষ্য। হরিদাসের দুইখানি খড়ের ঘর—দুইখানিই জীর্ণ ও পতনোন্মুখ। তাহার সংসারে কষ্ট মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহাদের শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন, শিরা-প্রকটিত শীর্ণ কলেবর, রুক্ষ কেশ, সকলই তাহাদের নিরতিশয় দরিদ্র দশার পরিচয় দিতেছে। হরিদাস সমস্ত দিন কাপড় বুনিয়াও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্কুলান করিতে পারে না। সে নিরন্তর যেরূপ পরিশ্রম করে তাহা দেখিলেও দুঃখ হয়; কিন্তু তাদৃশ পরিশ্রমেও তাহার একবার অর্দ্ধাশন ব্যতীত পূর্ণাহার প্রায়ই ঘটে না।

ম্যাঞ্চেষ্টর! তোমার প্রতিযোগিতায় আজি ভারতের

বহুলোক অন্নহীন ও জীবন্মৃত হইয়াছে; ভারতের বস্ত্র-ব্যবসায় বিনষ্ট হইয়াছে এবং ভারতের তন্তুবায়গণ নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। ভারতের অশেষ শিল্পোন্নতির পরিচায়ক কার্পাসবস্ত্র আর বিক্রীত হয় না, তোমার স্থূল কাপড়েই দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাহারা ভারত উদ্ধারের পাণ্ডা, এ তুচ্ছ বিষয় তাঁহাদের চক্ষুতে লাগে না। সুতরাং এ দারুণ দুর্গতির প্রতিকারের কোন উপায় কেহই ভাবিতেছে না। এরূপ দুঃখ-দারিদ্র্য থাকিলেও, যাঁহারা বক্তৃতা করিতে জানেন, তাঁহাদের রসনা নিরুদ্ধ হইবার কোনই কারণ উপস্থিত নাই; সুতরাং কোলাহল যথেষ্ট চলিতেছে।

আর হরিদাসের স্ত্রী ও ভগ্নী—তাহারাই কি বসিয়া থাকে? তাহারাও যখন সাংসারিক কর্ম্ম হইতে অবসর পায় তখনই অনন্যমনে কাপড়ে ফুল তুলে। এই উপায়ে যে উপার্জ্জন হয়, পরিশ্রমের তুলনায় তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ইহাই তাহারা যথেষ্ট জ্ঞান করে। যাহা হউক, এই সকল উপায়ে যাহা উপার্জ্জন হয়, তাহাতে সংসার কোন মতেই চলে না। বালক-বালিকারা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পায়, হরিদাসেরও কতক হয়, কিন্তু তাহার স্ত্রী ও ভগ্নীর প্রায়ই নামমাত্র আহার হয়।

তথাপি হরিদাস বড়ই সাধু। এত দুঃখ-দারিদ্র্য সত্ত্বেও সে আপনার সততা ত্যাগ করে নাই। হরিদাস কখন

কাহার সহিত বিবাদ করে না; পাড়ায় নানা সময়ে নানা গোল উঠে, সে তাহার কিছুতেই মাথা দেয় না। তাহার দ্বারা কাহারও কোন উপকার সম্ভবে না, তথাপি সে পরোপকারের চেষ্টা করে; লোক শুনুক বা না শুনুক, সে সকলকেই সুপরামর্শ দেয়; কাহারও কোন বিপদ উপস্থিত হইলে হরিদাস আন্তরিক উৎকণ্ঠিত হয়, এবং মিথ্যাপ্রবঞ্চনার মধ্যে থাকে না। সুতরাং এ বাজারে হরিদাস পরম সাধু। কেহ কেহ বলিতে পারেন, হরিদাসের এমন কি গুণের কথা বলা হইল যে, তজ্জন্য তাহাকে প্রশংসা করা যাইতে পারে? এ সকল গুণ মনুষ্য মাত্রেরই থাকা উচিত, এবং ইহাতে আশ্চর্য্য বা মহত্ত্ব কিছুই নাই তো। কথা ঠিক। কিন্তু শুনিতে পাও না কি, অমুক বড়লোক বড় মাতৃভক্ত, সুতরাং বড়ই প্রশংসা-যোগ্য! কিন্তু অমুক মহাশয় পিতাকে প্রণাম করেন, সুতরাং বড়ই প্রশংসাযোগ্য! কিম্বা অমুক মহাত্মা বিপন্ন সহোদরকে দুই টাকা দিয়া সাহায্য করেন, সুতরাং বিশেষ প্রশংসাযোগ্য! যে কাল পড়িয়াছে, তাহাতে মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ প্রভৃতি অবশ্য পালনীয় ধর্ম্মও যখন প্রশংসার কথা হইয়া পড়িয়াছে, তখন ক্ষুদ্র হরিদাসের সাধুতার প্রশংসা না করিবে কেন? হরিদাস কখন সভ্য হয় নাই —হইবার আশাও নাই। তাহার ‘গুপ্তচরিত্র’ ও ‘সদর চরিত্র’ নাই। সুতরাং সভ্যতা-সম্মত মার্জ্জনীয় প্রতারণাও

সে জানে না। এমন লোককে নিতান্ত বর্ব্বর ভিন্ন আর কিছুই বলিতে তোমরা রাজি নহ।

শান্তিপুরে রামনগরে অদ্বৈত ঘোষ নামে এক মহাজনের বাস। সে জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু ব্যবহারে চণ্ডাল। টাকা আদানপ্রদানই অদ্বৈত ঘোষের ব্যবসায় এবং সে এ সম্বন্ধে করুণা-কণা বিবর্জ্জিত। নয়ন-জল বা বচন-জাল অদ্বৈত ঘোষ কিছুরই বাধ্য নহে। এই হীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থ-তৃষ্ণা কোন মতেই নিবারিত হইবার নহে। সে সমান তেজে, নিষ্করুণভাবে, তেজারতি কারবার চালাইতেছে। অদ্বৈতের বয়স প্রায় ষাটি, দেহ বড় স্থূললিত, ভুঁড়িটি সমুন্নত ও সুপরিণত, নাভিকুণ্ড চিরদিন অনাবৃত, নাকের উপর হইতে ললাট পর্য্যন্ত গোপীচন্দনের তিলক, দেহের নানাস্থানে রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত। কণ্ঠে তুলসী মালা তাহাতে হরিনামের ঝুলি, মুখে হরি হরি বোল ও মধুর হাস্য, হৃদয়ে শাণিত খুর। অদ্বৈত পরম বৈষ্ণব! ফলতঃ বৈষ্ণবের অনেক লক্ষণই তাহার আছে। তাহার ক্রোধ নাই। খাতক যদি তাহাকে অন্তরের সহিত যারপর নাই গালি দিয়া যায়, তথাপি সে রাগে না বা তাহার সুদের একটি পয়সা ছাড়ে না! ব্রাহ্মণ দেখিলেই অদ্বৈত অতীব ভক্তির সহিত প্রণাম করে; কাহারও কোন বিপদের কথা শুনিতে না শুনিতেই সে হায় হায়

করিয়া দেশ মাথায় করে; খোল-করতাল বাজাইয়া টপ্পা গান গাহিতে শুনিলেও সে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠে। অদ্বৈত নিঃসন্তান। তাহার তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী ঘরে। গৃহিণী মঞ্জরী দাসী সুন্দরী, এবং বয়সও চব্বিশ ছাড়ায় নাই। বল্লা বাহুল্য যে, এই মঞ্জরী দাসী বৈষ্ণব চূড়ামণি অদ্বৈত ঘোষের সাত রাজার ধন।

কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সে সময়ে দ্রব্যসামগ্রী এতই দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল যে, কোন মতেই একাহারও চলে না। সন্তানেরা অন্নাভাবে মারা যায় দেখিয়া হরিদাস অদ্বৈতের নিকট ১৫৲ পোনেরটি টাকা ধার করিয়াছিল। হরিদাসের ভিটাটুকু বন্ধক না রাখিয়া, অদ্বৈত টাকা দেন নাই। হরিদাসের আশা ছিল, বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়া কিছু পণ পাইবে এবং তাহাতেই এই ঋণ শোধ করিবে। মেয়ের বসয় তখন মোটে চারি বৎসর। তাহাদের ঘরে সে বয়সেও মেয়ের বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু হরিদাসের দুরদৃষ্টক্রমে মনের মত পাত্র জুটিয়া উঠিল না। হয় তো পাত্রের চাল-চুলা কিছুই নাই, নয় তো হরিদাসের অপেক্ষা পাত্র অনেক অধিক-বয়স্ক, নয় তো নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অসৎস্বভাব। ধর্ম্মভীত হরিদাস দেখিয়া শুনিয়া এরূপ অপাত্রে কন্যাদান করা মহাপাপ বলিয়া মনে করিল। কিন্তু মহাজনের টাকা সুদে আসলে বেশ ফাঁপিয়া উঠিতে থাকিল। অদ্বৈত সময় থাকিতে

টাকার জন্য একবারও তাগাদা করিল না, খত তামাদি হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে হরিদাসের নিকটে আসিয়া পঁয়ত্রিশ টাকার দাবী করিল। হরিদাস ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। পঁয়ত্রিশ টাকা? কি সর্ব্বনাশ! এত টাকা কেমন করিয়া শোধ করিবে? তখন সে অদ্বৈতের নিকট হাত জোড় করিয়া বলিল,—"এত দিন গিয়াছে, আর দুইটা মাস অপেক্ষা কর দাদা! আমি এই মাসে, মেয়ের বিবাহ দিয়া তোমার টাকা শোধ করিয়া দিতেছি। জানই তো দাদা, আমার আর কোন উপায় নাই।"

অদ্বৈত ঘোষ বলিলেন,—"কি করিব ভাই, আমার আর অপেক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। এত দিন তুমি চেষ্টাচরিত্র কর নাই কেন? হরি হে, তোমার ইচ্ছা!"

হরিদাস অনেক চেষ্টা করিয়াও যে যে কারণে কন্যার বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহা বিশেষ করিয়া বলিল। সমস্ত কথা শুনিয়া অদ্বৈত বলিল,—"তা দাদা, তুমি মেয়ের বিবাহ দিয়া উঠিতে পারিলে না, এটা কি আমার দোষ? এদিকে খত যে তামাদি হইয়া যায়। এখন তুমি টাকা না দিলে, কাজেই আমাকে নালিশ করিতে হয়।"

হরিদাস চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"নালিশ? না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, নালিশ করিও না। নালিশ করিলে তো খরচা লাগিবে?"

অদ্বৈত বলিল,—তা লাগিবে বৈ কি? পঁয়ত্রিশের জায়গায় তখন পঞ্চাশ হইয়া উঠিবে। তা কি করিব ভাই, খত তামাদি হইবার সময় না আসিলে, আমি তাগাদাই করিতাম না। এখন নালিশ না করিলে আমার যে সকলই পড়িয়া যায়, দাদা!”

হরিদাস আবার বলিল,—“আর দুইটা মাস সবুর কর —এত দিন সবুর করিয়াছ, আর দুইটা মাস আমাকে সময় দেও। আমি যেমন করিয়া হউক, টাকার জোগাড় করিয়া দিতেছি।”

অদ্বৈত বলিল;—“তা বেশ—তুমি টাকার যোগাড় কর না কেন? নালিশ করিলে যে টাকা লইয়া মিটমাট হয় না,এমন তো নয়; আর নালিশ করিলে যে সেই দিন টাকা না দিলে চলে না, এমনও নয়। তুমি টাকার যোগাড় কর। মোকদ্দমা চুকিতে কোন্ এক মাস সময় না যাইবে? তার জন্য এত ভয় কিসের?”

হরিদাস আর কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু তাহার প্রাণে বড় ভয় হইল। অদ্বৈত চলিয়া গেল। হরিদাসও পাড়ার আর দুই এক জন লোককে সকল কথা জানাইতে গেল। লোকেরা তাহাকে বড়ই ভয় দেখাইল, কিন্তু কেহই কোনরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল না। তখন সে জেঠা গোপীনাথ দেবের শ্রীমন্দির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, করজোড়ে সকল কথা জানাইল। ভগবান

তাহাকে কি বুঝাইলেন জানি না; সে কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বাটী গমন করিল।

সেই দিন হইতে সে কন্যার বিবাহের নিমিত্ত পাত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। কাজকর্ম্ম অনেকক্ষণ করিয়া বন্ধ থাকিতে লাগিল। আয় আরও কমিয়া গেল। আহারও প্রায় বন্ধ হইল।

তিন চারি দিনের মধ্যে অদ্বৈত পেয়াদা সঙ্গে লইয়া হরিদাসের বাড়ীতে আসিল, এবং তাহার হাতে সমন ধরাইয়া গেল। হরিদাস কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল,—"দাদা, আমি কিছুই জানি না, আদালত চিনি না, কাহার সহিত আমার আলাপ নাই, লেখা-পড়া বোধ নাই, কেন দাদা তুমি আমাকে সমন দিলে? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি সমন ফিরাইয়া লও। আমি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি। আর মাঝে একটি মাস, তাহার পরেই বিবাহ দিয়া তোমার টাকা শোধ করিয়া দিব। তুমি সমন ফিরাইয়া লও।"

সমন যে ফিরাইয়া লইবার নহে, তাহা হরিদাস জানে না। সে ভাবিল, ঐ কাগজটুকু তাহার হাতে থাকিলেই সর্ব্বনাশ হইবে, এবং হাত-ছাড়া হইয়া গেলেই সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। অদ্বৈত বলিলেন,—"তোমার এজন্য ভয় কি ভাই? নালিশ না করিলে নহে বলিয়াই করিয়াছি। তাহাতে ক্ষতি কি হইয়াছে? তোমার

আদালতে যাইবার কোন দরকার নাই; কাহার সহিত আলাপেরও প্রয়োজন নাই। তুমি আমার ধার সত্য কি না, বল; আর সে জন্য খত লিখিয়া দিয়াছ কি না, বল।"

হরিদাস বলিল,—"তা আর বলিতে? টাকা যে তোমার ধারি, তার কোনই ভুল নাই। বড় অসময়েই তুমি টাকা দিয়া আমার ছেলেপিলেকে বাঁচাইয়াছ—আমাদের সকলকে রক্ষা করিয়াছ। খত তো কাগজ বই নয়; জেঠা দেখিতেছেন, আমার প্রাণে তোমার টাকার কথা লেখা আছে কি না।"

অদ্বৈত বলিল,—"তবে আর তোমার আদালতে যাইবার দরকার কি? যদি মিথ্যা নালিশ হইত, তাহা হইলে আদালতে যাইয়া সাক্ষী দিয়া নালিশ যে মিথ্যা, তাহা যেরূপে হউক প্রমাণ করা উচিত ছিল। তাহা যখন নয়, তখন তোমার যাওয়া না যাওয়া একই কথা। আর নালিশ করা হইয়াছে বলিয়া তুমি এত ভয় পাইতেছ কেন? তোমার টাকার যোগাড় হইলে ফেলিয়া দিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে, সে জন্য ভাবনা কি? আমি সহজে তোমার উপর কোন দৌরাত্ম্য করিব না দাদা!"

হরিদাস এ কথা শুনিয়াও বড় আশ্বাস পাইল না। এদিকে তাহার ভগ্নী আসিয়া অদ্বৈতের পা জড়াইয়া ধরিয়া —"আমাদের রক্ষা কর, দোহাই তোমার দাদা"—বলিয়া,

কাতর স্বরে কাঁদিতে লাগিল। একটু দূরে দাঁড়াইয়া হরিদাসের স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিল। বালিকা দুইটী, অবশ্যই কোন সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে মনে করিয়া, অথবা বাপ-মা ও পিসির কষ্ট দেখিয়া, কাঁদিতে লাগিল।

অদ্বৈত দুই চারিটা অভয় দিয়া হরিদাসের ভগ্নীকে বুঝাইল, এবং সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া প্রস্থান করিল। হরিদাস সমনখানি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে, তাহাদের পরম বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অসহায়ের জেঠা গোপীনাথের নিকটস্থ হইল, এবং গলদশ্রু-নয়নে আপনার বিপদের বার্ত্তা জানাইল। শ্রীহরি অদ্য তাহাকে কি আশ্বাস দিলেন জানি না। সে কিন্তু কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া গৃহে ফিরিল এবং পরিবারবর্গকেও আশ্বস্ত করিল। অধিকতর যত্ন সহকারে সে কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতে লাগিল। কিন্তু এত যত্ন করিয়া কোন স্থানে সে পাকাপাকি সম্বন্ধ করিয়া উঠিতে পারিল না। সময় যখন মন্দ হয়, তখন এইরূপই ঘটে। হরিদাস কন্যার বিবাহের ভাবনায় ব্যস্ত থাকিল। অদ্বৈত দাদা বলিয়াছে, মোকদ্দমা করিতে যাওয়ার কোন দরকার নাই। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া হরিদাস মোকদ্দমায় গেল না। এদিকে অদ্বৈতের মোকদ্দমায় এক-তরফা মায় খরচা একান্ন টাকা আট আনার ডিক্রি হইয়া গেল।

-•-

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈত ডিক্রি হওয়ার পাঁচ সাত দিন পরে, হরিদাসের বাটীতে আসিল এবং ডিক্রির সংবাদ জানাইয়া টাকা চাহিল। হরিদাস ডিক্রি শুনিয়াই কাঁপিয়া উঠিল, বলিল,—"দাদা, তুমি তো বলিয়াছিলে, মোকদ্দমা হইতে এক মাস লাগিবে। তা এখনই এক মাস হইল কি?"

অদ্বৈত বলিল,—"তা প্রায় হইল বৈ কি? তা আইন আদালতের কথা—তোমার আমার কথায় কি যায় আইসে? সে কথা যাক্। এখন টাকার কি বল ভাই! টাকা তো আমি আর একদিনও ফেলিয়া রাখিতে পারিব না।"

হরিদাস সজল-নয়নে বলিল,—"আমি তো বলিয়াছি দাদা, অগ্রহায়ণ মাসে মেয়ের বিবাহ দিয়া টাকা দিব। তার আগে আমি কোথায় পাব দাদা?"

অদ্বৈত বলিল,—"তুমি কোথায় পাবে, তা আমি জানি না। তুমি কবে মেয়ের বিবাহ দিবে না দিবে, এত খোঁজে আমার কি দরকার ভাই? তুমি খুব ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেও, আমোদ আহ্লাদ কর, আমি কি তাতে বাদী? এখন আমার টাকা কয়টা দুই-চারি দিনের মধ্যে না ফেলিয়া দিলে নয়। কবে আসিব বল। টাকা

তো দুটি একটি নয় যে, আমার ফেলিয়া রাখিলে চলিবে।”

হরিদাস জিজ্ঞাসিল,—“সব শুদ্ধ কত টাকা হইয়াছে দাদা?”

“একান্ন টাকা আট আনা।”

হরিদাস চমকিয়া বলিল,—“আঁ—বল কি? একান্ন টাকা আট আনা!”

অদ্বৈত বলিল,—হাঁ। আদালতে হাকিম বিচার করিয়া ডিক্রি দিয়াছেন। বিশ্বাস না হয়, ডিক্রির নকল আনাইয়া দেখিও। এখন টাকার জন্য কবে আসিব বল?”

হরিদাস বলিল,—“আসিয়া কি করিবে? এক টাকাই হউক, আর একান্ন টাকাই হউক, মেয়ের বিয়ে না হইলে আমার কিছুই দিবার সামর্থ্য নাই। মেয়ের বিবাহের পূর্ব্বে আমি এক পয়সাও দিতে পারিব না।”

অদ্বৈত বলিল,—“আমি তখনই জানি, তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিবে। আবার খরচা বাড়িবে, তখন ভাল হইবে। আমি যে তোমার মেয়ের বিবাহের জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিব, তা তুমি মনেও করিও না। যদি টাকা দেওয়া মত হয়, তবে চারি পাঁচ দিনের মধ্যে আমার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিও। আমি আর আসিব না। কলিকাল—কেহই সহজ লোক নয়। হরিদাস

এমন করিয়া আমাকে কষ্ট দিবে, তাহা আমি একদিনও ভাবি নাই। হরি হে, সকলই তোমার ইচ্ছা!”

হরিদাস অদ্বৈতের পা ধরিয়া বলিল,—“দোহাই দাদা, আমার উপর রাগ করিও না। তুমি রাগ করিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি বড় গরিব—আমাকে এ আশ্রয়টুকু হইতে তাড়াইও না, তোমার পায়ে পড়ি দাদা।”

অদ্বৈত বলিল,—“লোকের টাকা লইবার সময় এক সুর, দিবার সময় আর এক সুর। তোমাকে তাড়ান না তাড়ানর মালিক আমি নহি। এখন-আইন আদালতের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তো ঘরাও কথা নাই! আইন-আদালতে যেরূপ করিবে, এখন তাই হইবে। আমাকে অকারণ দোষের ভাগী করিও না। হরি হরি!”

হরিদাসের ভগ্নী আসিয়া অদ্বৈতের চরণ-সমীপে অনেক কাঁদাকাটা করিল, এবং হরিদাসের স্ত্রীও তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া অনেক কাঁদিতে লাগিল। মেয়ে দুইটি অদ্বৈতকে বাঘ-ভালুকের মত ভয়ানক জন্তু মনে করিয়া, দূর হইতে তাহার মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরিদাসের ছেলেটি তখন বাড়ী ছিল না।

অদ্বৈত এত লোকের এত করুণ প্রার্থনায় একটুও বিচলিত হইল না। একটা আশ্বাসের কথা বলিল না। চারি পাঁচ দিনের মধ্যে টাকা না দিলে আইন-অনুসারে কার্য্য হইবে, ইহাই তাহার এক কথা। অদ্বৈত প্রস্থান

করিল। হরিদাস নিতান্ত কাতরভাবে আপনার অবস্থা বুঝাইতে বুঝাইতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর চলিল। কিন্তু সে পাষাণ একটুও কোমল হইল না। তাহাতে অঙ্কপাত করে কাহার সাধ্য?

হরিদাস তাহার সঙ্গত্যাগ করিয়া বাটী ফিরিল না। সে সেই বিপদভঞ্জন জেঠা গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে আসিল এবং কাতরকণ্ঠে সকল বার্ত্তা তাঁহাকে জানাইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কি আশ্বাস দিলেন জানি না; সে কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া বাটী ফিরিল, এবং বিহিতবিধানে কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কিছু দিন পরে, একদিন মধ্যাহ্ন কালে, অদ্বৈত, একটা পেয়াদা সঙ্গে করিয়া হরিদাসের বাটীর এক আম গাছে একখানা লম্বা কাগজ আঁটিয়া দিয়া গেল। কয়েকদিন পরে একজন ঢোলওয়ালা আসিয়া, অদ্বৈত ঘোষের পাওনার জন্য হরিদাসের ভদ্রাসন বাটী, অমুক তারিখে নিলাম হইবে, ইহাই ঘোষণা করিয়া গেল। সেদিন হরিদাসের স্ত্রী ও ভগ্নী ধূলায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই—এতদিন পরে তাহাদের আশ্রয়-স্থানটুকুও ঘুচিয়া যায়। হায়! স্ত্রী, ভগ্নী ও সন্তানদের লইয়া হরিদাস অতঃপর কোথায় দাঁড়াইবে? হরিদাস এ সংবাদ শুনিয়া কাহারও সহিত কোন পরামর্শ করিতে গেল না, কাহাকেও কোন কথা

বলিল না। যাঁহার চরণে সে সকল বিপদের কথা নিবেদন করে, আজিও সেই জেঠা গোপীনাথের নিকটস্থ হইয়া সকল কথা জানাইয়া আসিল।

বাটী নিলাম হইয়া গেল। অদ্বৈত তাহা চব্বিশ টাকায় ডাকিয়া লইল। ডিক্রিজারি, নিলাম ইত্যাদি বাবদে অদ্বৈতের সর্ব্বসমেত পাওনা হইয়াছিল বাষট্টি টাকা। হরিদাসের বাটী লইয়াও তাহার দেনা মিটিল না—এখনও বাইশ টাকা বাকী। অদ্বৈত আবার আসিয়া হরিদাসের সহিত দেখা করিল। তাহাকে বাটী ত্যাগ করিয়া সত্বর উঠিয়া যাইতে বলিল, এবং বাকী টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য তাগাদা করিল। হরিদাস পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় সপরিবারে বিস্তর কাঁদাকাটা করিল, কিন্তু অদ্বৈত তাহাতে একটুও বিচলিত হইল না। সে চলিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"আইন-আদালতের কাজ। আমি কি করিব বল। তুমি বুঝিলে না হরিদাস, কাজেই আমাকে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিতে হইবে।"

আরও এক মাস কাটিয়া গেল। হরিদাসের কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইল। অনেক খুঁজিয়া সে মনের মত পাত্র পাইল! আর এক মাস পরে বিবাহ হইবে—দিন স্থির হইয়া গেল। হরিদাসের অনেক ভরসা হইল। যদিও অদ্বৈত বাটী খরিদ করিয়াছে, তথাপি নগদ টাকা

পাইলে সে নিশ্চয়ই তাহা ছাড়িয়া দিবে এবং তখন তাহার নিকট হইতে আর একটা কোবালা লিখিয়া লইলেই চলিবে! বড় জোর সে না হয় কিছু ছাড়িয়া দিবে না! না দেয়, না দিবে; কিছু অধিক টাকা যাইবে বই তো আর কিছু নয়। তা কি করা যাইবে? কন্যার বিবাহ দিয়া যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার অধিকাংশই অদ্বৈতের পেটে যাইবে। মান তো থাকিবে, আশ্রয়-হীন তো হইতে হইবে না! হরিদাস নিশ্চিন্ত হইল, এবং জেঠা গোপীনাথকে হৃদয়ের ভাব জানাইয়া আসিল।

আর একটা বড় বিপদ উপস্থিত হইল। হরিদাসের পুত্র স্নান-আহার করিয়া হাটে গিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে সে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিল—বড় জ্বর। সে রাত্রিতে তাহার কোন তদ্বির হইল না। একজন প্রতিবাসী হাত দেখিতে জানে; তাহাকে পরদিন প্রাতে ডাকিয়া আনা হইল। সে হাত দেখিয়া বলিল,—"জ্বর খুব। এখন তো ভয়ের কারণ কিছু দেখা যাইতেছে না। কিন্তু জ্বরটা যেন পরে বাঁকা হইবে বোধ হয়। ডাক্তার দেখান উচিত।" সে দিনটাও গোলমালে কাটিয়া গেল। পরদিন সেই প্রতিবাসী হাত দেখিয়া বলিল,—"জ্বর খারাপই বোধ হয়।" সেই প্রতিবাসী উদ্যোগী হইয়া এক জন ইংরাজি-মতের চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যাঁহাকে ডাকিয়া আনিল,

তাঁহার রীতিমত পড়াশুনা নাই; কিন্তু তিনি দেখিয়া শুনিয়া একরকম শিখিয়াছেন মন্দ নয়। লোকটির শরীরে দয়াও যথেষ্ট। ডাক্তার রোগীর অবস্থা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"রোগ ভাল নহে।—বাতশ্লেষ্মিক বিকার একেই বলে। বিশেষ যত্ন হইলে ২১ দিনের পর সারিলেও সারিতে পারে।"

হরিদাস নিতান্ত কাতর হইয়া বলিল,—"তা বাবু আমি তো বড় গরিব। এখন উপায়? গোপীনাথ কি হইবে জেঠা?"

ডাক্তার বলিলেন,—"তুমি বড় গরিব, আমি তা জানি। বিশেষ, অদ্বৈত ঘোষ তোমার সহিত যে ব্যবহার করিতেছে, তাহাও আমি শুনিয়াছি। তা আমি প্রতিদিন যতবার আবশ্যক আসিয়া দেখিয়া যাইব, সে জন্য তোমার অবশ্য কোন খরচ হইবে না। ঔষধ অনেক লাগিবে, তার দামও অনেক হইবে। আমারও অবস্থা ভাল নয়, তা তোমরা সকলেই জান। তা যাহাই হউক, ঔষধের সিকি দামও তুমি কোন রকমে যোগাড় করিয়া দিতে পারিবে না কি দাদা?"

হরিদাসের অপেক্ষা ডাক্তারের বয়স অনেক কম। হরিদাস পরমানন্দে ডাক্তারের মাথায় হাত দিয়া বলিল, —"তোমার কল্যাণ হউক, ছেলে-পিলে নিয়ে তুমি লক্ষেশ্বর হও ভাই। আমার ছেলে যদি বাঁচে, তোমারই

দয়াতেই বাঁচিবে। সিকি দাম আমি যেমন করিয়া পারি অবশ্যই দিব।"

হরিদাস গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে গিয়া কাঁদিয়া আসিল। একজন প্রতিবাসী, ডাক্তারের সঙ্গে গিয়া ঔষধ আনিল। ঔষধ খাওয়ান হইতে লাগিল। দশ দিন কাটিয়া গেল। একাদশ দিনে পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হইল। ডাক্তারের যত্নের ত্রুটি নাই, ঔষধের বিরাম নাই, কিন্তু রোগ ভাল দিকে গেল না, বড়ই মন্দ হইয়া পড়িল। ডাক্তার দেখিয়া, পাঁচ জন প্রতিবাসীকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"হরিদাস দাদার ছেলের পীড়া বড়ই কঠিন হইয়াছে। এখনও ভরসাহীন হই নাই; যদি আর না বাড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসা চলিবে। কিন্তু আর বাড়িলে, চিকিৎসা করিয়া কোন ফল হইবে বোধ হয় না। যাহা হউক, যতক্ষণ ভরসা আছে, ততক্ষণ রীতিমত চিকিৎসা চালাইতে হইবে। এখনকার চিকিৎসার খরচ পড়িবে বিস্তর, তাহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আর এখন দিবারাত্রি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর পাশে বসিয়া তদ্বির করিবার লোক আবশ্যক। সে লোক একটু বুদ্ধিমান একটু লেখাপড়া জানা হইলেই তবে ঠিক হয়। ইহারও একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সকলে মিলিয়া ইহার একটা বিবেচনা কর।"

ডাক্তারের প্রস্তাব দুইটি—দুইয়েরই অপ্রতুল। গ্রামে

এমন কেহ নাই, যে এইরূপ সময়ে দুই টাকা দিয়া সাহায্য করে। এমনও কেহ নাই, যে দিবারাত্রি কাজ বন্ধ করিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে পারে। সকলকেই প্রতিদিন উপার্জ্জন করিয়া খাইতে ও খাওয়াইতে হয়। বসিয়া থাকিলে কাহার চলিবে? আর লেখাপড়া বা চতুরতা তাহাদের বড় নাই। সুতরাং রোগীর যত্ন করিবে কে? যাহাদের বাটীতে পীড়া, তাহারা এ কয়দিন নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হরিদাস দুই তিন দিন তাঁত বুনে নাই—তাহার স্ত্রী ও ভগ্নী কাপড়ে ফুল তুলে নাই। দুই দিন তাহারা এক মুঠা করিয়া কাঁচা চাউল খাইয়া জল খাইয়াছে মাত্র। আজি একজন প্রতিবাসী, মেয়ে দুইটিকে খাওয়াইবার জন্য আপনার বাড়ীতে লইয়া গেল।

হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমার একটা ঘড়া, দুইখান কাঁসার থালা, এক খান পিতলের থালা, একটা কাঁসার ঘটি, দুইটা পিতলের ঘটি আছে। ইহা বিক্রয় করিলে, পাঁচ ছয় টাকা হইতে পারে। জেঠার কৃপায় আমার ছেলে যদি বাঁচে, তখন ও দু'খান ফুটা তৈজসের জন্য আটকাইবে না। তোমরা আমার ছেলেকে একটু দেখ, আমি বাসন কয়খানা গুছাইয়া লইয়া হাটে বিক্রয় করিতে যাই।"

আপাততঃ এ পরামর্শ নিতান্ত মন্দ বলিয়া কেহ মনে

করিল না। হরিদাস তখনই বাসনগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং তৎসমস্ত ধামা পুরিয়া মাথায় করিল। ঠিক এই সময়ে এক অলৌকিক শোভাময়ী সুন্দরী সেই কুটীরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। সুন্দরী যুবতী। তাঁহার হাতে শাঁখা, সীমন্তে সুবিস্তৃত সিন্দুর-রেখা, পরিধান এক অতি চওড়া লালপেড়ে সাটি। বস্ত্রে তাঁহার দেহ সুন্দররূপে সমাবৃত। সুন্দরী হাস্যময়ী অথচ নতনয়না, কোমলতাময়ী অথচ প্রদীপ্তাননা, চারুশীলা অথচ জ্যোতির্ম্ময়ী, যুবতী অথচ ধীরা। তাঁহাকে দর্শন মাত্র ডাক্তার বলিলেন,—"এই যে মা লক্ষ্মী আসিয়াছেন!"

বালক-বৃদ্ধ-নর-নারী সকলেই 'মা মা' করিয়া উঠিল। সে স্থান—সেই নিদারুণ বিপদের লীলাক্ষেত্র, তখন যেন আনন্দের পুরী হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল যখন মা আসিয়াছেন, তখন আর কোন ভাবনা নাই।

ডাক্তার জিজ্ঞাসিলেন,—"অনেক দিন মা-লক্ষ্মীকে দেখি নাই কেন?"

মা বলিলেন,—"আমি ছিলাম না বাবা। ভাগ্যে আজি জেঠার কাছে আসিয়াছিলাম, তাই শুনিতে পাইলাম—গোপালের কঠিন পীড়া।"

কি মধুর স্বর! কি কোমলতা! তাহার পর হরিদাসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"এ কি হইতেছে বাবা? দেখি, তোমার ধামায় কি?"

যুবতীর আগমন-মাত্র হরিদাস বুঝিয়াছে যে, জেঠা কৃপা করিয়া এই বিপত্তিকালে মা-লক্ষ্মীকে আনিয়া দিয়াছেন। যখন মা আসিয়াছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে সকল ভরসাই আসিয়াছেন। সে ধামা নামাইয়া দিল।

মা বলিলেন,—"এগুলি বেচিতে যাইতেছিলে বুঝি? তা ভালই হইয়াছে, আমার এরূপ কয়েকটা জিনিসের দরকার আছে। এ বাসনগুলার বেশী দাম হইবে না বোধ হয়। হয়ও যদি, আমি তোমার মেয়ে—দশ টাকার বেশী দিব না। এই লও বাবা দশ টাকা, আমি তোমার বাসনগুলা কিনিয়া লইলাম।"

এই বলিয়া যুবতী, আপনার বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া হরিদাসের হাতে দিলেন, এবং আর কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া, বাসনের ধামা কাঁকে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আনন্দ ও ভরসা, উৎসাহ ও আশা সঙ্গে লইয়া, সুন্দরী সেই যে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত, আর একবার সে স্থান হইতে উঠিলেন না। নিরন্তর বিহিত-বিধানে রোগীর শুশ্রূষায় তিনি ব্যাপৃত রহিলেন। অথচ বাটীর লোকেরা যাহাতে সময়-মত খাইতে পায়, তাহাদের উদ্বেগ যাহাতে কমিয়া যায়, তাহার সকল উপায় তিনি বসিয়া বসিয়া করিতে থাকিলেন।

কর্ম্মক্ষেত্র।

চতুর্থ খণ্ড।

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"

অর্থ।—দুষ্কৃতিকারী মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ, আসুরিক স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে আরাধনা করে না।

তাৎপর্য্য।—মায়ার প্রভাবে যাহারা জ্ঞানহীন, সেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত নরাধমেরা ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া, অসুরের ন্যায়, ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে।

(শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। ৭ম অধ্যায়। ১৫ শ শ্লোক।
শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি।)

কর্ম্মক্ষেত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তরঙ্গিণী বাড়ী ঘর দখল করিয়াছে। তাহার দ্বারে দরওয়ান হইয়াছে, নূতন পাচিকা ও চাকরাণী হইয়াছে, সাবেক লোকদের সে তাড়াইয়া দিয়াছে, সে আছে ভাল। কালিদাস চক্রবর্ত্তীর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সে যে কোথায় গিয়াছে, কেমন আছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সেজন্য কিন্তু তরঙ্গিণীর বড় ভাবনা আছে। রাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারী নীলরতন, সেজন্য তাহাকে নিশ্চিন্ত হইতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিলেও তরঙ্গিণী সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। কালিদাস হয় তো কতই দুঃখ পাইতেছে বলিয়া তরঙ্গিণী ভাবে কি? কালিদাস কি বিপদে পড়িয়াছে মনে করিয়া তরঙ্গিণী ভাবে কি? কালিদাস হয় তো খাওয়া-পরার কষ্ট পাইতেছে মনে করিয়া তরঙ্গিণী ভাবে কি? রাধা-

কৃষ্ণ! এ সকল ভাবনা ভাবিবার জন্য তাহার দায় পড়িয়াছে। সে ভাবে, পাছে চক্রবর্ত্তীর মূর্ত্তি আবার দেখা দেয়, পাছে সে আবার আসিয়া গোল করে, পাছে সে উপস্থিত হইয়া বাড়ীঘর জিনিষপত্র দখল করে। সে মরিয়া গিয়াছে সংবাদ পাইলেই তরঙ্গিণী নিশ্চিন্ত হয়। কালিদাস মরিয়াছে কি না জানি না; কিন্তু লাঠি মারার পর দুই তিন মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি কালিদাস আর দেখা দেয় নাই, তাহার কোন সংবাদও নাই। সে সম্বন্ধে রাজা এবং নীলরতন তরঙ্গিণীকে অনেক অভয় দিয়াছেন; তথাপি তরঙ্গিণীর ভাল করিয়া ভয় ঘুচিতেছে না। এস্থানে বলা আবশ্যক যে, কালিদাসের আড়ত উঠিয়া গিয়াছে। দুই চারি জন পাওনাদার তরঙ্গিণীর বাড়ীতে আসিয়া গোল করিয়াছিল, কিন্তু দ্বারস্থিত পাঁড়েজি মহারাজ কেঁই মেই করিয়া তাহাদিগকে ভাগাইয়া দিয়াছেন। সেই অবধি সে সম্বন্ধে গোলমাল বন্ধ হইয়াছে।

তরঙ্গিণী আছে ভাল। সেই বাড়ী ঘর সবই আছে, জিনিষ পত্র কিছুই যায় নাই। গিয়াছে কালিদাস—কুৎসিৎ কালো দোকানদার, অরসিক কালিদাস। তাহার হাত হইতে সে অব্যাহতি পাইয়াছে—বাঁচিয়াছে। তাহার স্থানে এখন কে তাহার প্রণয়ার্থী জান? অরবিন্দ রায় —সুন্দর, সুপুরুষ যুবা, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজা অরবিন্দ

রায় এখন তাহার প্রণয়ের উমেদার। এখনও উমেদার কেন? তরঙ্গিণী তো তাঁহারই জন্য ব্যাকুল? তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য সে তো যথেষ্ট উৎসুক। তবে এখনও রাজার উমেদারি চলিতেছে কেন? কথাটা ভাল বুঝা যায় না। সুতরাং কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না।

রাজা অরবিন্দ রায় এপর্য্যন্ত একদিনও সশরীরে তরঙ্গিণীর ভবনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এখানে তাঁহার অনেক কাজ; অনেক মামলা মোকদ্দমা লইয়া নিয়ত তাঁহাকে অতিশয় বিব্রত থাকিতে হয়; এজন্য তরঙ্গিণীর শ্রীমন্দিরে আগমন করার সময় হয় না। কিন্তু তিনি যাহাই বলুন, কথাটা দেখিতে শুনিতে ভাল নয় তো। যাহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসেন তাহাকে দেখিতে আসিবার একবার সময় না পাওয়া বড় কেমন কেমন শুনায় না কি? রাজার আরও বিশেষ আপত্তি আছে। রাজার যেরূপ মান সম্ভ্রম, বিশেষতঃ শান্তিপুরে তাঁহার যেরূপ স্বধর্ম্ম পরায়ণতা ও নিষ্ঠার সুখ্যাতি তাহাতে এ স্থানে পরনারীর সহিত আমোদে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার অপযশের সীমা থাকিবে না। সুতরাং নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া অনিচ্ছায় তাঁহাকে তরঙ্গিণীর সহিত সাক্ষাতে বঞ্চিত হইয়া ক্লেশে দিন কাটাইতে হইতেছে।

এসকল যুক্তি সহসা সুসঙ্গত বলিয়া মনে না হইতে

পারে। কবে কোন্ ধনবান্ ব্যক্তি সমাজের ভয়ে বা বা লোকনিন্দার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাঞ্ছনীয় সুখভোগে ক্ষান্ত হইয়াছেন? কোথায় কোন্ বিলাসী পুরুষ একটু অখ্যাতির ভয়ে প্রেমিকা সুন্দরীর সঙ্গ-সুখ ত্যাগ করিয়াছে? সুতরাং রাজার এই সকল যুক্তি বড় সুসঙ্গত বলিয়া মনে না হইতে পারে। কিন্তু তোমার আমার কারণগুলি উপযুক্ত ও যথেষ্ট বলিয়া প্রতীত না হইলে কোন ক্ষতি নাই। স্বয়ং তরঙ্গিণী এজন্য অসন্তুষ্ট নহে। সে আত্মাবস্থায় পরিতৃপ্ত ও সুখী আছে। তবে আর কথা কহিবার প্রয়োজন কাহারও নাই।

রাজার সরকার নীলরতন চৌধুরী সতত তরঙ্গিণীর বাটীতে যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহার মুখে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তরঙ্গিণী বেশ বুঝিয়াছে, রাজা তাহার প্রেমে একান্ত উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অতি সত্বর রাজা এখানকার কাজকর্ম্ম ও কৃষ্ণনগরের মামলা মোকদ্দমা ফেলিয়া দেশে চলিয়া যাইবেন। তরঙ্গিণীকে তিনি সঙ্গে লইয়া যাইবেন। সেখানে তিনি স্বাধীন ও প্রকাশ্যভাবে এই সুন্দরীর সহিত আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইবেন। এ সকল কথা তরঙ্গিণীর বেশ হৃদ্গত হইয়াছে। বক্তার কৌশলে এ সম্বন্ধে তরঙ্গিণীর আর কোনই সন্দেহ নাই।

কথা ছাড়া কাজেও তরঙ্গিণী যথেষ্ট প্রমাণ দ্বারা

বুঝিয়াছে যে, রাজা তাহার রূপে গুণে বড়ই মজিয়াছেন। রাজা প্রায় প্রতিদিনই তরঙ্গিণীর নিকট নানাপ্রকার মূল্যবান্ উপহার পাঠাইতেছেন। জড়াও বালা, ইয়ারিং, বেনারসি রুমাল, ঢাকাই কাপড়, পার্সী সাড়ী, ইত্যাদি অনেক সামগ্রী তরঙ্গিণীর শ্রীচরণ-সরসিজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিবিধ অত্যুপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রায় প্রত্যহই রাজবাটী হইতে তরঙ্গিণীর নিকট প্রেরিত হয়। তদ্ব্যতীত এই কয়েক দিনের মধ্যে রাজা তাহার নিকট দুই শত টাকা পাঠাইয়াছেন। অপরিসীম ভাল-বাসার বন্ধন না ঘটিলে এরূপ উপহার কেহ কাহাকে দিয়া থাকে কি? তরঙ্গিণী বুঝিয়াছে, রাজা অরবিন্দ-রূপ প্রকাণ্ড কাতলা মাছ, তাহার রূপগুণের জালে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, আর ছাড়াইয়া পলাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তরঙ্গিণী বড় সুখে— পরমানন্দে আছে।

আজ তিন দিন হইল হারাধন তাহার ভবনে আসিয়াছিল। হারাধন মরে নাই, সে মরিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে। তরঙ্গিণীর দ্বারবান্ তাহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এরূপ ব্যবহারে হারাধন বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং গৃহস্বামিনী জানিতে পারিলে দরওয়ানকে নিশ্চয়ই তাড়াইয়া দিবেন বলিয়া সে ভয় দেখাইল। পাঁড়ে ঠাকুর ভয় পাইল না দেখিয়া, সে তাঁহাকে গৃহস্বামিনীর

নিকট সমস্ত কথা জানাইতে বলিল। পাঁড়ে ঠাকুর সমস্ত কথা জানাইয়া কর্ত্রীর হুকুম চাহিলেন। তরঙ্গিণী তাহাকে তাড়াইয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন।

দরওয়ানের নিকট অর্দ্ধচন্দ্র লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, হারাধন নিতান্ত বিমর্ষ হইল, এবং কেন এরূপ ঘটিল স্থির করিতে না পারিয়া, কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিল্। তাহার পর একবার উপরে দাঁড়াইয়া তাহার একটা কথা শুনিবার জন্য, তরঙ্গিণীকে অনেক কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। পাছে সে আসিলে, বা তাহার সহিত কথা কহিলে, রাজা শুনিতে পান ও রাগ করেন, এই ভয়ে তরঙ্গিণী উপর হইতে দাঁড়াইয়াও তাহার সহিত একটা কথা কহিল না। দ্বারবান্ কড়ায় গণ্ডায় কর্ত্রীর আজ্ঞা পালন করিল, সুতরাং হারাধনকে চলিয়া যাইতে হইল। হারাধন তখন বড় দুর্ব্বল, বড় কাতর; বিশেষতঃ অনাহারে নিতান্ত অবসন্ন। তরঙ্গিণী যে তাহার সহিত দেখা করিবে না, ইহা সে একবারও ভাবে নাই। সে কাতর ভাবে, দূরে দাঁড়াইয়া, উচ্চৈঃস্বরে অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, আপনার অবস্থার কথা বিশেষ করিয়া জানাইল, অবশেষে, দেখা হয় না হয়, তাহাকে দুইটা টাকা দিয়া সাহায্য করিতে বলিল। তরঙ্গিণী সকল কথা শুনিতে পাইল, কিন্তু তাহার কোন অনুরোধই রক্ষা করিল না। সে

দূরে দাঁড়াইয়া চিল্লাইতেছে দেখিয়া, দ্বারবান্ সেখান হইতেও ধাক্কা দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। বলা বাহুল্য হারাধন নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ ও যৎপরোনাস্তি মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন বেহায়া হারাধন আবার আসিল। দ্বারবান তাহাকে তাড়াইবার অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু সে নড়িল না, কেবল নিরন্তর মিনতি করিয়া কর্ত্রীর নিকট খবর দিতে অনুরোধ করিতে থাকিল। তাহার উপ-রোধ ছাড়াইতে না পারিয়া, দ্বারবান অগত্যা তরঙ্গিণীর নিকট সংবাদ দিল। তরঙ্গিণী অত্যন্ত রাগের সহিত বলিল,—"কে সে? আমি তাহাকে চিনি না। আমি কি যে সে লোকের সহিত কথা কহি? সে ছোট লোক। আমার সহিত কথা কহিতে তাহার স্পর্দ্ধা কেন? তুমি তাহাকে দূর করিয়া দেও।" দ্বারবান ফিরিয়া আসিয়া সকল কথাই হারাধনকে বলিল এবং তাহাকে সহমানে যাইতে উপদেশ দিল।

হারাধন সমস্ত কথা শুনিয়া মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইল। বলিল,—"আচ্ছা!" হারাধন চলিয়া গেল। তরঙ্গিণী রাজার নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিল। রাজা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আজি সন্ধ্যার পর চৌধুরী মহাশয় আসিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিবেন। তরঙ্গিণী মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বেশভূষার পরিপাট্য করিতে

লাগিয়াছে। বড় যত্নে, অনেক গুছি লাগাইয়া, সে মোহিনী কবরী বাঁধিয়াছে, গালে রং মাখিয়াছে, ঠোঁট লাল করিয়াছে, হাতে একটু আলতার ছোপ দিয়াছে, বড় ভাল জামা গায় দিয়াছে, রাজদত্ত পার্সী সাড়ী জড়াও বালা, ইয়ারিঙ্গ পরিয়াছে, তা ছাড়া আরও অনেক অলঙ্কার তাহার গায়ে উঠিয়াছে। মোটের উপর সে সাজিয়াছে ভাল এবং তাহাকে দেখাইতেছে মন্দ নয়।

এইরূপে সাজিয়া গুজিয়া তরঙ্গিণী অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময় নীলরতন সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন। চৌধুরী মহাশয় আগমন করিবামাত্র; তরঙ্গিণী উৎকণ্ঠার সহিত নিকটস্থ হইল এবং সাগ্রহে বলিল,—"এস এস, খবর কি? কয় দিন দেখা নাই যে?"

নীলরতন বলিলেন,—"খবর ভাল, খুবই ভাল, আবার তোমার জন্য বিশ ভরির তারা-প্যাটার্ণ হারের ফরমাইস হইয়াছে। তোমারই দিন পড়িয়াছে। যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা হইয়াছে কি না বল।"

তরঙ্গিণী একটু গর্ব্বের হাসি হাসিল। মনে মনে যাহা অনেক দিন বুঝিয়াছে, আজিও তাহাই বুঝিল। তাহার রূপ দেখিয়া কাহার সাধ্য না মজিয়া থাকে! কিন্তু সে কথা তো নীলরতনকে বলা ভাল নয়। বলিল,—"তুমি যখন আমার পক্ষে, তখন সকলই হইবার কথা। কিন্তু সে যাহা হউক, "রাজা যদি মোটেই আমার সহিত

দেখা সাক্ষাৎ না করেন তাহা হইলে তো আমি আর থাকিতে পারি না। তাঁহার সহিত একবার আমার দেখা হইলে খুব ঝগড়া হইবে।"

নীলরতন বলিলেন,—"তা তুমি খুব ঝগড়া করিতে পার। কিন্তু আমি জানি রাজা তোমার জন্য পাগল। তিনি আমার সঙ্গে তোমার কথা ছাড়া অন্য কথা কন না, তোমার কথা উঠিলে রাজকর্ম্ম সংসারধর্ম্ম সকলই ভুলিয়া যান; আর বিশেষ কথা বলি শুন—রাণীর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছে। রাণী সম্মুখে আসিলে, তিনি রাগিয়া উঠেন। রাণী কেবল কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছেন। আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাজা বলিয়াছেন, কি করিব? তরঙ্গিণী ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকের সহিত মুখের একটা কথা কহিতেও আমার আর প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই বলিতেছি, রাজা যতদূর গোলাম হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছেন।"

তরঙ্গিণী আবার হাসিল। যাহা পুনঃ পুনঃ সে ভাবিয়াছে, তাহাই আবার ভাবিল। তাহার এ রূপরাশি নয়নে পড়িলে, কাহার সাধ্য স্থির থাকে? সে তখন এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও ভীত ভাবে হারাধনের আগমনের কথা বলিতে আরম্ভ করিল। যেন সে এই ঘটনায় যার-পর নাই ভয় পাইয়াছে। সে চক্ষু

কুঞ্চিত করিয়া, মুখ ভার করিয়া এই ব্যাপারের বর্ণনা শেষ করিয়া বলিল,—"দেখ ভাই, রাজার কাছে মনে বা মুখেও অবিশ্বাসী হইতে আমার আর সাধ্য নাই। আমি যে কি ক্ষণেই রাজাকে দেখিয়াছি বলিতে পারি না। পাছে সে হতভাগার সহিত একটা কথা কহিলে, রাজা কিছু মনে করেন, এই ভয়ে আমি তাহার সহিত একটা কথাও কহি নাই, একবার দেখাও করি নাই। তা ভাই, এখন কি হইবে?"

নীলরতন বলিলেন,—"ইহার জন্য ভাবনার কারণ কি আছে? একটা রাজা যাহার মুঠার মধ্যে, একটা সামান্য তিলির ভয়ে তাহাকে কেন অবসন্ন হইতে হইবে? এজন্য তোমার কোন ভয় নাই। তিলি যাহাতে তোমার বাটীর ত্রিসীমায় না আসিতে পারে, তাহার উপায় আমি আজই করিয়া দিব। এখন একথা যাউক, তুমি আমার বিষয় কি করিলে বল। আমি তোমার জন্য দিনরাত্রি ভাবিতেছি, কিসে তোমার ভাল হয় তাহারই উপায় করিতেছি, তুমি আমার জন্য কি করিতেছ বল।"

তরঙ্গিণী জানে বাস্তবিকই নীলরতন তাহার পরম শুভানুধ্যায়ী। তাহার রূপ যথেষ্ট থাকিলেও সে জানে ও বুঝে এরূপ একটা লোক মধ্যে না থাকিলে, এ রাজার সহিত সদ্ভাব বজায় থাকিবে না, এবং লাভা-

লাভের সুবিধা হইবে না। নীলরতন যে রাজার প্রধান মন্ত্রী, তাহাও সে জানে। নীলরতনকে হাতে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। সে ভাবিয়া ভাবিয়া নীলরতনকে বাধ্য করিবার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় স্থির করিয়া লইল। নীলরতনের দিকে একটু সরিয়া আসিয়া, কটাক্ষ মিশ্রিত হাসি হাসিয়া সে বলিল,—"তোমাকে আর কি দিব ভাই? তোমাকে আমার অদেয় কি আছে? রাজার ভয়ে তুমি আমার সহিত মন খুলিয়া আমোদ কর না বলিয়া আমার বড় কষ্ট। কেন এত রাজার ভয়? রাজা কি এখানে বসিয়া আছেন? কিসের ভয়? খেলিতে জানিলে সব তাতেই খেলা যায়।"

নীলরতন মনে মনে অনেক হাসিলেন। কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে তরঙ্গিণীর উচ্ছ্বাস দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে হারাধনকে আসিতে দেয় নাই, তাহার সহিত একটা কথাও কহে নাই, এক বার দেখাও করে নাই,—কেন? পাছে রাজার কাছে অবিশ্বাসিনী হইতে হয়, এই ভয়ে। আর এখন সে নীলরতনকে গোপনে দেহ উৎসর্গ করিয়া দিতে চায়, গোপনে আমোদ চলে না বলিয়া দুঃখিত হয়—পাছে রাজা সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্তগত না থাকেন এই ভয়ে। সুতরাং তরঙ্গিণী বড়ই সাধ্বী। ঘৃণিত জীবেরা মরে না কেন?

নীলরতন মনে মনে অনেক হাসিয়া বলিলেন,—

"সে কথা তো পড়িয়াই আছে। আমি যে তোমারই তা কি তুমি জান না ভাই? তা যা হউক, তোমাকে আমি আপাততঃ একটা বড় ভয়ানক সংবাদ দিব বলিয়াই আসিয়াছি। রাজা এখনও এ খবর জানেন না। আমি কালিদাস চক্রবর্ত্তীকে দেখিতে পাইয়াছি।

কথা শেষ করিতে না দিয়াই, তরঙ্গিণী বলিল,—আঁা —বল কি? কি হইবে তবে?"

নীলরতন বলিলেন,—"শুন আগে—সব বলি আগে—তাহার পর পরামর্শ হইবে। আমার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, সে জোর করিয়া এখানে আসিবে এবং তোমাকে তাড়াইয়া দিয়া, তোমার ঘরবাড়ী জিনিষ পত্র দখল করিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"এখন উপায়? কোথায় তাহার সহিত তোমার দেখা হইল? সে কি বলিল? এখন উপায়?"

নীলরতন বলিলেন,—"তাহার সহিত অতি কুস্থানে আমার দেখা হইয়াছিল। গাঁজার আড্ডায় সে বসিয়াছিল। আমি পথ দিয়া যাইতেছিলাম দেখিয়াই, সে ছুটিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল,—'আপনিই না রাজার সরকার? আপনারা তরঙ্গিণীকে যে বাড়ীঘর দেওয়াইয়া দিয়াছেন তাহা আমার। আমার নাম কালিদাস চক্রবর্ত্তী। আমি সহজে তাহা ছাড়িব না। আমি

একটা মাথা একবার ফাটাইয়াছি, আর পাঁচটা হয় ফাটাইব। আমার জিনিষ আমি ছাড়িব কেন? আমারও অনেক লোক আছে জানিবেন। এই আড্ডায় যত লোক যায় আইসে, সকলেই আমার বাধ্য। আমার জন্য সকলে প্রাণ দিবে। আমি সে মাগীকে তাড়াইয়া দিয়া বাড়ীঘর দখল করিব।' তাহার যেরূপ চেহারা ও যেরূপ দলবল, তাহাতে কিছুই তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"এখন উপায়?"

নীলরতন বলিলেন,—"আমি তো ভাই তাড়াতাড়ি তোমাকে খবর দিতে আসিয়াছি। উপায় যে আমি স্থির করি নাই, এমন নহে। তোমার জিনিষ-পত্র যাহা আছে তাহার মধ্যে যাহা যাহা দামী, যাহা যাহা ভাল, সকলই কোন বিশ্বাসী স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। আর তোমার বাড়ীখানি কোন আপনার লোকের নামে বেনামী করিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর যদি কালিদাস আইসে, আমাদের বরকন্দাজেরা তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিবে। তাহার পর যদিই সে আইন আদালতে যায়, তাহা হইলেও তাহার সকল পথ বন্ধ করিয়া রাখা হইল। বাড়ী তখন তোমার নহে, জিনিষ-পত্র কিছুই নাই। সে লইবে কি? আমি তো ভাই ভাবিয়া চিন্তিয়া এই পরামর্শ স্থির করিয়াছি; এখন তুমি যাহা হয় বিবেচনা কর।"

তরঙ্গিণী কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিল। তাহার

পর বলিল,—"তুমি পরামর্শ করিয়াছ ভাল; কিন্তু তোমরা ছাড়া আমার এমন আপনার লোক আর কেহ নাই। তা রাজা কি এত ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করিতে চাহিবেন? তিনি যদি স্বীকার করেন, তবেই তো সকল দিক রক্ষা হয়। আর তো আমার কেহ নাই। তুমি ভাই, তাঁহার মত করাইয়া দিতে পারিবে না?"

নীলরতন বলিলেন,—"তোমার বিষয়ে তাঁহার মতামত করাইতে আমার ওকালতী লাগে না। এ প্রস্তাব রাজার নিকট করিলে তিনি হয় তো প্রথমেই ইহাতে অস্বীকৃত হইবেন। অনেক লোক অনেক সন্দেহ করিবে, হয় তো এজন্য আদালতে যাতায়াত করিতে হইবে, হয় তো তোমার সহিত প্রণয়ের কথা হাটে-বাজারে প্রচার হইবে, এই ভয়ে তিনি ইহাতে রাজি হইবেন না। কিন্তু তাঁহাকে সকল কাজেই রাজি করিবার কল তোমার মুখের কথা। তুমি তাঁহাকে হুকুম করিয়া না করাইতে পার কি? এ কাজটা পারিবে না?"

তরঙ্গিণী একটু গৌরবের হাসি হাসিল। নীলরতন বলিলেন,—"তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম। আমি এক্ষণে বিদায় হই। যাহাতে সকল দিক ভাল হয় তাহার উপায় করিও।"

অল্পকাল মধ্যে বিহিত বিধানে বিদায় লইয়া নীলরতন প্রস্থান করিলেন।

নীলরতন চৌধুরী সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিলে একটা নিতান্ত দরিদ্র বেশধারী ক্ষীণকলেবর লোক তাঁহার নিকটস্থ হইয়া প্রণাম করিল। আগন্তুককে চিনিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি ?"

আগন্তুক নিতান্ত কাতর স্বরে উত্তর দিল,—"আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না—আমার অদৃষ্ট মন্দ। আমি হারাধন নন্দী।"

চৌধুরী বলিলেন,—"বটে! হারাধন? তোমার এমন অবস্থা কেন?"

দ্বারের অপর পার্শ্ব হইতে তরঙ্গিণী সভয়ে বলিয়া উঠিল,—"ঐ সে হতভাগা আবার আসিয়াছে!"

হারাধন বলিল,—"চৌধুরী মহাশয়, যিনি এখন আমার গলার আওয়াজ শুনিয়া ভয়ে শিহরিতেছেন, এক সময়ে আমি তাঁহার প্রাণনাথ ছিলাম। একদিন আমাকে না দেখিলে তিনি চৌদ্দ ভুবন অন্ধকার দেখিতেন, আমি তাঁহার মরণ কাটী বাঁচন কাটী ছিলাম। তখন তিনি যাহার আশ্রয়ে ছিলেন, সে বামুন বড় বোকা, বড় বেকুব ছিল, কাজেই তাহার চখে ধুলা দেওয়া সহজ ছিল। কিন্তু তাঁহার কপাল ভাল। তিনি এখন আপনাদের আশ্রয় পাইয়াছেন। আমার ভগ্নীর হাত হইতে তিনি রাজাকে কাড়িয়া লইয়াছেন বলিলেই হয়। তা বেশ। তাঁহার ভাল হইয়াছে, তাহাতে আমি হিংসা করি না। কিন্তু

অবস্থা ফিরিলেই যে চিরকালের আত্মীয়দিগকে ভুলিয়া যাইতে হয়, এমন কোন শাস্ত্র নাই। আমরা তাঁহার চিরদিনের বন্ধু। তিনি এখন শক্ত লোকের হাতে পড়িয়াছেন। চখে ধূলা দিয়া তাঁর ঘরে যাওয়া আসা যার তার এখন সম্ভব নয়। ভালই কথা। কিন্তু তাই বলিয়া একবার দেখা করা যায় না কি? সাবেক বন্ধুবান্ধবের একটু উপকার করা যায় না, এমন কোন কথা নাই তো। আমার এখন সময় বড় মন্দ, তাঁহার এখন সময় খুব ভাল। ভাল! সেকালের কথা মনে করিয়া আমাকে একটু সাহায্য করিলে ক্ষতি কি?”

চৌধুরী বলিলেন,—“ক্ষতি কি? এ কাজ করাই তো উচিত। কেন তরঙ্গিণী, তুমি ইহার সাহায্য কর না। ইহারা তোমার অনুগত লোক। ইহাদের উপকার করায় তোমার ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম নাই।”

তরঙ্গিণী বলিল, —“ও মিথ্যাবাদী, উহার কথা শুনিও না। আমার সহিত উহার প্রণয় ছিল! হতভাগার আস্পর্দ্ধা দেখ। আমি উহাকে চিনিতাম বটে। তা চিনিলেই কি প্রণয় থাকিতে হয়? উহাকে আমার দরজা হইতে তাড়াইয়া দেও; ও যেন কখন এদিকে না আসিতে পারে।”

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—“শুন হারাধন, তরঙ্গিণীর সহিত অনর্থক ঝগড়া করিয়া কোন ফল হইবে না। আমি

তরঙ্গিণীর কথা ঠেলিয়া তোমার কথা বিশ্বাস করিব, ইহা তুমি কখন মনেও করিও না। তুমি এ সকল কথা বলিলে তরঙ্গিণী কখনই তোমাকে দয়া করিবে না। ভাল করিয়া বল, মিথ্যা কথা বলিয়া রাগাইও না; যাহাতে উহার দয়া হয় তাহার উপায় কর, অবশ্যই তোমার দুঃসময়ে উপকার করিবে। আমি এখন যাইতেছি। যদি শুনিতে পাই যে তুমি তরঙ্গিণীকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছ, তাহার সহিত ঝগড়া করিয়াছ, তাহা হইলে আমি রাজাকে বলিয়া এমন ব্যবস্থা করিব যে, তুমি আর এবাটীর ত্রিসীমানায় আসিতে পাইবে না, এবং যারপর নাই অপমানিত হইবে। যদি তরঙ্গিণী তোমাকে সাহায্য না করে, তুমি আমাদিগকে জানাইও।"

চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলেন। তরঙ্গিণীর নিকট মিষ্ট কথায় হারাধন সাহায্য প্রার্থনা করিল। তরঙ্গিণী তাহাকে নানাবিধ কুৎসিৎ তিরস্কার করিয়া, তাহার মুখে জুতা মারিবার নিমিত্ত দরওয়ানকে আদেশ করিল। দরওয়ান তৎক্ষণাৎ পায়ের নাগরা হাতে তুলিয়া হারাধনকে তাড়া করিল। সম্মুখ-যুদ্ধ নিষ্ফল জানিয়া, হারাধন তখন পলায়ন করাই আবশ্যক মনে করিল। যাইবার সময় সে আবার বলিয়া গেল,—"আচ্ছা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হারাধন মর্ম্মাহত হইয়া বাড়ী ফিরিল। পথে সে ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক ভাবিতে লাগিল। এখন তাহার প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স; এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে সে যে কখন কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, এরূপ তাহার মনে হইল না। তাহার জীবন নিষ্কলঙ্ক, পাপ-বিরহিত, পরম শুভ্র বলিয়াই সে বিবেচনা করিল। অতীত জীবনের যত কার্য্য অন্যায় বলিয়া তাহার একবারও মনে হইল, তৎক্ষণাৎ অন্য কোন ব্যক্তির স্কন্ধে তাহার দায়িত্ব আরোপ করিয়া, সে তত্তৎসম্বন্ধে আপনার চিত্ত ধৌত করিয়া লইল। সে আপনি আপনাকে সাধুতার নিকেতন বলিয়া স্থির করিল এবং মনুষ্যসমাজ নিতান্ত অত্যাচারী, অবিচারক ও পক্ষপাতী বলিয়া মীমাংসা করিল। জগৎ তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করে নাই, মানবেরা তাহার সহিত ভদ্রোচিত কার্য্য করে নাই, ইহাই তাহার ধারণা হইল। অতীত ঘটনার যতই সে আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সে জীবনের একদেশ মাত্র দেখিতে লাগিল, অতীত ঘটনাবলীর এক পার্শ্বমাত্র সে আলোচনা করিতে

থাকিল। জগতে অধিকাংশ মনুষ্যই এইরূপ বিচার করিয়া থাকে। একদিকই সকলে দেখে ভাল, দুই দিক বড় একটা কেহই দেখে না। দুই দিক দেখে না বলিয়াই, মানুষ আপনার গণ্ডা বুঝে ভাল, আপনার কথাই কহে বেশী এবং আপনার সকল বিষয়ই নির্দ্দোষ মনে করে। আইন বল, আদালত বল, তর্ক বল, ঝগড়া বল, সকলই এই একদেশদর্শিতার বিচারের জন্য।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হারাধন সংসারের উপর বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। সুরেন্দ্র বাবু পাপাত্মার একশেষ, সে তাহার ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কিন্তু সমুচিত মূল্য দেয় নাই কেন? কালিদাস চক্রবর্ত্তী অতি বড় পাষণ্ড, সে তরঙ্গিণীকে রাজীবপুরে যাইবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিল কেন? রাজা লোকটা যারপর নাই মন্দ, সে তাহার হাত হইতে তরঙ্গিণীকে কাড়িয়া লইল কেন? তরঙ্গিণী অতিশয় জঘন্য স্ত্রীলোক, সে তাহার প্রণয় ভুলিল কেন? গিরিবালা যতদূর সম্ভব বেকুব, সে রাজাকে হাত করিতে পারিল না কেন? এইরূপে হারাধন, সংসৃষ্ট তাবৎ লোককে দোষী করিতে করিতে আপনার আবাস-স্থানে ফিরিল।

রাত্রি অনেক; বড় অন্ধকার। একখানি সামান্য খড়ের ঘরের মধ্যে, রুগ্ন-শয্যায় শায়িতা এক স্ত্রীলোক যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি ব্যক্ত করিতেছে। ঘরের মেজে বড়

সোঁতা জল উঠিতেছে বলিলেই হয়। কোণে একটি মাটীর দীপাধারে মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটি প্রদীপ জলিতেছে। পীড়িতা একখানি চেটাইয়ের উপর খড়ের বালিস মাথায় দিয়া পড়িয়া আছে। তাহার পরিধানবস্ত্র নিতান্ত মলিন—ছিন্ন ভিন্ন এবং এত ক্ষুদ্র যে তাহা পরিধান করা একপ্রকার অনর্থক। ঘরে তৈজসপত্র কিছুই নাই, পীড়িতার শয্যাপার্শ্বে একটা মৃৎভাণ্ডে জল আছে, সে তাহা সময়ে সময়ে পান করিতেছে। স্ত্রীলোক গর্ভিণী।

এই নারী গিরিবালা। কিন্তু হায়! কোথায় তাহার সে রূপরাশি? কোথায় তাহার সে অহঙ্কার ও তেজ? গিরিবালার দেহ, অস্থি-চর্ম্মাবশেষে পরিণত, নিদারুণ ক্ষয়-রোগ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে, পথ্যাভাবে ও শুশ্রূষাভাবে পীড়া ক্ষিপ্রগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে, সে এখন মরণাপন্না হইয়াছে। ক্ষুধায় সে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, শীতে সে কাতর হইয়াছে, ভয়ে সে অবসন্ন হইয়াছে, মৃত্যুর বিভীষিকা সে চারিদিকে দর্শন করিতেছে, তাহার দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই।

তাহাদের কিছুই নাই। ঘটী বাটী থালা সকলই হারাধন বিক্রয় করিয়াছে। কাপড়-চোপড়ও সে বেচিয়াছে, কোন সম্বলই সে রাখে নাই। কোন কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা হারাধন করে নাই—এখনই কিসে অভাব মিটিয়া যায় তাহারই সকল ফিকির সে করিয়া বেড়াইয়াছে—অভাব মিটে নাই, আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তরঙ্গিণীর দ্বারে সে

ভিক্ষা করিতে গিয়াছে, মারি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অন্যত্র ভিক্ষা করিতে গিয়াছে, অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। রাজার নিকট সাহায্য পাইবার অভিপ্রায়ে সে যাতায়াত করিয়াছে, দেখা হয় নাই; দরওয়ান তাহাকে বাটীর নিকটেই যাইতে দেয় নাই। চুরি করা গহনাগুলা রাজার নিকট হইতে পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। চুরি করিতে সে চেষ্টা করিয়াছে, সুযোগ অভাবে দুই এক দিন হতাশ হইয়া ফিরিয়াছে—একদিন ধরা পড়িয়া যৎ-পরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়াছে। এ সকল নীচ চেষ্টা সে করিয়াছে। কিন্তু কাহারও বাড়ীতে চাকরি করিতে কি বাজারে মোট বহিতে, কি লোকের ফরমাইস খাটিতে সে কখন চেষ্টা করে নাই। হারাধন বাবু না বলিলে, চিরদিন সে রাগ করিয়াছে, আজি বাবুত্বের বিরোধী কাজ সে করিবে কেন? সুতরাং তাহার ঘরে অপ্রতুলতা মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে।

হারাধন অনেক আশা করিয়া গিরিবালাকে সঙ্গে আনিয়াছিল। গিরিবালা অসৎপথে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারিবে ইহা সে স্থির জানিত। গিরিবালা গর্ভ-বতী, গিরিবালা পীড়িতা, সুতরাং উপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, সে এখন হারাধনের গলগ্রহ।

অভাব যেখানে এত, বিবাদ সেখানে অবশ্যম্ভাবী।

কুলধ্বজ ভাই ও কুলপাবনী ভগ্নীর মধ্যে কলহ নিরন্তর বিরাজমান। ভাই বলেন, ভগ্নীকে লইয়াই যত জ্বালা, সে কোন কর্ম্মের নহে জানিলে তিনি কখনই তাহার বোঝা ঘাড়ে করিতেন না, সে তাঁহার গলগ্রহ। ভগ্নী বলেন, যাহা হউক তিনি ছিলেন ভাল, খাওয়া-পরা চলিতেছিল, ভাইয়ের কোন যোগ্যতা নাই, সিকি পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নাই, ভাইয়ের সঙ্গে আসিয়াই তাহার সর্ব্বনাশ হইল। দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি থাকিলে কষ্টের কঠোরতা থাকে না। এ অভাগাদের সে সৌভাগ্য ঘটে নাই।

গিরিবালা যখন যাতনায় 'আহা উহু' করিতেছে, সেই সময়ে ঘরের ঝাঁপ ঠেলিয়া হারাধন তথায় প্রবেশ করিল। পীড়িতা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল। সে কুকুর আসিয়াছে ভাবিয়া, বলিয়া উঠিল,—"ছেই—ছেই।"

হারাধন বলিল,—"এখনও তো মর নাই, এরই মধ্যে চখের মাথা খাইয়াছ? তুমি মরিলে কুকুর তোমাকে খাইতে আসিবে বটে। তেমন দিন কি হইবে?"

বড় মর্ম্মবিদারক, বড় নিষ্ঠুর, বড় অস্বাভাবিক কথা! গিরিবালা বলিল,—"কে ও—দাদা! আমি দেখিতে পাই নাই। দেখিতে পাইবই বা কিসে? একে এই রোগের জ্বালা, তাহাতে ক্ষুধায় মরিতেছি। কিছু খাবার আনিতে পারিয়াছ কি?"

হারাধন বলিল,—"খাবার লইয়া সব লোক বসিয়া রহিয়াছে। কেবল খাই খাই। আমাকেই না খাইয়া তোর ক্ষুধা মিটিবে না। তাই আমাকে খা না হয়?"

গিরিবালা বলিল,—"আমি তোমাকে খাই না খাই, তুমি সকল রকমেই আমাকে খাইলে। আমার জ্বালা তোমাকে আর বড় বেশী ভোগ করিতে হইবে না। বড় জোর একদিন, না হয় দু'দিন। কিন্তু ভগবান দেখিতেছেন, আমার এ কষ্ট—এ অপমৃত্যু সকলই তুমিই ঘটাইলে।"

হারাধন বড় রাগিয়া বলিল,—"আমি ঘটাইলাম কিসে?"

গিরিবালা বলিল,—"তুমি ঘটাইলে না? সুরেন্দ্রবাবুর কাছে আমি এক রকম দিন কাটাইতেছিলাম। সুখে হউক, দুঃখে হউক, আমার খাওয়া-পরা চলিতেছিল। তোমারই পরামর্শে আমি এক রাজার দৌলত চুরী করিয়া আনিলাম। সেগুলা হাতে থাকিলেও আমি চিরদিন নির্ভাবনায় কাটাইতাম। তোমার তরঙ্গিণীর পরামর্শে, তুমি সেগুলা কোথাকার এক রাজার হাতে দিলে।"

হারাধন বলিল,—"আমি দিলাম? আমি কেমন করিয়া দিলাম? তুই তো সেগুলা বাহির করিয়া রাজাকে দেখাইলি।"

গিরিবালা বলিল,—"আমি দেখাইলাম সত্য, কিন্তু তরঙ্গিণীর জেদে তুমি মত না করিলে, সেগুলা কথনই

রাজার হাতে পড়িত না। তাহার পর তুমি মদ খাইতে খাইতে মারি খাইয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়িলে। তোমার চিকিৎসায়, তোমার পথ্যাদির খরচে, হাতের বালা দু'গাছা, কাণের মাকড়ি ক'টা, কাপড় চোপড় যাহা ছিল, সকলই গেল। সেগুলা থাকিলেও আমার এই অসময়ে কত উপকার হইত।"

হারাধন বলিল,—"এত যদি জান, তবে আমার জন্য এত খরচ করিয়াছিলে কেন? আর খরচই বা কত করিয়াছ, যে চিরদিন তাহার খোঁটা দেও? দু' চারি শিসি ঔষধ—তার জন্যই তোমার সব গেল?"

গিরিবালা বলিল,—"দুই চারি শিসি ঔষধ, কি আর কত, তা তুমি না জানিতে পার, কিন্তু আর অনেকেই জানে। যাহাই হউক, তখন ভাবিয়াছিলাম, তুমি সারিয়া উঠিলেই সকল রক্ষা হইবে। তুমি সারিয়া উঠিলে, কিন্তু উপায় কিছুই করিতে পারিলে না। তরঙ্গিণীর কাছে সাহায্য পাইবে বলিয়া কয় দিন ঘুরিলে, সে তোমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল, একটা মুখের কথাও কহিল না। দুঃখ-কষ্ট ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রাজার নিকট হইতে আমার চুরি করা গহনাগুলা চাহিতে বার বার বলি, কিন্তু ভয়ে সেখানে তুমি যাইতেই পার না, চাহিবে কি? রাজা জানিয়াছেন—কি বুঝিয়াছেন, আমরা সেগুলা চুরি করিয়া আনিয়াছি। যদি চাহিতে গেলেই তিনি

ধরাইয়া দেন, ইহাই তোমার ভয়। কেন তিনি ধরাইয়া দিবেন? যেমন করিয়াই আনি, আমরা তাহা তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছি। তিনি তাহা কেন ফিরাইয়া দিবেন না? তুমি পুরুষমানুষ। তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়া আমাদের জিনিষগুলা চাহিয়া আনিতে তোমার সাহস হয় না। আবার বল, তুমি আমার কি ক্ষতি করিয়াছ? সর্ব্বনাশ যতদূর করিতে পারা যায়, তাহার সকলই তুমি করিয়াছ। আর আমার দিন নাই; কষ্টের শেষ হইয়া আসিয়াছে। এত সহিয়াছি তো আর দুই একদিনও সহিতে পারিব। এ শেষকালে আমি আর তোমার সহিত ঝগড়া করিব না। ঈশ্বর যদি থাকেন তিনিই ইহার বিচার করিবেন।"

হারাধন কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—"বেশ, বেশ। কাল্‌ প্রাতেই আমি রাজার কাছে গিয়া জিনিষ চাহিব। আমাদের এই দুঃসময়, কেন তিনি আমাদের গচ্ছিত জিনিষ দিবেন না?"

গিরিবালা কোন উত্তর দিল না। যন্ত্রণায় সে 'আহা উহু' করিতে লাগিল। এইরূপ অনাহারে ও কষ্টে সে রাত্রিও কাটিল। প্রাতে উঠিয়া বাস্তবিকই হারাধন রাজবাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল। যাইবার সময় সে গিরিবালাকে কোন কথাই বলিল না, তাহার কোন সংবাদও লইল না।

রাজবাটী পৌঁছিয়া, সাহসে ভর করিয়া সে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অতি কষ্টে সে খবর পাঠাইল। প্রথমতঃ নীলরতন চৌধুরী আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে রাজার সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিলে নীলরতন বলিলেন, তাহার প্রয়োজন কি জানিতে পারিলে তিনি রাজার সহিত তাহার দেখা করাইয়া দিবেন। তখন হারাধন তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার বর্ণনা করিয়া, গচ্ছিত জিনিষপত্র রাজার নিকট হইতে ফেরত চাহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। নীলরতন তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাজার সম্মুখে লইয়া গেলেন।

রাজা তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা-ঘটিত সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। কন্যা তরঙ্গিণী তাহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাও রাজা শুনিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া, রাজা বলিলেন,—"তুমি যাও, আমার লোক এখনই তোমার বাসায় যাইবে এবং তোমার আপাততঃ যে সকল সামগ্রীর দরকার তাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়া আসিবে; এজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তাহাতে যে ব্যয় হইবে, তাহা আমি করিব। তুমি এতদিন আমার কাছে আইস নাই কেন?"

হারাধন রাজার এইরূপ সদয় ভাব দেখিয়া বড় আশ্বাস পাইল। বলিল,—"আসিয়াছিলাম, দেখা করিয়া

উঠিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম, তরঙ্গিণী অবশ্যই কিছু সাহায্য করিবে, আপনাকে ত্যক্ত করিতে হইবে না। কিন্তু সে আমার সহিত যতদূর সম্ভব অভদ্র ব্যবহার করিয়াছে। এখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি।"

তাহার পর হারাধন ধীরে ধীরে জিনিষপত্রের কথা উত্থাপন করিল এবং সেগুলা ফেরত চাহিল। তাহার কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"তোমার জিনিষ যেমন তেমনই আছে। আমি তাহার একখানিও নষ্ট করি নাই, ব্যবহার করি নাই, কাহাকেও দিই নাই। কিন্তু হারাধন, আমিও জানি, তুমিও জান, সেগুলি তোমার নহে—পরের। পরের জিনিষ তুমি লইয়া যাইতে কেন ইচ্ছা করিতেছ? তোমার হাতে পড়িলেই তাহা নষ্ট হইবে। যাহার জিনিষ তাহাকে যদি কখন এগুলা ফিরাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে নষ্ট হওয়ার পর আর সে উপায় থাকিবে না। কেন তুমি পরের জিনিষ—চুরি করা সামগ্রী ফেরত লইয়া নষ্ট করিতে চাহিতেছ?"

হারাধন বলিল,—"চুরি করাই হউক, আর যাহাই হউক, আমার বড় অসময়। আমি সেগুলা আপনার নিকট রাখিয়াছি, আপনার নিকট ফেরত চাহিতেছি। সেগুলা দিতেই হইবে।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"শুন হারাধন, আমি

তোমাকে সেগুলা কোন মতেই ফেরত দিব না; আমি নিজেও তাহা ব্যবহার বা বিক্রয়, বা অপর কাহাকেও দান করিব না। যাহার জিনিষ তাহাকে যদি কখন দিবার দরকার হয় তবে দিব। তোমাকে কদাপি দিব না। তুমি যদি এ সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি কর, তাহা হইলে পুলিষ ডাকাইয়া এখনই তোমাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিব। তোমার উপস্থিত দুঃসময়ে যে কিছু সাহায্য আবশ্যক, তাহা তুমি এখনই পাইবে। সেজন্য কিছু চিন্তা নাই। তুমি বাটী যাও।”

হারাধন আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সে কিয়ৎকাল অধোমুখে অপেক্ষা করিয়া রাজাকে প্রণাম করিল, এবং নীরবে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফিরিয়া আসিবার সময় হতভাগা হারাধন আবার তরঙ্গিণীর ভবনদ্বারে আসিল। দেখিল, কতকগুলা মুটিয়ায় তরঙ্গিণীর বাটী হইতে বাক্স, তোরঙ্গ, সিন্দুক প্রভৃতি বিস্তর সামগ্রী বাহির করিতেছে। নীলরতন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত পরামর্শ অনুসারে, তরঙ্গিণী অস্থাবর দ্রব্য-সামগ্রী রাজবাটীতে পাঠাইতেছে। হারাধন এসকল কাণ্ডের কিছুই জানিত না; সুতরাং বিস্ময়াবিষ্ট হইল; ভাবিল, তরঙ্গিণী হয় তো এস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু কেন সহসা এরূপ স্থান-পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। তখন মুটিয়া ও অন্যান্য লোকের নিকট সন্ধান করিয়া সে বুঝিল, তরঙ্গিণী জিনিষপত্র রাজবাটীতে পাঠাইতেছে। কেন?—সে কি অতঃপর রাজবাটীতেই বাস করিবে? এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা হারাধন করিতে পারিল না। হতভাগা হারাধন চীৎকার করিয়া গিরি-বালার অবস্থা ও আপনাদের দৈন্যদশার কথা তরঙ্গিণীকে

জানাইল, এবং সকাতরে অন্ততঃ দুই চারি আনা পয়সা ভিক্ষা করিল! কোন সাহায্যই সে পাইল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অপেক্ষাও অধিকতর অপমানিত হইয়া অভাগাকে বাটী ফিরিতে হইল। আসিবার সময় সে আবার বলিয়া আসিল,—"আচ্ছা।"

গৃহে আসিয়া হারাধন দেখিল, বিপদ আরও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে—গিরিবালা অসময়ে অষ্টম মাসের শেষে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে এবং সে নিজে মরণাপন্ন হইয়াছে। হারাধন ভগ্নীর নিকটস্থ হইল এবং বারবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। গিরিবালা তখন সংজ্ঞাহীনা। মনে করিল, —"এই অবস্থায় ভগ্নী আমার পুত্র-রত্ন প্রসব করিয়া কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন দেখিতেছি, কিন্তু এজন্য আমি আর করিব কি? করিতে সামর্থই বা আমার কি আছে? যে অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বড় বেশী ভাবনা ভাবিতে হইবে, এমন বোধ হয় না। ভগবানই শীঘ্র সকল কাজ সুবিধা করিয়া দিবেন। এরূপে আর খানিক ক্ষণ থাকিলে, মা ও ছেলেকে অতিশয় পবিত্র দেখিয়া তিনি শীঘ্র আপনার কাছে ডাকিয়া লইবেন। কিন্তু কেন? গিরিবালা কি তরঙ্গিণীর চেয়ে বেশী পাপী? তরঙ্গিণীর সুখের উপর সুখ, আর আমার ভগ্নীর এই কষ্টে মরণ! ভগবানের রাজ্যে কি এমন অবিচার?"

হারাধন আবার ভগ্নীকে ডাকিল, নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল। গিরিবালা উত্তর দিল না। তখনও সে অজ্ঞান। হারাধন তাহার পর ভাগিনেয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, সেই সোঁতা মাটার উপর এক স্বরূপ শিশু পড়িয়া মুখে হাত চুষিতেছে। সে কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্টভাবে সেই সুকুমার শিশুকে দর্শন করিল। তাহার পর বলিল,—"ভগবান, আমার ভগ্নী যদি অপরাধী হয়, এ সোণার পুতুলী কোন্ পাপে পাপী? ইহাকে এত কষ্ট দিবার আয়োজন কেন করিলে, নারায়ণ?"

স্নেহহীন, হৃদয়হীন, বর্ব্বরের হৃদয়ের কোন্ কোণে হয় তো একটু কোমল প্রবৃত্তি চাপা পড়িয়াছিল। সেই প্রবৃত্তিটুকু এখন বড় সতেজ হইয়া উঠিল। যাহা হইবার নহে, তাহাও হইল—হারাধনের চক্ষুতে জল দেখা দিল।

এই সময়ে গিরিবালা সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"দাদা আসিয়াছ কি? কোথায় তুমি? আমার আর দেরী নাই, মরণ উপস্থিত। আর তোমার গলগ্রহ থাকিয়া আমি তোমাকে কষ্ট দিব না। কিন্তু দাদা, তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার এই সন্তানটিকে তুমি যত্ন করিও। পাপের ফল হইলেও, ও নিজে কোন পাপের পাপী নহে। উহাকে যদি বাঁচাইতে পার, তাহার চেষ্টা করিও। আমার যাহা অদৃষ্টে ছিল, হইল। তুমি উহাকে দয়া করিও।"

হারাধন বলিল,—"আমার যত কষ্ট হয়, হউক; তোমার ছেলে কোন কষ্ট পাইবে না। যেমন করিয়া হউক, উহাকে আমি বাঁচাইয়া রাখিব—উহাকে সুখে রাখিব। কিন্তু গিরিবালা, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে কেন? আমি আর কখন তোমার সহিত ঝগড়া করিব না।"

গিরিবালা বলিল,—"আমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা হইতে কেহ কখন বাঁচে না। তুমি আমার ছেলেটিকে দয়া করিবে জানিয়া, মরিতে আর দুঃখ নাই। আমি বড় পাপী। মাকে বলিও, আমার জন্য যেন না কাঁদেন। আমার পাপজীবন ফুরাইল। আমাকে ভগবান বড় দণ্ড দিবেন। তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।"

আর কথা গিরিবালা বলিল না। সে তখনই মুখ বড় বিকৃত করিল। তাহার শেষনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। অসময়ে অতি কষ্টে গিরিবালার মৃত্যু হইল।

হারাধন নীরবে দাঁড়াইয়া সহোদরার শেষ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল। তাহার পর তাহার শেষজীবনের যাবতীয় কষ্টের কথা একে একে স্মরণ করিল। তাহাকে সে স্বয়ং যত মন্দ কথা বলিয়াছে ও তাহার সহিত যত দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তৎসমস্ত আলোচনা করিল। তাহার পর বলিল,—"তরঙ্গিণী, তোমারই জন্য আমার এই সহোদরা এই নবীন বয়সে প্রাণ হারাইল! তোমারই

পরামর্শে তাহাকে গৃহাশ্রয় হইতে আনিয়াছি, তোমারই পরামর্শে তাহার চুরি করা জিনিষ রাজার নিকট গচ্ছিত করিয়াছি, তোমারই কুহকে পড়িয়া কালিদাসের লাঠি খাইয়াছি; শেষ জিনিষ-পত্র যাহা ছিল, তাহাও পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট করিয়াছি। তোমার নিকট অনাহারে কাতর হইয়া দুই চারি আনা পয়সা ভিক্ষা চাহিয়াছি, তুমি তাহাও দাও নাই; যাহাদের এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তাহাদের একটা খবরও লও নাই, ভিক্ষুকের মত দ্বারে উপস্থিত হইলেও, মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছ। জগদীশ্বর! এই মরা বহিন সম্মুখে, এই কষ্ট চারিদিকে, সংকার করিবার উপায় নাই, আর ঐ সোণার ছেলে মাটীতে পড়িয়া, নাড়ী পর্য্যন্ত কাটা হয় নাই। যে এ সকল কষ্টের মূল, তাহার সমুচিত শাস্তি দিতে পারিব না কি? পারিব, পারিব, পারিব।”

তাহার পর সে, নেত্র-নিঃসৃত দুই ফোটা জল সরাইয়া, ভাগিনেয়ের নিকটস্থ হইল এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

এই সময়ে দুইটি স্ত্রীলোক ও পাঁচ জন পুরুষ সেই কুটিরে প্রবেশ করিল। প্রথমাগতা রমণীর রূপরাশিতে সেই ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার পরিধান অতি শুভ্র চওড়া লালপেড়ে সাটী, হাতে শাঁখা, সীমন্তে সুস্থূল সিন্দুর রেখা, বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপ সমাচ্ছাদিত। এই

দেবীকে আমরা আর একবার দেখিয়াছি। হরিদাসের বাটীতে যে দেবী তাহার পীড়িত পুত্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই মা লক্ষ্মী। মা-লক্ষ্মীর সঙ্গিনী এক ধাত্রী। তাঁহার হস্তে এক প্রকাণ্ড পুঁটুলি।

হারাধন এই রূপরাশিসম্পন্না রমণীকে দেখিয়া অবাক্ হইল। জিজ্ঞাসিল,—"মা, আমাদের এই দারুণ বিপত্তি-কালে কে আসিলে তুমি? তুমি কি দেবতা?"

মা লক্ষ্মী মধুর স্বরে বলিলেন,—"তুমি যা, আমিও তাই বাবা।"

ধাত্রী বলিল,—"উনি মা লক্ষ্মী।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"বিপদআপদ সংসারের সকলেরই হয়, সে জন্য ভাবিতেছ কেন বাবা?"

এই বলিয়া সেই সুন্দরী হারাধনের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"দেও, আমার কোলে ছেলে দেও। তুমি পুরুষ, ছেলের যত্ন তুমি কি জান?"

হারাধনের কোল হইতে পুত্র লইয়া সেই দেবী তথায় উপবেশন করিলেন। ধাত্রী পুঁটুলির মধ্য হইতে যন্ত্রাদি বাহির করিয়া, তাহার নাড়ী কাটিয়া দিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিল এবং তৎকালে তাহার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, সমস্তই সে সম্পন্ন করিল।

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"হারাধন, তোমার ভাগনেকে

আমি লইয়া যাইব। আমি ইহাকে পরম যত্নে রাখিব, লালন-পালন করিব, তোমার যখন ইচ্ছা তুমি গিয়া দেখিয়া আসিবে।"

হারাধন বলিল,—"মা লক্ষ্মী, আপনার দয়ার সীমা নাই। আমি এই ছেলে লইয়া কি করিব ভাবিয়াই আকুল হইতেছিলাম। মা, আমার এ ভাগনে বাঁচিবে কি? এ যে বড় অসময়ে জন্মিয়াছে।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"অবশ্য বাঁচিবে। তুমি জেঠা গোপীনাথের নিকট প্রার্থনা করিও। তিনি অবশ্যই তোমার ভাগিনেয়কে বাঁচাইয়া রাখিবেন।"

হারাধন ভক্তিভাবে জেঠা গোপীনাথের উদ্দেশে ভাগিনের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। জীবনে এরূপ কার্য্য সে আর কখন করে নাই। তাহার হৃদয় বড় প্রশান্ত হইল, সে যেন নিশ্চিন্ত হইল, তাহার হাত-পা যেন খোলসা হইয়া গেল। মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"হারাধন, জন্মিলেই কোন না কোন দিন মরিতে হয়। তোমার ভগ্নীর মৃত্যু হইয়াছে। মরণান্তে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা এখন করিতে হইবে। আমার সঙ্গের এই লোকেরা শব গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতেছে। তুমি উহাদের সঙ্গে গিয়া যথা-নিয়মে সংকার করিয়া আইস।"

হারাধন বলিল,—"মা আমি বড় গরিব। তাহাতে

কিছু ব্যয় হইবে। কেমন করিয়া আমি খরচ করিব ?”

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—“সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। দাদা, হারাধনকে পাঁচটি টাকা দেও। তোমরা সকলে উদ্যোগী হইয়া মড়া চালান কর। বিলম্ব করিও না। ঐ টাকা লইয়া এখনকার কাজ শেষ করিয়া আইস। পরের ব্যবস্থা পরে হইবে।”

এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া হারাধনের হস্তে পাঁচটি টাকা দিল। এ লোকটা আমাদের চেনা নয় কি ? এ সেই যদু হালদার নয় কি ? হাঁ—এ সেই কৃষ্ণনগরের মূর্খ দোকানদার যদু হালদারই বটে। তখনই বাঁশের খাট আসিল। গিরিবালার শবদেহ তাহাতে স্থাপিত হইল এবং হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলে তাহা গঙ্গাতীরাভি-মুখে লইয়া চলিল। অধোমুখে হারাধন পশ্চাতে চলিল।

গঙ্গাতীরে চিতার অগ্নিতে গিরিবালার পাপ কায়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাহার সকল ভাবনা, সকল দুষ্প্রবৃত্তি, চিরদিনের মত শেষ হইয়া গেল। তাহার দেহ ভস্মাবশেষে পরিণত হইলে, হারাধন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—“যাহার জন্য, যাহার কুপরামর্শে, যাহার নিষ্ঠুরতায় আমার এই সহোদরা প্রাণ হারাইল, তাহাকে অবশ্যই ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।”

চিতা নির্ব্বাপিত হইল। শব-বাহকেরা চলিয়া গেল। যদু হালদার হারাধনের নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"নন্দী মহাশয়, এখন কোথায় যাইবেন? আপনার মা ঠাকুরাণী ও স্ত্রীপুত্র ভাল আছেন। আপনি তাঁহাদের কাছে যাইবেন কি?"

হারাধন বলিল,—"না, তাঁহাদিগকে এ মুখ আমি আর দেখাইব না। আমার ভাগিনেয় কোথায় থাকিবে? আমি কেবল সময়ে সময়ে তাহাকে দেখিতে চাহি। মা লক্ষ্মী কোথায় থাকেন?"

যদু বলিল,—"জেঠা গোপীনাথের বাটীতে সন্ধান করিলেই আপনি মা লক্ষ্মীর তত্ত্ব পাইবেন। যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই আপনি ভাগিনেয়কে দেখিয়া আসিবেন। এখন আপনার হাতে খরচ-পত্র আছে?"

হারাধন বলিল,—"আমার হাতে দেড় টাকা আছে। ইহাই যথেষ্ট। আমি ভিক্ষা করিয়া খাইব, কি মারা পড়িব, কি ফাটকে যাইব, কি ফাঁসিতে ঝুলিব, তাহার ঠিক নাই। সুতরাং খরচ-পত্র অনাবশ্যক। যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে মা লক্ষ্মীর চরণে অবশ্যই প্রণাম করিতে যাইব। আমি তাঁহার দাস। আপনারা আমার ভাগিনেয়ের প্রতি দয়া করিবেন। মা লক্ষ্মীর চরণে কোটী কোটী প্রণাম।"

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হারাধন চলিয়া গেল। যদু হালদার তাহার অবস্থা দেখিয়া একটু ভীত হইল।

কর্ম্মক্ষেত্র।

পঞ্চম খণ্ড।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

অর্থ।—সকল ভূতের যাহা রাত্রি, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তথায় জাগ্রৎ। যথায় ভূতসমূহ জাগিয়া থাকেন, মুনিগণ তথায় রাত্রি দেখেন।

তাৎপর্য্য।—অবিবেকী মানবগণ জ্ঞানোন্নতির অভাব-বশতঃ তত্ত্ব-বিষয়ক ব্যাপার-সমূহ নিশার ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে করে, এবং মায়া-ঘনাচ্ছন্ন বিষয়-ব্যাপার-সমূহ প্রকৃত মনে করিয়া তাহার উপভোগে ব্যাপৃত হয়। মুনি অর্থাৎ মায়া-বিহীন মানবগণ বিষয়-ব্যাপার রাত্রিবৎ জ্ঞান করিয়া তত্ত্বালোচনায় নিবিষ্টচিত্ত থাকেন।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ২৬ অধ্যায়। ৬৯ শ্লোক।
শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি।)

কর্ম্মক্ষেত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুরের শ্যামবাজারে অদ্বৈত ঘোষের বাড়ী। বাড়ীখানি সামান্য; দুইটী ইটের কুটরী এবং একখানি খড়ের ঘর মাত্র। বাড়ী প্রাচীর-ঘেরা।

বেলা ১১টার সময় অদ্বৈত গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিল। বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া সে সর্ব্বাঙ্গে জাঁকাইয়া তিলক সেবা করিল। গোপীচন্দনের অলকাতিলকায় সে দেহের যথাস্থান-সমূহ সযত্নে সমাচ্ছন্ন করিল। তাহার পর হরিনামের ঝোলার মধ্যে হাত দিয়া সে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কিন্তু বাস্তবিকই হরিনাম করিতে লাগিল, কি খাতকদিগের নিকট প্রাপ্য সুদের হিসাব করিতে থাকিল, তাহা, যাঁহার নামের সে মালা, তিনি ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না। অদ্বৈতের মালা-জপা যখন চলিতেছে, সেই সময়ে তাহার গৃহিণী, একটি

পাথরের বাটীতে কতকগুলি ভিজা ছোলা ও একটী সন্দেশ এবং এক ঘটী জল দিয়া গেল। অদ্বৈত ছোলা ও গুড় খাইয়া থাকে, সন্দেশ কোনও দিন খায় না। সুতরাং আজি এ অপব্যয় দেখিয়া গৃহিণীর উপর বড় চটিয়া উঠিল। বলিল,—"একি! সন্দেশ খাওয়াইয়া আমাকে ডুবাইতে বসিয়াছ নাকি? সন্দেশ কিনিয়া আনিলে, এ তোমার কোন্‌দেশী আক্কেল, গৃহিণী?"

গৃহিণী অনঙ্গমঞ্জরী বড় রাগত-স্বরে জবাব দিল,—"মর পোড়ারমুখো! তোমাকে ডুবাইয়া আমার বড় লাভ হইবে কি না? তুমি ঘাটের মরা, বাহাত্তরে বুড়ো, যমের অরুচি, এখনও সিকি পয়সা খরচ করিতে হইলে চক্ষু দিয়া প্রাণ বাহির হয়। আমার যেমন পোড়া কপাল, তাই ওকে দিয়েছি সন্দেশ খেতে! সন্দেশটা খেতে মুখে ঝাল লাগে, না হয় রেখে দেও। পয়সা কি তোমার সঙ্গে যাবে হতভাগা?"

এত তীব্র গালাগালির কোনই উত্তর অদ্বৈত দিল না,—একটুও রাগ করিল না বরং যতদূর সম্ভব যত্নে একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল,—"পাগলী, পয়সা আমার সঙ্গে যাউক না যাউক, যার জন্যে আমার দিনরাত্রি ভাবনা, তার কাজে লাগিবে; আমি বুড়া বলিয়াই তো তোমার জন্যে পয়সা বাঁচাইয়া রাখিতে আমার এত যত্ন। তোমার দিনকাল সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে, আমি তো আর চির-

দিনের পাট্টা লইয়া আসি নাই। পয়সা না থাকিলে, তাহার পর তোমার কি দশা হইবে?”

অনঙ্গ বলিল,—“আমার জন্য এত ভাবনায় কাজ নাই। মরার পর আমার সুখের ব্যবস্থা না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া আমার হাড়ে একটু বাতাস লাগিতে দেও দেখি। আমার যেমন পোড়া কপাল তাই এমন হতভাগা বুড়ার হাতে পড়িয়া প্রাণটা গেল!”

অদ্বৈত এ কথার কোন জবাব না দিয়া বলিল,—“সন্দেশ কিনিলে কেন? এমন করিয়া অপব্যয় করা কি ভাল? তুমি ছেলে মানুষ, পয়সার মায়া তোমার নাই, তোমার জন্য আমার বড় ভাবনা।”

অনঙ্গ বলিল—“ভয় নাই, সন্দেশ কিনিয়া আনি নাই। তুমি যেমন অনামুখো অযাত্রা, সংসারের কেহ যেমন তোমার মুখ দেখিতে চাহে না, আমার তো আর তেমন নয়; যে যেখানে আপনার লোক আছে, সকলেই তোমার পর, কেবল টাকা-পয়সাই তোমার আপন। কেহই তোমার খোঁজ-খবর লয় না, তোমাকে আপনার লোক বলিয়া মনেও করে না। আমার পাঁচদিকে পাঁচটা আপনার লোক আছে, আমার জন্য তারা ভাবিয়া থাকে। আমার সেজো খুড়া সন্দেশ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তোমার পয়সা দিয়া কেনা হয় নাই।”

এতক্ষণে অদ্বৈত একটু সুস্থ হইল। বলিল,—“বটে?

পাঠাইয়া দিয়াছেন ? কত সন্দেশ ? চারি পাঁচ সের হইতে পারে ? কৈ কোথায় আছে দেখি ! তা অত সন্দেশ আমা-দের ঘরে নাহাক রাখিয়া কি দরকার ? তোমার জন্য দুইটা রাখ। আমাকে যেটা দিয়াছ, সেটাও তোমার জন্য থাক্ ! বাকী সন্দেশ আমাকে দেও, আমি নবা ময়রার দোকানে দিয়া আসি।”

অনঙ্গ এ কথা শুনিয়া বড়ই রাগিয়া উঠিল। বলিল, —“পোড়া কপাল তোমার, মুখে আগুন তোমার। হত-ভাগা মিন্‌সে, আমার খুড়া পাঠাইয়াছেন সন্দেশ, তাই উনি বেচিয়া পয়সা করিবেন ! গলায় দড়ি জুটে না তোমার ! যম তোমায় ভুলিয়াছে নাকি ?”

অদ্বৈত বলিল,—“রাগ কর কেন ? রাগের কথা কি ইল্ল ? মন্দ কথাটা কি বলিয়াছি ? পচাইয়া পাঁচদিন কতকগুলা সন্দেশ খাইয়া অসুখ করার চেয়ে, বেচিয়া পয়সা করা কি মন্দ পরামর্শ ? কোথায় সন্দেশ, দেখাও আমাকে ! যদি পাঁচ সের হয়, তা হলে অভাবে একটা টাকার কাজ হবে এখন। চল, সন্দেশ দেখি, চল —চল। তুমি ছেলে মানুষ না বুঝিয়া রাগ কর। এ বুড়া পাকা কথা ছাড়া কয় না।”

অনঙ্গ বলিল,—“দাঁড়াও হতভাগা, সন্দেশ দেখাই তোমাকে। মুড়া ঝাঁটাগাছটা কোথায় গেল ? থ্যাংরা দিয়া তোমার মুখ না ছিঁড়িয়া দিই তো আমার নাম মিথ্যা !”

অনঙ্গ চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে ঝাঁটা-হস্তে রণ-রঙ্গিণী বেশে তথায় আগমন করিল। তাহাকে দর্শনমাত্র অদ্বৈত বলিল,—"সত্য সত্যই ঝাঁটা লইয়া আসিলে যে। আমি বলি তুমি সন্দেশ আনিতে গেলে। তা যা হউক, এখন তামাসা রাখ। ঝাঁটা ফেলিয়া দিয়া সন্দেশ আন; আমি নবা ময়রার দোকান হইতে ঘুরিয়া আসি। আমাকে এখনই রাণাঘাট যাইতে হইবে।"

তখন অনঙ্গ বলিল,—"ঝাঁটা ফেলিয়া দিব"—কেমন? এই যে দিই—তোমাকে আগে একটু সাজাইয়া দিই!

এই বলিয়া, সে রণ-রঙ্গিণীর ন্যায় ক্রোধে অদ্বৈতের নিকটস্থ হইল, এবং তাহার শ্রীমুখচন্দ্রে উপর্য্যুপরি ঝাঁটা প্রহার করিয়া বলিল,—"হতভাগা! রাণাঘাট যাইবেন! একেবারে গঙ্গার ঘাটে যা না কেন? আমার হাড়টা জুড়াক।"

অদ্বৈত মুখে হাত বুলাইতে লাগিল। বুঝিল, দুই এক স্থান ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতেছে। বলিল,—"যা হইবার, হইয়াছে; ঠিক দুপুর বেলা আর ঘরে ঘরে ঝগড়া করিবার দরকার নাই। তা—তা—সন্দেশগুলা তবে কি হবে?"

অনঙ্গ বলিল—"ওরে সর্ব্বনেশে! এখনও সন্দেশগুলা কি হইবে জিজ্ঞাসা করছিস্? ঝাড়ানটা ভালরকম হয় নাই?' নাথির কাঁটাল, কিলে কি পাকে?" এই বলিয়া,

সেই সম্মার্জ্জনীধৃতকারিণী পতিপ্রেমমুগ্ধা অনঙ্গমঞ্জরী, শ্রীমান্ অদ্বৈত ঘোষকে তাড়া করিল। দাঁড়াইয়া মারি খাওয়া অবৈধ বোধে, এবার অদ্বৈত পলায়ন করিবে স্থির করিল। তথাপি তাহার প্রণয়িণী আসিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে দুই চারি ঘা ঝাঁটা মারিতে ছাড়িলেন না। অদ্বৈত ছুটিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু তাহার পিঠে ঝাঁটার দাগ বেশ ফুলিয়া উঠিল। সুতরাং এই সমর-প্রত্যাগত বীরের, মধুসূদন বর্ণিত দূতের ন্যায়, 'পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা' এ—গর্ব্বোক্তি করিবার উপায় থাকিল না।

অদ্বৈত পলায়ন করিলে, অনঙ্গ বাটীর দরজা বন্ধ করিয়া আসিল। তাহার পর ঝাঁটা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাগ ও শ্রমে সেই সুন্দরীকে এখন বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। বাস্তবিক অনঙ্গমঞ্জরী পরমা সুন্দরী। তাহার অঙ্গের গঠন, দেহের বর্ণ, কেশের বাহুল্য, লোচনের বিস্তার, সকলই তাহার সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। মঞ্জরী এখন মাতৃপিতৃহীনা। তাহার পিতা, ধনলোভে এই কৃপণ বৃদ্ধের হস্তে কন্যারত্ন সমর্পণ করিয়াছিল। অদ্বৈত তৃতীয়-পক্ষে এই সুন্দরীকে পত্নীস্বরূপে লাভ করিয়াছেন। অদ্বৈতের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, আর মঞ্জরী দ্বাবিংশবর্ষীয়া। অসামঞ্জস্য অতিশয়। মঞ্জরীর স্বভাব চিরদিনই এমন ছিল না। সে এগারো বৎসর বয়সে অদ্বৈতের হাতে পড়িয়াছে। পাঁচ বৎসর সে অদ্বৈতের

মতানুবর্ত্তিনী হইয়াই চলিয়াছিল, এবং যাবজ্জীবন চলিবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু অদ্বৈতের দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করা ক্রমে তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে সুন্দরী, যুবতী। অদ্বৈত তাহাকে পেট ভরিয়া ভাত খাইতে দেখিলে নারাজ হয়। তাহাকে নিতান্ত জঘন্য কাপড় ছাড়া পরিতে দেয় না। ভাল করিয়া মাথায় তেল মাখিতে দেয় না। একটু ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিলে মারিতে আইসে। এই সকল কারণে স্বামী ও স্ত্রীতে বিবাদ আরম্ভ হয়। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তাহার পর মারা-মারিতে আসিয়া দাঁড়ায়। মারামারি আরম্ভ হইলে, অদ্বৈত হারি মানিত। একে বৃদ্ধ, তাহাতে মোটা মানুষ, সে এই যুবতীকে আঁটিতে পারিত না। বিশেষতঃ তাহার একজন বন্ধু বলিয়া দিয়াছিল,—"অদ্বৈত, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর গায়ে খবরদার হাত তুলিও না। তোমার স্ত্রীর উপর পাড়ার অনেক লোকেরই নজর পড়িয়াছে। অনেকে তোমার ন্যায় বানরের গলা হইতে এ মুক্তারমালা লুফিয়া লইবার চেষ্টায় আছে। যদি তোমার স্ত্রী একবার বাটীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে, অত্যাচার করা দূরে থাকুক, অনেক বাবু তাহাকে বুকে তুলিয়া রাখিবার জন্য উমেদার আছে, জানিবে। সাবধান!" বন্ধু-প্রদত্ত এই উপদেশ-বাক্য অদ্বৈতের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। সে তাহার পর হইতে মারামারি বাধিলে

দাঁড়াইয়া সাত চোরের মারি খাইয়া আসিতেছে, তথাপি সুন্দরীর গায়ে একটি টোকা মারিবার চেষ্টাও করিতেছে না। তাহার পর হইতে সে খাওয়া পরারও কতকটা সুব্যবস্থা করিয়াছে এবং যৎকিঞ্চিৎ পয়সা-কড়িও স্ত্রীর হাতে দিতেছে। অদ্বৈত স্ত্রীকে বাধ্য রাখিবার জন্য এত করিয়াছে, কিন্তু তাহার স্ত্রী যে হাত ছুটাইয়াছে, তাহা আর ফিরায় নাই—কথান্তর হইবামাত্র, একটু মতবিরোধ ঘটিবা-মাত্র, ঝাঁটা আনিয়া অদ্বৈতকে উত্তম মধ্যম দিতে ছাড়ে না। অদ্বৈতের বিজাতীয় হৃদয়হীনতা-হেতু মঞ্জরীর ভক্তিশ্রদ্ধা এককালেই তিরোহিত হইয়াছে। সে তাহাকে কটুকাটব্য ও সম্মার্জ্জনী পুরস্কার সততই প্রদান করে।

মারি খাইয়া অদ্বৈত ঘোষ পলায়ন করিল বটে ; কিন্তু অবিলম্বে আবার ফিরিয়া আসিয়া দরজায় ঘা দিতে লাগিল। বারংবার আঘাত করার পর অনঙ্গমঞ্জরী দ্বারের নিকট গমন করিল, এবং ফাঁক দিয়া অদ্বৈতকে দেখিতে পাইয়া, বলিল,—"আবার আসিয়াছ পোড়ার-মুখো ? এবার বাড়ীতে ঢুক্‌লে, তোমার গায়ের মাংস টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তবে ছাড়িব।"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি রাণাঘাট যাইতেছি। যদি দুটা ভাত দিতে, তাহা হইলে খাইয়া যাইতাম। তাই বলিতেছি একবার দরজা খুলিয়া দুটা ভাত দেও না কেন ?"

মঞ্জরী বলিল—“তোমাকে ভাত দিবে, না উনানের ছাই দিবে। কেনা দাসী পাইয়াছ কি না, তোমার জন্য ভাত তৈয়ার করিয়া বসিয়া আছি।”

অদ্বৈত বলিল,—“তাই তো, ভাত তবে হয় নাই? তাইতো! সারা-দিনটা শুধু কাটিয়া যাইবে? হয় তো ফিরিতে অনেক রাত্রি হইবে।”

মঞ্জরী বলিল,—“জন্মের মত যাওনা কেন? না ফিরিলেই তো ভাল হয়।”

অদ্বৈত বলিল,—“তাই বলিতেছিলাম, সারাদিনটা উপবাসে কাটাইতে হইবে। তবে আর উপায় কি? তা, তবে আমি আসি। হরি হে! তোমারই ইচ্ছা। বলি,আমার চাদরখানা চাই। একবার দরজটা খোল না কেন?”

মঞ্জরী বলিল,—“চাদর আমি দিতেছি। দরজা আমি কখনই খুলিব না।”

মঞ্জরী চাদর আনিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া ফেলিয়া দিল। অদ্বৈত বলিল,—“তবে বুঝলে তুমি? আমি রাণা-ঘাট চলিলাম। সাবধানে থাকিও। আমি হয় তো অনেক রাত্রে ফিরিব।”

তাহার গুণবতী গৃহিণী বলিল,—“চুলোয় যাও না কেন, আমাকে তাহা বলিবার দরকার কি? কখন ফিরিবে, সেই ভাবনায় আমি প্রায় অস্থির। ঠাকুর করেন যেন আর না ফের।”

মঞ্জরী, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, গৃহপ্রবিষ্টা হইল। অদ্বৈত, কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, রাণাঘাট অভিমুখে প্রস্থান করিল।

অদ্বৈত চলিয়া যাওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে, তাহার দরজায় আঘাত-শব্দ হইল! মঞ্জরী তখন ঘরের মধ্যে শুইয়াছিল। শব্দ শুনিবা মাত্র, সে বেগে বাহিরে আসিল, এবং দ্বারসন্নিহিত হইয়া পূর্ব্ববৎ রন্ধ্র দিয়া দর্শন করিল। তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া দিল।

তখন 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া, এক দণ্ডকমণ্ডলুধারী কেশশ্মশ্রু-গুল্ফ-বিহীন এক যোগী তথায় প্রবেশ করিলেন। মঞ্জরী তাঁহাকে দর্শন-মাত্র বড়ই আনন্দিতা হইল, এবং সাদরে তাঁহাকে আনিয়া গৃহ মধ্যে আসনে বসাইল।

যোগিবেশধর পুরুষ আসন পরিগ্রহ করিয়া, মঞ্জরীর কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মঞ্জরী তাঁহাকে অদ্যকার সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিল,—"প্রভো, আমার উপায় কি হইবে? নীচ-সংসর্গে ও ইতর-সহবাসে আমি নিতান্ত মন্দলোক হইয়া পড়িয়াছি। আমি বুঝিতেছি যে, তাহার অপেক্ষা আমারই অপরাধ অধিক। কিন্তু কি করিব ঠাকুর, তাহার কথা আর আমি মোটেই সহিতে পারি না, তাহার ভাল কথাও যেন আমার গায়ে আগুন ছিটাইয়া দেয়। তাহাকে অযথা মারিয়াও আমার

সন্তোষ হয় না। তাহাকে অনর্থক গালি দিয়াও আমার মনে হয়, গালাগালি ও তিরস্কার কম হইল। তাহাকে দেখিলে আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া যায়। সে যে সামান্য সুদের জন্য গরিবের জল খাইবার ভাঙ্গা ঘটিটী পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া আইসে, সে যে এক পয়সার জন্য অনায়াসে মিথ্যার উপর মিথ্যা বলে, সে যে মানুষের সময়-অসময় বিপদ-আপদ কিছুই না বুঝিয়া তাহার সর্ব্ব-নাশ করিতে ছাড়ে না, সে যে পয়সা খরচ হইবে বলিয়া পেটে খায় না, পায়ে জুতা দেয় না, মাথায় ছাতা দেয় না, শীতে গায়ে কাপড় দেয় না, এই সকল বিষয় যখন আমার মনে হয়, তখন তাহাকে বাঘ ভালুকের চেয়েও অধম বলিয়া আমার জ্ঞান হয়। তাহার সংসর্গে আমার স্বভাব নিতান্ত মন্দ হইয়া গিয়াছে। আমার কি উপায় হইবে, ঠাকুর? তাহাকে স্বামী ভাবা দূরে থাকুক, তাহার সহিত আলাপ আছে মনে হইলেও, আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা হয়। আমি কি করিব, ঠাকুর?"

যোগী বলিলেন,—"মঞ্জরী, তোমাকে বলিয়াছিলাম, সমুচিত সময় উপস্থিত হইলে, তোমাকে বিহিত উপদেশ দিব। সময় উপস্থিত হইয়াছে। আজি তোমাকে কর্ত্তব্য-পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের পুত্র গোপালের পীড়া সমান ভাবেই চলিতেছে। মা-লক্ষ্মী সমান যত্নে রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন। দুই এক দিন তিনি চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু আবার যথা-সময়ে আসিয়া, রোগীর পার্শ্বে আসনগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারও যত্নের ত্রুটি নাই। তথাপি সপ্তদশ দিনে রোগের আবার ভয়ানক বৃদ্ধি হইল। সেদিন ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন,—"আজি আর ভরসা নাই। এ অবস্থা হইতে রোগী আর বাঁচিতে দেখা যায় না। আমাদের এত পরিশ্রম, এত উদ্বেগ, এত ব্যয়, সকলই বোধ হয় বৃথা হইল। আজিকার দিন যে কাটে, এমন বোধ হয় না।"

বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। হরিদাসের স্ত্রী ও ভগ্নী ধূলায় পড়িয়া আছড়া-পিছড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পাড়ায় হাহাকার পড়িল। অনেকেই জেঠা গোপীনাথের নিকট মাথা খুঁড়িতে লাগিল। হরিদাস, অধোমুখে, হাতের উপর মাথা রাখিয়া, আমগাছতলায় বসিয়া রহিল, এবং হৃদয়ের সহিত সেই বিপত্তির মধুসূদন জেঠা গোপীনাথকে ডাকিতে লাগিল।

এদিকের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন অদ্বৈত সেখানে দেখা দিল। অদ্বৈত এবার একা নহে, তাহার সহিত আদালতের নাজির, দুই জন পেয়াদা, এবং আর দুইটা লোক ছিল। নাজির হরিদাসকে বলিল,—"এখনই তোমাদিগকে এ বাটী ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে হইবে। বাটী নিলামে বিক্রী হইয়া গিয়াছে। তুমি পরের বাড়ীতে বাস করিতেছ। যে বাড়ী কিনিয়াছে, সে তোমাকে থাকিতে দিবে কেন?"

কি সর্ব্বনাশ! এমন বিপদের সময় এই বজ্রাঘাত! হরিদাস চিত্রার্পিত পুত্তলির ন্যায় হা করিয়া নাজিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে একে একে সেখানে অনেক লোক জুটিয়া গেল। ডাক্তারও আসিলেন। তখন হরিদাস নাজিরকে বলিল,—"মহাশয়, আমার বড় বিপদ। আমার ছেলেটি মারা যায়—বড় কঠিন পীড়া—বড় খারাপ অবস্থা। এখান হইতে উঠিয়া আমি কোথায় যাইব? যদিই যাইতে হয়, এ অবস্থায় আমি কেমন করিয়া যাইব?"

নাজির বলিল,—"কোথায় যাইবে বা কেমন করিয়া যাইবে তাহা আমি জানি না। আমি সরকারী আমলা; আইন মত কাজ করিতে আমি বাধ্য। তোমাকে উঠিয়া যাইতে হইবে।"

হরিদাস তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"এ অবস্থায়

আমি উঠিব কোথায় ? আমার আর স্থান নাই। আমার ছেলে মারা যায়! আপনারা এখন যান। আমার বড় বিপদ।”

নাজির বলিল,—“তোমার বাড়ী এই অদ্বৈত ঘোষ নিলামে খরিদ করিয়া খাস-দখলের প্রার্থনা করিয়াছে। তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। আমি সেই খাস-দখল দেওয়াইতে আসিয়াছি। তুমি সহজে না উঠিলে, আমি জোর করিয়া, তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিব, এবং ইহার বাটিতে ইহাকে দখল দেওয়াইব।”

হরিদাস আবার সেই কথাই বলিল—বাড়ার ভাগ নাজিরের পায়ে হাত দিয়া কাঁদিয়া বলিল,—“আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বাড়ী-ঘরের জন্য আমার আর মায়া নাই—আমার ছেলে আজি মারা যাইতেছে—আর কিছু-তেই আমার দরকার নাই। স্বচ্ছন্দে অদ্বৈত দাদা ঘর বাড়ী দখল করুন. আমার সর্ব্বস্ব লইয়া যাউন, কিছুতেই আমার আপত্তি নাই। কিন্তু দুটা দিন আমাকে ক্ষমা করুন। যতক্ষণ আমার ছেলেটা আছে, ততক্ষণ আমাকে এখানে থাকিতে দেন। সে মরিয়া গেলেই আমারও শেষ হইবে। তখন আর কোন কথা কহিব না। আপনি দয়া করিয়া আমাকে দুদিন মাপ করুন। এই ডাক্তার বাবু রহিয়াছেন ; আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আমার ছেলের কিরূপ অবস্থা।”

রোগীর অবস্থা যে নিতান্ত শঙ্কটাপন্ন, ডাক্তার বাবু তাহা বুঝাইয়া দিলেন, এবং এ অবস্থায় যে সে রোগীকে স্থানান্তর করা অসম্ভব, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। এ সময়ে স্থানান্তরিত করিতে গেলে, ছেলেটী যে তৎক্ষণাৎ মারা যাইবে, তাহাও বলিলেন ; এবং যাহা করিতে হয়, আর দুই দিন দেখিয়া করিবার জন্য নাজিরের হস্ত ধরিয়া অনুরোধ করিলেন।

নাজির বলিল,—"আপনার কথা শুনিয়া আমি বুঝিতেছি, কিছু দিন অপেক্ষা করাই নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলা অনর্থক। অদ্বৈত ঘোষ সম্মত হইলেই আমি ফিরিয়া যাইতে রাজি আছি। অদ্বৈত যদি দরখাস্ত করে যে—নাজির আসিয়াছিল বটে, কিন্তু উপরোধে পড়িয়া বা টাকা খাইয়া অমনই চলিয়া গিয়াছে, আমার কোন কাজ করে নাই ; তাহা হইলে আমার চাকুরি লইয়া গোল বাধিবে। অতএব অদ্বৈতের মত না হইলে আমি স্বয়ং কিছুই করিতে পারিব না। আপনারা অদ্বৈত ঘোষকে স্বীকার করাইতে পারিলেই আমার কোন আপত্তি নাই।"

অদ্বৈত বলিল,—"হরি হে! সকলই তোমার ইচ্ছা। সংসার করিতে হইলে আপদ-বিপদ সকলেরই আছে। সকল রোগশোক বাঁচাইয়া বিষয়-কর্ম্ম করিতে গেলে চলে কি মহাশয়? বেয়ারাম হইয়াছে—কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা

তাহাই হইবে। তা বলিয়া বিষয়কর্ম্ম বন্ধ রাখিবার দরকার কিছুই নাই। আমি যে কত যোগাযোগ করিয়া, রাণাঘাট হইতে নাজির মহাশয়কে আনাইলাম, আজি কি নাহাক ফিরিয়া যাইবার জন্য? নাজির মহাশয়, আপনার কাজ আপনি করুন। লোকের কথা শুনিতে হইলে কাজকর্ম্ম চলে না।"

নাজির বলিল,—"দেখুন মহাশয়, আমি কি করিব?"

ডাক্তার বলিলেন,—"অদ্বৈত দাদা, তুমি প্রবীণ ও বিবেচক লোক; বিশেষ তুমি বড় কৃষ্ণভক্ত। এ অসময়ে তুমি যদি দয়া না করিবে, তবে দয়া করিবে কে?"

অদ্বৈত বলিল,—"দয়া কি জান, ডাক্তার বাবু, দয়াধর্ম্ম করিতে হইলে বিষয়-কর্ম্ম হয় না। বিষয়-কর্ম্মে দয়াধর্ম্ম করিতেও নাই। আর আমি গরিব—দয়া করা আমার মত লোকের কাজ, দাদা?"

ডাক্তার বলিলেন,—"এমন কথা বলিও না দাদা! দয়া করা তোমারই কাজ। তুমি দয়া করিলেই হরিদাস রক্ষা পায়। আমরা সকলে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি এ বিষয়ে তোমায় ক্ষান্ত থাকিতেই হইবে।"

অদ্বৈত বলিল,—"বিলক্ষণ কথা! আমি পয়সা খরচ করিয়া বাড়ী খরিদ করিলাম, দখল লইবার জন্য রাণাঘাট হইতে পেয়াদা আনিলাম, নাজির আনিলাম। এখন গাঁ শুদ্ধ লোক অনুরোধ করিতেছেন, ক্ষান্ত থাকিতেই হইবে।

যখন হরিদাস টাকা ধার করিয়াছিল,যখন তাগাদা করিতে করিতে আমার পায়ের সূতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, যখন নালিশ করিবার জন্য রাণাঘাট আর ঘর করিতে হইয়াছিল, যখন খরচের উপর খরচ করিয়া আমার খরচান্ত হইয়াছিল, তখন তোমরা কোথায় ছিলে বাপু? তখন কেহ দয়া করিয়া হরিদাসকে আমার হইয়া দুইটা অনুরোধ করিতে পার নাই, তখন গরিবের টাকাগুলা যাহাতে আদায় হয় তাহার কেহ উপায় করিতে পার নাই,? আজি সব পরম ধার্ম্মিক দয়ার-সাগরেরা আমাকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন! না বাপু, সে সব হইবে না, আমি বিষয়কর্ম্মে কাহারও অনুরোধ শুনি না। নাজির বাবু, আপনি আপনার কাজ করুন।"

নাজির বলিল,—"মহাশয়েরা আমাকে দোষী করিবেন না। পেয়াদা, ইহাদের ঘর হইতে জিনিসপত্র বাহির করিয়া ফেল।"

তখন গ্রামের আর একটি প্রবীণ লোক অদ্বৈতের হাত ধরিয়া বলিল,—"এমন কাজ করিও না দাদা, ইহাতে তোমার ভাল হইবে না। তুমি আমার কথা শুন। নাজির আর পেয়াদা আনিতে যাহা তোমার খরচ হইয়াছে, তাহা আমরা তোমাকে দিতেছি, তুমি এ কাজে ক্ষান্ত হও।"

অদ্বৈত বলিল,—"কি মজার কথা! আজি তোমার কথায় ক্ষান্ত হই, কালি আর একজনের কথায় ক্ষান্ত হই,

ইহাই করিয়া আমি বেড়াই, কেমন ? তোমাদের আপ্যায়িতে আমার শরীর জল হইয়া গেল ! নাজির মহাশয়, এ সকল ভূয়া গোল শুনিতে গেলে কাজ চলিবে না। আপনি যাহা করিতে আসিয়াছেন শীঘ্র শীঘ্র তাহা শেষ করিয়া ফেলুন।”

নাজির পেয়াদাদের লক্ষ্য করিয়া বলিল,—“তোরা কি দেখিতেছিস্—হা করিয়া ? যা না, শীঘ্র কাজ সারিয়া ফেল।”

সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া সকলেই অধোমুখে চিন্তিত। পেয়াদারা হরিদাসের ঘরের দাওয়ায় উঠিল। ডাক্তার রোগীকে ধরাধরি করিয়া একজন প্রতিবাসীর চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল।

এই সময়ে, পার্শ্বস্থ ঘরের পার্শ্বদেশ হইতে একটী ভদ্র বেশবান্ বৃদ্ধ পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধের বুক জুড়িয়া ধপধপে সাদা দাড়ি,মস্তকে সাদা চুলের রাশি, বর্ণ সুগৌর। বৃদ্ধ দুর্ব্বল বা কাতর নহেন। যুবার ন্যায় তাঁহার শরীর সমুন্নত, গতি ক্ষিপ্র, দন্তরাজি শোভাময়, নয়ন জ্যোতিষ্মান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতেজ। এই অপরিচিত বৃদ্ধকে দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। বৃদ্ধ সেই জনতার মধ্যবর্ত্তী হইয়া আদেশব্যঞ্জক ও প্রভুতাবিজ্ঞাপক স্বরে বলিলেন,—“কে ও হরিদাসের ঘরে উঠিতে

যাইতেছ? কে তোমরা? আমি বারণ করিতেছি, এমন কাজ খবরদার করিও না। নামিয়া আইস; যদি ভাল চাও, তবে এখনই নামিয়া আইস।”

পেয়াদারা একটা কথাও বলিতে সাহস করিল না। তাহারা নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ভীতভাবে এই বর্ষীয়ান্ আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নাজিরও পেয়াদাদের কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সে একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—“মহাশয় কে, তাহা জানি না। কিন্তু আপনি যেই হউন, সরকারি কাজে বাধা দিতে আপনার কোনই অধিকার নাই।”

বৃদ্ধ বলিলেন,—“সরকারী কাজের কলঙ্ক করিও না। তুমি মূর্খ, নিতান্ত হৃদয়হীন লোক; তাই সময় অসময় বিবেচনা না করিয়া দায়-অদায় না বুঝিয়া, এইরূপে সরকারি কাজ চালাইতে আসিয়াছ। এরূপ অসময়ে চক্ষের জল না ফেলিয়া যে সরকারি কাজ চালাইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, সে ডাকাইতের অপেক্ষা অধম লোক। তোমার মত জঘন্য আমলার জন্যই রাজার প্রতি প্রজার অশ্রদ্ধা হয় এবং রাজার কলঙ্ক হয়। এমন অবস্থায় প্রজার প্রতি অত্যাচার করিলে কোন রাজাই সন্তুষ্ট হন না। আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি এখনই তোমার দলবল লইয়া প্রস্থান কর। তোমার সরকারি কাজ আর এক সময়ে আসিয়া সম্পন্ন করিও।”

নাজির বলিল,—আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু কি করিব আমি—খরিদদার এখনই দখল না লইয়া ছাড়ে না যে!"

বৃদ্ধ, অদ্বৈতের দিকে ফিরিয়া; বলিলেন,—"কেন হে বাপু অদ্বৈত ঘোষ, আর দুই দিন অপেক্ষা করিলে কি তোমার কৃষ্ণ-নামে কলঙ্ক হইবে নাকি? যাও, এখান হইতে দূর হও ভণ্ড। আজি এ বাড়ী দখল করা কোন মতেই হইবে না।"

বৃদ্ধের ভাবভঙ্গী, তাঁহার বাক্যের তেজ, তাঁহার নির্ভীকতা ইত্যাদি আলোচনা করিয়া, অদ্বৈত ভীত হইল। কিন্তু ভয় করিলে বিষয়কর্ম্ম চলে না, এ সুনীতি স্মরণ করিয়া, সে বলিল,—"আপনি যেই হউন মহাশয়, আপনার কথাটা বড় অন্যায় হইতেছে। আমি টাকা পাইব, টাকা দিয়া বাড়ী খরিদ করিয়াছি, অথচ আমি দখল করিতে পাইব না! আমার টাকাগুলা মাটী হইয়া যাইবে, ইহা আপনার কিরূপ ব্যবস্থা?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"বটে! টাকা পাইবে? কত টাকা দিয়া বাড়ী খরিদ করিয়াছ? কত টাকা পাইবে তুমি?"

এই বলিয়া বৃদ্ধ, আপনার পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া বলিলেব,—"বল, সর্ব্বসমেত তোমার কত টাকা?"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি বাড়ী খরিদ করিয়াছি চব্বিশ

টাকায়। আর এজন্য আমার খরচাও পড়িয়াছে আর চারি টাকা। তা ছাড়া, আমার এখনও পাওনা আছে আটত্রিশ টাকা।”

বৃদ্ধ পকেট হইতে একখানি ষ্ট্যাম্প কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন—“উত্তম। তোমার সমস্ত টাকা তুমি বুঝিয়া লও। আর এই ষ্ট্যাম্প কাগজে তোমার পক্ষে কবালা লেখা আছে, তুমি ইহাতে সহি করিয়া, খোস-কবালা দ্বারা হরিদাসের নিকট এ বাটী বিক্রয় কর। লইয়া আইস তো একটা দোয়াত-কলম।”

একজন দোয়াত কলম সংগ্রহ করিতে গেল। সকলেই এই অপরিচিত বৃদ্ধের ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইল। অদ্বৈত বলিল,—“তা—তা—মহাশয়, আমি এ সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি, তা ইহা আমি ছাড়িব কেন?”

বৃদ্ধ বলিলেন,—“দেখ অদ্বৈত, তুমি যদি দুই দশটাকা বেশী চাহ, তাহাও আমি দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমাকে এই খোস-কবালায় এখনই সহি করিয়া এ বাটী বিক্রয় করিতে হইবে।”

অদ্বৈত ভাবিল, বড়ই শুভ-সুযোগ উপস্থিত। একটু রগড়া রগড়ি করিলে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা। সে বলিল,—“এ বাড়ী আমি মোটেই বিক্রয় করিব না। ইহা আমার রাখিবার আবশ্যক আছে।”

বৃদ্ধ রাগে কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ

হইল। তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলেই ভীত হইল। তিনি রাগত স্বরে বলিলেন,—"বটে! তুমি এ বাড়ী মোটেই বিক্রয় করিবে না? খোস-কবালায় তুমি সহি করিবে না? তুমি যে তুমি, তোমার চৌদ্দ পুরুষ উপস্থিত হইলে, আমার হাত হইতে ছাড়াছাড়ি নাই।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ পার্শ্বস্থ আম্রবৃক্ষের একটা শাখা মড়-মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন,—"তোর ন্যায় পাষণ্ডের মরাই উচিত। আজি তোকে মারিয়া ফেলিব। এক ডালের আঘাতে তোর মাথা গুঁড়া করিব।"

বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া অদ্বৈতের উপর পড়িলেন। অদ্বৈত কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপতিত হইল। বৃদ্ধ তাহার বুকে পা দিয়া বলিলেন,—"কে তোকে রক্ষা করে দেখি। তুই মহাপাপী, তোকে বধ করাই ধর্ম্ম।"

বৃদ্ধ তাহার বক্ষে চরণ পেষণ করিলেন। সে 'বাবাগো মাগো' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ আবার বলিলেন,—"এখনও আমার কথা শোন্। টাকা লইয়া দশ জন লোকের সাক্ষাতে নাম লিখিয়া দে।"

অদ্বৈত বলিল,—"দিতেছি, আমাকে ছাড়িয়া দেন।"

বৃদ্ধ চরণ উঠাইয়া লইলেন। ভয়ে ভয়ে নাজির বলিল,—"আজ্ঞে, যদি অনুমতি করেন, তবে আমরা যাই।"

বৃদ্ধ সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলে,তাহারা 'পড়ে-তো-উঠে-না-ভাবে' সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। পশ্চাদিকে ফিরিয়া চাহিতেও তাহাদের সাহস হইল না। অদ্বৈত গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া বলিল,—"আজ্ঞে, যদি কুড়িটা টাকা বেশী দিতেন, তাহা হইলেই, আমার সকল দিকে সুবিধা হইত। আমি আর কি বলিব? আপনার দয়া।"

বৃদ্ধ কহিলেন,—"তাহাই পাইবি, কিন্তু আর কথা কহিলে তোকে নিশ্চয় যমালয়ে পাঠাইব।"

এই বলিয়া ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনি এখানকার ডাক্তার না? আপনি এই টাকা লইয়া এই নরাধমের দাবী মিটাইয়া দিন। কুড়ি টাকা বেশী দিবেন, এই দলিলে উহার নাম সহি করিয়া লইবেন। তিনজন সাক্ষীর নাম লিখাইয়া লইবেন। ইহার বাকী দাওয়া মিটাইয়া দিবেন এবং সেজন্য রীতিমত রসিদ লিখাইয়া লইবেন। নোটের মধ্যে একখানি রসিদের টিকিট আছে। এ সকল বাদেও টাকা কিছু বেশী হইবে। হরিদাসের ছেলের চিকিৎসার জন্য তাহা আপনার নিকট থাকিবে। আজি রোগীর অবস্থা কেমন?"

ডাক্তার বলিলেন,—"আজ্ঞে বড় খারাপ।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"হরিদাস সকল ঔষধের সার ঔষধ তোমার ছেলেকে দিয়াছ কি? ভক্তি করিয়া জেঠা গোপীনাথের চরণামৃত তোমার ছেলেকে খাওয়াও, তাহার

সর্ব্বাঙ্গে দেও, অবশ্যই সে ভাল হইবে। প্রভুর মহিমার আদি নাই, জানিবে। ডাক্তার মহাশয়, আপনি এখনি প্রতিবাসীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া এই তিলকধারী ভণ্ডটার কাজ শেষ করিয়া আসুন।”

হরিদাস করজোড়ে বলিল,—“আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আমার ছেলে অবশ্যই ভাল হইবে। কিন্তু দয়াময়! আপনি কে?”

বৃদ্ধ বলিলেন,—“সে কথা পরে হইবে। তুমি আগে চরণামৃত আনিয়া রোগীকে খাওয়াও।”

হরিদাস আজ্ঞা-পালনে গমন করিল। অবিলম্বে সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সেই তেজস্বী বৃদ্ধ সেখানে নাই। কে তিনি? কোথায় তিনি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সায়ংকালে, অপরিচিত বৃদ্ধের নিকট হইতে হরিদাসের দেনা সমস্ত বুঝিয়া লইয়া, অদ্বৈত বাটী ফিরিল। তাহার স্ত্রী তাহাকে কোন কথাই বলিল না, তাহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ কিছুই করিল না। অদ্বৈত স্নান-আহার করিয়া বাজারে যে সকল খাতকের নিকট প্রতিদিন তাগাদা করিয়া টাকা পয়সা আদায় করিতে হয়, তাহাদের সন্ধানে যাত্রা করিল। তাহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া, হিসাবের ভুল করিয়া, কালিকার আদায় আজি অস্বীকার করিয়া, দোকানদারদের নিকট স্থদের স্থদ তস্থ স্থদের হিসাবে, পোকায় খাওয়া, ধূলাময় মসলা ও ডাউল, পচা পান প্রভৃতি লইয়া তাহাদের নিকট কতক প্রকাশ্য ও কতক অপ্রকাশ্য গালি খাইয়া, অদ্বৈত ঘোষ পয়সা-কড়ি ও জিনিস-পত্র সহিত সন্ধ্যার পর আবার বাটী ফিরিল। তাহার ভার্য্যা তাহার সহিত কোন প্রকার কলহ করিল না। অদ্বৈত বলিল,—"জিনিস-পত্র-গুলা আনিলাম, দেখিয়া শুনিয়া তুলিয়া রাখ।"

মঞ্জরী তুলিল না—জিনিষ-পত্রের দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। অদ্বৈত বলিল,—"বলি, এগুলা কি এখানে

পড়িয়া ইন্দুর-বাঁদরের পেটে যাইবে? যে কষ্টে এ সকল সংগ্রহ করিয়াছি, তা আর কি বলিব?"

মঞ্জরী হাসিয়া বলিল,—"লোকের নিকট একরকম ভিক্ষা করিয়া, একরকম চুরি করিয়া, একরকম ডাকাইতি করিয়া, জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়াছ—কেমন? লোকে তোমাকে কুকুর-বেড়ালের মত দূর-ছেই করিয়াছে, তবু তুমি নড় নাই; কেহ তোমার হাত হইতে জিনিষ কাড়িয়া লইয়াছে, তবু তুমি ছাড় নাই; কেহ তোমাকে গালি দিয়াছে, সে কথা মনে করিলে ক্ষতি হয়, এ জন্য তুমি তাহা শুনিয়াও শুন নাই। কেহ তোমাকে দেখিবামাত্র হতভাগাটা আসিতেছে বলিয়া মুখ ফিরাইয়াছে, তবু তুমি সর নাই। কেহ তোমাকে চোর, কেহ জুয়াচোর বলিয়াছে, কেহ তোমার মৃত্যুকামনা করিয়াছে, কেহ তুমি একটু সরিয়া গেলেই তোমার পিতৃকুলকে উদ্ধার করিয়াছে, তুমি কাহারও দোকান হইতে লুকাইয়া এক থাবা জিনিষ তুলিয়া লইয়াছ, এইরূপ অনেক কাণ্ড তুমি বাজারে করিয়া আসিয়াছ। কিন্তু এ সকল কার্য্য অন্যের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইলেও, তোমার পক্ষে কোনই কষ্টকর হইতে পারে না। কারণ, তোমার এ সকল নিত্যকর্ম্ম—ইহাই তোমার ব্যবসায়। তবে তুমি আজি কষ্টের কথা কেন বলিতেছ?"

অদ্বৈত হাসিয়া বলিল,—"যা বলিতেছ, তা কতকটা

ঠিক বটে। সংসার-ধর্ম্ম করিতে গেলে সবই করিতে হয়। কিন্তু আজি একটু বিশেষ আছে। ঐ যে সুপারিগুলা দেখিতেছ, ও জাহাজে নয়—পোকা লাগাও নয়। ভাল জিনিষ। হরে-বেণের দোকানে এগুলা আমদানি হইয়াছে। হরে-বেণে অনেক কাল আগে আমার কিছু টাকা ধারিত। সে টাকা আসল ও সুদের সুদ সমেত অনেক দিন হইল আদায় হইয়া গিয়াছে। তবু সুদের ছিট ক' গণ্ডা পয়সা বাকী করিয়া তাহার দোকানে এখনও যাওয়া আসা করি। সে কিন্তু পয়সা বাকীর কথা মানে না, বাড়ার ভাগ পয়সা-টাকার কথা বারবার বলিলে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখায়। ছোঁড়াটা বড় গোঁয়ার, বড় বেকুব। যাহাই হউক, সে যতই বলুক, আমি পয়সা ক' গণ্ডার কথাও ছাড়ি না, তার দোকানে যাওয়াও বন্ধ করি না। আজি আবার পয়সার কথা বলায় সে বেটা বড়ই চটিয়া উঠিল, আমাকে অপমান করিতে আসিল। শেষে একরকমে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আমি বলিলাম, পয়সা যদি নিতান্তই না দিবি, তবে দে আমাকে একসের সুপারি। সে সুপারি না দিয়া আমাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিল। আমি তাহার সামান্য ধাক্কা খাইয়াই পড়িয়া গেলেম; সঙ্গে সঙ্গে 'বাবাগো, মাগো, মারিয়া ফেলিল গো' শব্দে চীৎকার করিয়া হাটের লোক জমা করিয়া ফেলিলাম। অনেকেই

হরের একাজ ভাল হইয়াছে বলিতে লাগিল। দুই একটা লোক বলিল, বাপের বয়সী বুড়া-মানুষটাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। যাহা হউক, মোটের উপর হরেই দোষী হইল। তখন পাঁচজনের কথায় হরে কতকটা লজ্জায় পড়িল। অনেকের অনুরোধে সে তখন আমাকে এই এক পোয়া সুপারি দিয়া বিদায় করিল। সুপারিগুলা ভাল। যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখ—ছ'মাস ঐ সুপারিতে কাজ চালাইতে হইবে।"

মঞ্জরী বলিল,—"ছ'মাস কেন, তুমি ছ'বৎসর ঐ সুপারিতে চালাও, আমার তাহাতে কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তোমাকে যদি আমি আপনার লোক বলিয়া মনে করিতাম, তাহা হইলে তোমার এই সকল কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইত। তোমার সুখদুঃখে আমার সম্বন্ধ নাই, কাজেই কোন সুখ-দুঃখ মনে করি না।"

অদ্বৈত বলিল,—"সে কি কথা?"

মঞ্জরী বলিল,—"কথা নূতন নয়। গত ছয় বৎসর হইতে আমি তোমাকে পর বলিয়া মনে করিতেছি; ক্রমেই সে ভাব আমার মনে বাড়িয়া আসিয়াছে। এখন তোমাকে একবারও আপনার লোক ভাবিতে আমার শরীর শিহরিয়া উঠে।"

অদ্বৈত বলিল,—"সে কি মঞ্জরী? কেন তুমি এমন ভাবিতেছ? তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে,

তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী। ইহার চেয়ে আপনার লোক আর কি হইতে পারে?”

মঞ্জরী বলিল,—“বিবাহ তোমার সহিত আমার হইয়াছিল বটে; কিন্তু সে বিবাহের জন্য আমি কত দূর বাধ্য, তাহা বলিতে পারি না। যদি কোন ভালুকের সহিত মানুষের মেয়ের বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা তাহার ভল্লুক স্বামীকে আপনার লোক মনে করিতে পারে কি? তোমায় গায়ে মানুষের চামড়া আছে, আর তোমার চেহারাও মানুষের মত। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে সত্য; কিন্তু আমি বাঘ-ভালুককে আপনার স্বামী ভাবিতে অক্ষম।”

অদ্বৈত বলিল,—“ছি মঞ্জরী, স্ত্রীলোকের এমন কথা মুখে আনিতে নাই।”

মঞ্জরী বলিল,—“কেবল মুখেও আনিতে নাই নয়, মনেও ভাবিতে নাই। আমি সে সব ধর্ম্ম-কথা বিশেষ জানি। কিন্তু তোমাকে আপনার লোক মনে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ কারণে নিশ্চয়ই আমাকে পতিত হইতে হইবে। যদি এ পাপের কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তাহাও করিতে হইবে.”

অদ্বৈত বলিল,—“কেন তোমার মনে এ ভাব হইল? আমি বৃদ্ধ বলিয়া, কুৎসিৎ কুরূপ বলিয়া, কি তুমি আমাকে আপনার লোক মনে কর না?”

মঞ্জরী বলিল,—"রাধা-কৃষ্ণ! তুমি যদি গলিত-কুষ্ঠ হইয়া মানুষ হইতে, তাহা হইলেও আমি জিহ্বা দিয়া তোমার ঘা চাটিয়া দিতে পারিতাম। তুমি যদি কাণা, খোঁড়া, কালা ও বোবা, একসঙ্গে সবই হইয়া মানুষ হইতে, তাহা হইলেও আমি সকল রকমে তোমার সেবা করিয়া সুখী হইতাম। কিন্তু আমার পোড়া কপালক্রমে তুমি মানুষের চামড়া-ঢাকা বাঘ-ভালুক। ঐ সকল জন্তু দেখিলে, মানুষ যেমন মারিতে কাটিতে চাহে, তোমাকে দেখিলে আমিও তোমার সেইরূপ শত্রুতা করিতে চাহি। কাজেই তোমাকে আমি আপনার লোক মনে করিতে পারি না।"

অদ্বৈত বলিল,—"কেন তুমি আমাকে এরূপ মনে কর, তাহা তো বুঝিতে পারি না। আমি তোমার কি ক্ষতি করিয়াছি? যদিই করিয়া থাকি, আর না হয় করিব না।"

মঞ্জরী বলিল,—"কেন তোমাকে এরূপ মনে করি, তাহা তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি। তোমাকে মানুষ করিয়া আপনার লোক করিবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। ফল কিছুই হইবার আশা নাই দেখিয়াই তোমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। আমার যে ক্ষতি তুমি করিয়াছ, তাহা গুরুতর হইলেও আমি অতি সামান্য বলিয়াই জ্ঞান করি। কেবল

আমার ক্ষতি করিয়াই তুমি যদি মানুষ হইতে, বাঘ-ভালুকের মত প্রাণিহিংসা না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতাম।”

অদ্বৈত বলিল,—“আমি দুনিয়ার লোকের কাহার পাকা ধানে মৈ দিয়াছি? সংসার-ধর্ম্ম করিতে হইলে, দেনা-পাওনা করিতে হইলে, যাহা না করিলে চলে না, যাহা সবাই করে, তাহাই আমি করিয়া থাকি। ইহাতে আমি বাঘ-ভালুক কিসে হইলাম, তাহা তো বুঝি না!”

মঞ্জরী বলিল,—“কোন্ কথাটা তোমায় বলিব? তোমার কোন্ কাজটাই দেখাইব? আজি তুমি জেঠা গোপীনাথের পাড়ায় যে ব্যবহার করিয়াছ, মানুষে কখন কোথায় তাহা করিতে পারে না। হরে বেণের দোকানে এখনই তুমি যে কাজ করিয়া আসিয়াছ, কেহ কখন তাহা করিতে পারে না। এক দিনের এই কথা। দশ বৎসর আমি তোমার ঘরে আসিয়াছি। এই কালের সকল কথাই আমার মনে আছে। প্রত্যেকটিই চমৎকার। সব-গুলি ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যে, বাঘ-ভালুকও তোমার মত বাঘ-ভালুক নয়। তুমি জাল খৎ তৈয়ার করাইয়া, চাটুয্যেদের বড়-ঠাকুরুণের সর্ব্বনাশ করিয়া তাঁহাকে পথে বসাইয়াছ। আহা! ব্রাহ্মণ-কন্যা কোলের ছেলেটিকে লইয়া এখন ভিক্ষা করিয়া খায়। তুমি মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া বড়বাজারের রায়েদের সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়া লইয়াছ।

তাহারা এখন বাজারে পান বেচিয়া খায়। তুমি রামলাল বাবুর টাকা খাইয়া কায়েতদের জাতিকুল খাইয়াছ। সে নাকি তোমার কিছু টাকা ধারিত, কোন রকমেই শোধ করিতে পারে না। তুমি প্রতিদিনই তাহাদের বাড়ী হইতে তাড়াইবার ভয় দেখাইতে। তাহারা কত কাঁদিয়া তোমার পায় লুটাইত। শেষে, তাহাদের বিধবা একমাত্র কন্যা যদি রামলাল বাবুর সহিত প্রণয় করে, তাহা হইলে টাকা ছাড়িবে বলায়, তাহারা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হয়। এখন সেই কন্যাকে পাষণ্ড রামলাল বাবু ত্যাগ করিয়াছে। তাহার দুর্গতির শেষ নাই। মনে করিয়া দিতেছি, তাহাদের এইরূপ সর্ব্বনাশ করিয়া, টাকা সমস্ত ছাড়িব বলিয়াও তুমি কিছুই কর নাই। তাহাদের বিরুদ্ধে ডিগ্রিজারি করিয়া, তুমি তাহাদের ঘর-বাড়ী ঘটী-বাটি সকলই কাড়িয়া লইয়াছ। তুমি নরাধম, তুমি পিশাচ। এ জগতে কে তোমাকে আপনার ভাবিতে পারে? তোমারই মত নরাধম ও পিশাচের হয় তো তোমার সহিত আত্মীয়তা সম্ভব; কিন্তু আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, আপনার পোড়া কপালকে শতেক ঝাঁটা মারি, পূর্ব্বজন্মের অশেষ পাপের ফলে তোমার ন্যায় জীবের হাতে পড়িয়াছি মনে করি।"

অদ্বৈত অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিল। তাহার পর বলিল,—"বিষয়-কর্ম্ম করিতে হইলে যাহা করা উচিত,

তাহাই আমি করিয়াছি। ইহাতে যে বাঘ-ভালুক কেন হই, তাহা বুঝি না। তুমি রূপসী, যুবতী, আমি কুৎসিৎ বৃদ্ধ, কাজেই তুমি আমাকে ঘৃণা কর। ইহাই আসল কথা, তাই কেন ভাঙ্গিয়া বল না! তোমার কপাল মন্দ বটে, নাহলে এত রূপ লইয়া একটা বুড়ার সহিত কেন কাল কাটাইতে হইবে? ফল কথা, এ বুড়াকে আর তোমার ভাল লাগিতেছে না; একটা মনের লোক্ হইলে এত কথা উঠিত না। সেই চেষ্টাই মনে উঠিয়াছে, যোগা-যোগও হইয়াছে হয় তো! আমি একথা অনেক দিনই ভাবিয়া রাখিয়াছি। জানি আমি, অবশ্যই কোন না কোন দিন তুমি আমার কুলে কালি দিবে। তা যা তোমার ইচ্ছা হয়, তাই কর; নাহাক কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া আমার ঘাড়ে দোষ চাপাইও না, দোহাই তোমার।"

মঞ্জরী একটু হাসিয়া বলিল,—"তোমার মত লোকের এইরূপই মনে করা উচিত; সুতরাং তোমার কথায় আমি একটুও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি না। তুমি বিশ্বাস কর বা নাই কর, এজগতে কোন পুরুষেই আমার প্রণয় নাই। যে জন্য স্ত্রীলোকে পুরুষে আশক্ত, সে আকাঙ্ক্ষা আমি বহুদিন হইতে বিশেষরূপে দমন করিয়াছি। সংসারের বয়সে বড় যত পুরুষ, সকলেই আমার পিতা; বয়সে ছোট যত পুরুষ, সকলেই আমার পুত্র। তুমি ইতর, অধম, পশু।

তুমি তোমার মনে আমাকে বিচার করিতেছ। তোমার যাহা খুসি, ভাবিতে পার। আমি তোমার অনুগ্রহ-নিগ্রহের প্রত্যাশী নহি। সুতরাং তোমার মতামতে আমার যায় আসে না।”

অদ্বৈত বলিল,—“ভাল, বুঝ্‌লাম তোমার খুব ধর্ম্মনিষ্ঠা। তা এখন কি করিবে, স্থির করিয়াছ?”

মঞ্জরী বলিল,—“করিব যে কি, তাহা বলিতে পারি না; আর করিব না যে কি, তাহাও বলিতে পারি না। তবে একটা কাজ যে করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল—আমি তোমার সহধর্ম্মিণী। বিধিমতে চেষ্টা করিয়াও তোমাকে যখন ভাল পথে আনিতে পারিলাম না, তখন অন্য উপায়ে তোমার কৃত অনিষ্ট সকল নিবারণ করিয়া তোমার স্ত্রীর কাজ করিব—তোমার পরকালের ভাল যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করিব। তুমি লোভে পড়িয়া যে সকল লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছ, আমি সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়া তাহাদের উপকার করিব—তাহাদের অবস্থা যেমন ছিল, তেমনই করিয়া দিবার উপায় করিব। ইহাই আমার এক সঙ্কল্প; আমার দ্বিতীয় সঙ্কল্প, আমি একজনকে ভালবাসিব। জন্মাবচ্ছিন্নে আমি কাহাকেও ভালবাসি নাই। আমার প্রাণ ভালবাসিতে ও ভালবাসা ভোগ করিতে ব্যাকুল হইয়া আছে। আমি একটা স্থানে এই

ভালবাসা দেনা-পাওনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।”

অদ্বৈত বলিল,—“তাহাই তো আমি বুঝিয়াছি। আসল কথাই তো তাই। এতক্ষণ সেই কথা বল নাই কেন? কে সে প্রাণের লোক—রসিক নাগর, শুনি।”

মঞ্জরী বলিল,—“তুমি ইতর—সামান্য লোক। ভণ্ড, সে কথা তোমার বুঝিবার সাধ্য নাই। তথাপি তোমাকে তাহা বলা ভাল। আমার সে প্রাণের নাগর—ভগবান্। আমি যদি পারি তাহা হইলে ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিব—এ জীবন-যৌবন তাঁহারই পায়ে ফেলিয়া দিব। তাঁহার নিকট ভণ্ডামি নাই, প্রেমের অভাব নাই, দয়ার সীমা নাই, সুখের শেষ নাই, আনন্দের পার নাই। আমি তাঁহারই চরণে প্রেম দিব ও সেই চরণ হইতে প্রেম লইব।”

অদ্বৈত নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—“আমি বুঝিয়াছি, কোন্ বেটা বাবাজী আমার মাথা খাইয়াছে। নিশ্চয়ই কোন বৈরাগী বোলচাল দিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। এ সব বৈরাগী ঢঙের কথা। বল, কে তোমার মাথায় এ সকল বদমায়িসী ঢুকাইয়া দিল।”

মঞ্জরী বলিল,—“তুমি মূর্খ। তোমাকে আর কি বলিব?”

অদ্বৈত বলিল,—“আমি মূর্খই হই, আর পণ্ডিতই

হই, এ সকল বৈরাগীর শিক্ষা, তার আর ভুল নাই। কোন্ বেটা আসিয়া তোমাকে নিশ্চয়ই মজাইয়াছে। সে আপনাকে ভগবান বলিয়া বুঝাইয়াছে; তাহার পর তোমাকে ভগবানে মজিয়া ধর্ম্ম ও পুণ্য করিতে পরামর্শ দিয়াছে।"

মঞ্জরী বলিল,—"তুমি তুলসীর মালা গলায় দিয়া, সর্ব্বাঙ্গে তিলক সেবা করিয়া, নামের ঝোলা হাতে করিয়া, বাবাজী সাজ; অথচ সকল প্রকার পাপ ও কুৎসিত কার্য্যেই থাক। সুতরাং যাহা তোমার বিবেচনায় মন্দ কর্ম্ম, তাহাই কোন বাবাজী করিয়াছে বলিয়া স্থির করা তোমার পক্ষে অসঙ্গত নয়। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যা খুসী মনে আসে কর; আমার তাহাতে কিছুই যায় আসে না। তোমাকে সকল কথা বলা উচিত হউক না হউক, তথাপি বলিয়া রাখিলাম।"

মঞ্জরীকে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া, অদ্বৈত তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"বলি, যাও কোথা? তোমার কথা তো ভাল বুঝিতেছি না। এ সকল স্পষ্ট ব্যভিচারের কথা। তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইবে? এখনই ইহার প্রতিকার করিতে হইবে?"

মঞ্জরী বলিল,—"কি প্রতিকার করিতে চাহ, কর। যদি আমাকে ব্যভিচারিণী বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার সহিত সম্বন্ধ রাখা তোমার অন্যায়। তুমি

আমাকে তাড়াইয়া দিতে পার, আমি তাহাতে একটুও দুঃখিত বা কাতর নহি। তুমি আমাকে যাহা খুসী বক, তাড়াইয়া দাও, আমি কিছুতেই তোমার সহিত আর ঝগড়া করিব না। মারামারি তো মোটেই নয়। আমাকে তাড়াইয়া দেওয়াই যদি মত হয়, তাহা হইলে এখনই বলিলে আমি এখনই চলিয়া যাইতে রাজী আছি। যাহা ভাল হয়, বিবেচনা করিয়া কালি বলিও, আমি এখন আহারের উদ্যোগ করি।"

মঞ্জরী গৃহান্তরে গমন করিলে, অদ্বৈত মাথায় হাত দিয়া অকুল পাথার ভাবিতে লাগিল।

———●———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অপরিজ্ঞাত বৃদ্ধের পরামর্শানুসারে জেঠা গোপীনাথের চরণামৃত সেবনে ও লেপনে, হরিদাসের পুত্র গোপাল ক্রমেই রোগমুক্ত হইয়া উঠিল। পাঁচদিন পরে ডাক্তার বলিলেন,—"দাদা, আর আমার যাওয়া-আসার প্রয়োজন নাই। তোমার ছেলে গোপীনাথের কৃপায় সম্পূর্ণরূপ স্বচ্ছন্দ হইয়াছে।

হরিদাস বলিল,—"দাদা, গোপাল যে বাঁচিয়াছে, সে তোমারই দয়ায়। তোমার এ ঋণ আমি ইহজন্মে শুধিতে পারিব না।"

ডাক্তার বলিলেন,—"মানুষের দ্বারায় কি হয় ভাই, সকলই জানিবে গোপীনাথের দয়া। দেখ না দাদা, বড় যখন বিপদ, শুশ্রূষা অভাবে ছেলে মারা যায়, বাড়ীর লোক অবসন্ন, ঠিক সেই সময়ে মা-লক্ষ্মী আসিয়া ছেলে কোলে করিয়া বসিলেন। যখন হতভাগা অদ্বৈতের অত্যাচারে আমরা সকলে অস্থির, কি উপায় করি ভাবিয়া ঠিক করিতে অক্ষম, চারিদিকে ব্যাকুলতা ও হায় হায় শব্দ, ঠিক সেই সময়ে এক দেবতা আসিয়া তোমার সকল দায় উদ্ধার করিলেন। তিনি দেবতা নন তো কি,

দাদা ? আমি দেখিতেছি, তোমার উপর ভগবানের দয়া হইয়াছে, মানুষে আর তোমার কি করিবে ?”

হরিদাস বলিল, —“বৃদ্ধ যে কোথায় গেলেন, তাহার আর সন্ধান হইল না। সত্যই কি তিনি দেবতা ? আর একবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলে, তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়ি। তুমি কি তাঁহার সন্ধান বলিতে পার ?”

ঠিক সেই সময়ে তাঁহাদের পশ্চাদ্দিক হইতে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী বলিয়া উঠিলেন,—“আমি সন্ধান বলিতে পারি বাবা।”

উভয়ে সসম্ভ্রমে ফিরিয়া দেখিলেন, মা লক্ষ্মী জগৎ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—“আমি তাঁহার সন্ধান বলিতে পারি। তিনি দেবতা নন, তোমার আমার মত মানুষ।”

ডাক্তার বলিলেন,—“তোমার মত মানুষ যদি তিনি হন, তা হইলেই তিনি দেবতা ! কোথায় যাইলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, মা ?”

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—কোথাও যাইতে হইবে না বাবা, আবশ্যক হইলে ঘরে বসিয়াই তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। আমাকে যদি তোমরা দেবতা ভাবিয়া সুখী হও, তাহাতে আমি কি বলিব ! কিন্তু আমি জানি, আমি তোমাদেরই মত মানুষ, তোমাদের মা-বাপেরা যেমন মানুষ, আমিও তেমনই মানুষ। তোমাদের চেয়ে

অধম বা উৎকৃষ্ট মানুষ কখনই নহি। তা যাহা হউক, গোপাল গোপীনাথের কৃপায় সারিয়া উঠিয়াছে, বাবা। এখন নিয়ম-মত পথ্যাদি দিয়া চলিতে পারিলেই আর কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। তা বাবা, আমি এখন বিদায় হই।

হরিদাস বলিল,—"তোমার কাছে আমরা চিরদিনের জন্য কেনা রহিলাম। আমার গোপাল তোমার দাস। তুমি যাইবে শুনিলে, প্রাণ বড় অস্থির হয়। আর দুইদিন থাকিবার উপায় নাই কি মা ?"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"না বাবা, আমার এক যায়গায় বড় দরকার আছে। আমি তো তোমার মেয়ে। বাপের বাড়ী মেয়ে কত বারই আসিবে, সে জন্য চিন্তা কি ?"

ডাক্তার বলিলেন,—"সেই দেবতা যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে অদ্বৈতের দেনা মিটাইয়া দিয়া—আমার ঔষধের দাম কাটিয়া লইয়া, এখনও একশত টাকা বাঁচিয়াছে। এ টাকা তিনি তোমাকে দিতে বলিয়াছেন। এই লও দাদা, সে টাকা।"

এই বলিয়া ডাক্তার পকেট হইতে দশ টাকার দশখানি নোট বাহির করিলেন। হরিদাস বলিল,—"এ টাকা আমি আর লইব না দাদা। ইহা তাঁহাকে যে ফিরাইয়া দিতে হইবে। মা-লক্ষ্মী তাঁহার সন্ধান জানেন, উহাঁরই নিকট ও টাকা দেও, তাহা হইলে তিনি উহা পাইবেন।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—“টাকা তাঁহাকে দিতে হইবে না। গোপালের পথ্যাদির খরচ চালাইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তাহা দ্বারা তুমি ভাল করিয়া কাজ-কর্ম্ম করিবে। আমি বিদায় হই।”

হরিদাস বলিল,—“মা, তোমার সে বাসনগুলা কোথায় পাঠাব?”

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—“সেগুলা আমার এই বাপের বাড়ীতেই থাকিবে। আমার মা বাবা ভাই ভগ্নী এখন তাহা ব্যবহার করিবেন। যখন দরকার উপস্থিত হইবে, তখন আসিয়া আমি সেগুলা লইয়া যাইব।”

মা-লক্ষ্মী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তার ও হরিদাস তাঁহাকে প্রণাম করিবারও সময় পাইলেন না। পথে হিন্দু ও মুসলমান নানাবিধ লোক তাঁহাকে ঘেরিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এবং অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি সকলের সঙ্গেই মিষ্ট কথা কহিয়া, কুশলাদির সংবাদ লইতে লাগিলেন। বালকগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিল। ক্রোড়স্থ শিশুগণও ‘মা দাত্তে’ বলিয়া হাত নাড়িতে লাগিল। এইরূপে লোকালয় পার হইতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইল। ক্রমে বেলা প্রায় দুইটা বাজিল।

একটা জলাশয়ের পার্শ্বদেশ দিয়া মা-লক্ষ্মী চলিতে

লাগিলেন। তাহার ওদিকে মাঠ ও বন, প্রায় দুই এক ক্রোশের মধ্যে আর লোকালয় নাই। রৌদ্রে তাঁহার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। রবিকরোদ্ভাসিত রক্তিম গৌরবর্ণ বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। পরিশ্রম ও তাপাবসিত লোচনদ্বয় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দুসমূহ মুক্তাফলের ন্যায় অপূর্ব্ব হইল। এই অদ্ভুত-প্রকৃতিসম্পন্না সুন্দরী নারী, সন্নিহিত এক বটবৃক্ষমূলে বিশ্রাম-মানসে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, আর এক সুন্দরী বিপরীত দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এ সুন্দরী আমাদের পরিচিতা —মঞ্জরী।

মঞ্জরী বলিল,—"আপনাকে আমি আর কখন দেখি নাই, আপনিও আমাকে আর কখন দেখেন নাই। আমি পরমহংসঠাকুরের মুখে যে পরিচয় শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিতেছি, আপনিই মা-লক্ষ্মী। আমি শুনিয়াছি, আজি এই পথ দিয়া আপনি যাইবেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"কে আপনি ? আমি আপনার কি কাজে লাগিতে পারি ?"

মঞ্জরী বলিল,—"আমি যে কে, তাহা বলিলেই হয় তো আপনার দ্বারা আমার কি কাজ হইতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। আমি কি বলিয়া আমার পরিচয়

দিব ? আমি সধবা হইলেও বিধবা। আমার স্বামী আছে, কিন্তু সে নরাধম, সে পশু। আমি তাহাকে স্বামী বলিয়া কখনই মনে করি না ; সুতরাং আমি কি বলিয়া পরিচয় দিব ?”

মা-লক্ষ্মী দন্তে রসনা কাটিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন,—ছি, ছি ! কুলকামিনীর মুখে এমন কথা কখনও শুনি নাই। পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া ভগবতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আজি নারী নিজমুখেই পতি-নিন্দা করিতেছে। তুমি রাক্ষসী। আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ?”

মঞ্জরী।—বাস্তবিকই মা, আমি রাক্ষসী। আমি পাপিষ্ঠার একশেষ। পতি আমার চক্ষুশূল। আমি প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া, পতিকে ভালবাসিতে পারিলাম না। আমার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

মা।—যাহা মনে করিলে পাপ হয়, তুমি কি সে মহা পাপেরও পাপী ? স্ত্রীলোকের যাহা জীবন, নারীর যাহা সার ধন, তুমি অভাগী কি, সে সতীত্ব-সম্পত্তিও হারাইয়াছ ?

এইবার মঞ্জরী সতেজে বলিল,—“সে মহাপাপ এ অভাগিনীর শরীরে নাই। জীবনে কখন আমি পুরুষান্তরের কামনা করি নাই। স্বামীর সহিত প্রণয় না থাকিলেও, অন্য পুরুষের সহিত প্রণয় করিতে কখনও আমার

বাসনা হয় নাই। স্বামী আমার চক্ষুশূল হইলেও, এ জগতে আমার আর কোন প্রণয়াস্পদ পুরুষ নাই। পৃথিবীর যত পুরুষ, সকলকেই আমি পিতা বা পেটের ছেলে বলিয়া জ্ঞান করি। মনেও আমি কখন দ্বিচারিণী হই নাই।"

মা।—তবে তুমি অভাগী, স্বামীকে ভালবাসিতে পার না কেন ?

তখন মঞ্জরী একে একে জীবনের সমস্ত কথা বলিল। স্বামীর স্বভাব-চরিত্র-সংক্রান্ত সমস্ত কথাই সে নিবেদন করিল। যেরূপে সে স্বামীকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে, যেরূপে সে নিরন্তর তাঁহার হিতচিন্তা করিয়াছে, যেরূপে সে অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, যেরূপে তাহার স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যবোধ তিরোহিত হইয়াছে, যেরূপে তাহার প্রাণে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যেরূপে সেই অশ্রদ্ধা ক্রমশঃ ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া, সকলই মা-লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া, মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"বুঝিলাম, তোমার স্বামী নরাধম ও নিতান্ত ঘৃণার্হ মানব। তথাপি তোমাকে পাপীয়সী বলিতেই হইবে। নারীজন্ম লাভ করিয়া স্বামী সেবায় যাহার সুখ নাই, স্বামীর দোষই যে দেখিল, তাহার জীবনে ধিক্! তোমার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইবে। আপাততঃ তুমি কি করিবে, স্থির করিয়াছ ?"

তখন মঞ্জরী যেরূপে স্বামীকৃত দুষ্কৃতি-সমূহের প্রতি-বিধান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার স্বামী যাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—যেরূপেসে তাহাদের উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, এবং যেরূপে সে অতঃপর জীবন-পাত করিবে স্থির করিয়াছে, সমস্তই সে নিবেদন করিল। তাহার কথা শেষ হইলে, মা-লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যে পরমহংসের কথা বলিতেছিলে, তিনি তোমার কে ?"

মঞ্জরী।—তিনি আমার কেহই নহেন। দয়া করিয়া তিনি আমাকে তিন চারি দিবস দর্শন দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমি অকপটে মনের সমস্ত কথা বলিয়াছি। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথা জানাইলে, আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়তা হইবে বলিয়া, তিনি ভরসা দিয়াছেন। তিনিই আমাকে দয়া করিয়া আপনার সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে বল মা, আমি কি করি ? কি উপায়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে ?

মা। এই পুকুরের ডাইনদিকে বাঁশগাছের ফাঁক দিয়া ঐ যে খড়ের ঘর কয়খানি দেখিতে পাইতেছ, উহা সনাতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী। তিনি আমার দাদা হন। আমি ঐ বাটীতে থাকি। তোমাকে গৃহধর্ম্ম করিতে হইবে, বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে, আজি তুমি বাটী যাও। কালি মধ্যাহ্ন-কালে তুমি ঐ বাড়ীতে আসিও। আমি

সাধ্যমত তোমার সাহায্য করিব। আমার দাদা যদি সে সময় বাড়ী থাকেন, তাহা হইলে তিনিও তোমাকে অনেক সুপরামর্শ দিতে পারেন।

মঞ্জরী বলিল,—"আপনার রূপ দেখিয়া ও আপনার কথা শুনিয়া, বাড়ী আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। তা আচ্ছা, আমি যাই। কালি কিন্তু মা, আমি আবার আসিব।"

প্রণাম করিয়া, মঞ্জরী প্রস্থান করিলে, ধীরে ধীরে মা-লক্ষ্মী পুষ্করিণীর অপর-পারস্থিত সেই বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

মাটীর দেওয়াল দেওয়া, খড়-ঢাকা, চারিখানি বড় বড় ঘর। এক দিকে একখানি বড় ঘরের পশ্চাতে একখানি ছোট রান্না-ঘর, এবং ঢেঁকিশালা। আর এক দিকে আর একখানি বড়ঘরের পশ্চাতে একখানি প্রকাণ্ড গোশালা। সমস্ত বাটীর চারিদিকে জিওল ও ভেরেণ্ডা গাছের প্রকাণ্ড বেড়া। বাড়ীখানির সর্ব্বত্র সুপরিষ্কৃত।

একটি তিন বছরের ছেলে উঠানে বসিয়া ধূলা লইয়া খেলা করিতেছিল। মা-লক্ষ্মীকে দর্শনমাত্র সে বলিয়া উঠিল—"ওরে! পিসি-মা এয়েচে।"

ঘরের মধ্য হইতে সাত আট বছরের একটি মেয়ে ও তার চেয়ে ছোট একটি ছেলে ধাইয়া আসিয়া, পিসিঁমাকে

জড়াইয়া ধরিল। মা-লক্ষ্মী ধূলামাখা ছোট ছেলেটিকে কোলে লইলেন, আর দুইটির মুখচুম্বন করিলেন।

রন্ধনশালায় একটি আলোকসামান্যা সুন্দরী বসিয়া ছেলেদের খাবার তৈয়ার করিতেছিলেন। সেই আলু-লায়িত কুন্তলা সুন্দরীশিরোমণি হাতের কাজ ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র মা-লক্ষ্মী বলিলেন, —"বউ ঠাকরুণ। প্রাতঃপ্রণাম।"

বউঠাকরুণ বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, ভাই-সোহাগী হও।"

"তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।"

"এখন ভাইটিকে কোথায় রাখিয়া আসিলে বল।"

মা।—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। ঘরে কিছু খাবার আছে, চল বাবা আমরা কেড়ে খাইগে।

কর্ম্মক্ষেত্র।

ষষ্ঠ খণ্ড।

"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥"

অর্থ।—যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি নিত্যসন্ন্যাসী জানিবে; যেহেতু হে অর্জ্জুন, রাগ-দ্বেষাদিশূন্যব্যক্তি অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন।

তাৎপর্য্য।—যাঁহার হৃদয়ে কোন বিষয়েই দ্বেষ নাই, কোন পদার্থ লাভার্থ যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই, সাংসারিক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিলেও, তাদৃশ পুরুষকে সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। কারণ, হে অর্জ্জুন, সুখ-দুঃখ-রূপ দ্বন্দ্বাতীত পুরুষ অনায়াসেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৫ম অধ্যায়। ৩য় শ্লোক।
শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি।)

কর্ম্মক্ষেত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজীবপুরের দুই তিন ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে কানন মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র ঘরে হারাধনের জননী, পত্নী ও সন্তানগণ বাস করিতেছে, এ কথা বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। সেই সুপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ভবনের অঙ্গনে বেলা এক প্রহরের সময় হারাধনের পত্নী ভুবনমোহিনী একটী উনানে শুকনা পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধিতেছে। আর হারাধনের জননী ঘরের মধ্যে একখানি বটী পাতিয়া কাঁচকলা ও বেগুণ কুটিতেছেন। হারাধনের কন্যা রাধিকা ও খোকা অঙ্গনের এক পার্শ্বে ধূলার ঘর করিয়া খেলা করিতেছে। সকলেই নিশ্চিন্ত ও শান্তমূর্ত্তি।

সহসা উঠানের বেড়ার অপর দিক হইতে শব্দ হইল,—"হারাধন নন্দীর পরিবারেরা এখানে থাকে কি?"

সকলের নিশ্চিন্ততা ও শান্তি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই যেন এ কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সকলেই এ স্বর বিপৎজনক ও কঠোর বলিয়া মনে করিল। বালক

বালিকা ধূলাখেলা ফেলিয়া সভয়ে জননীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। জননী রন্ধন ছাড়িয়া সন্তানদ্বয়ের মধ্যে শাশুড়ীর নিকটস্থ হইলেন। আবার শব্দ হইল, "কেউ বাটীতে আছ কি? আমার কথা শুনিতেছ কি? এ বাটীতে রাজীবপুরের হারাধন নন্দীর মা ও স্ত্রী বাস করে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

হারাধনের মা অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"যাহার জন্যে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহারই গলার স্বর। জানি না, অদৃষ্টে কি আছে।" তাহার পর স্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন,—"এখানেই তাহারা থাকে বটে। আপনি কে? তাহাদিগকে আপনার কি দরকার?"

বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে উত্তর হইল,—"আমি তোমাদের পরম শত্রু হইলেও, এখন আমি তোমাদের হিতৈষী, আমি রাজীবপুরের সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। এ নাম শুনিয়া তোমরা ভয় পাইতে পার; কিন্তু আমি বলিতেছি, এখন আর ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি তোমাদিগকে দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। তোমরা নির্ভয়ে তাহার উত্তর দিলে আমি বড় সুখী হইব।"

হারাধনের মা ঘরের মধ্য হইতে বলিলেন,—"বলুন।"

সুরেন্দ্র বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি বোধ হয় হারাধনের মা?"

উত্তর হইল,—"হাঁ।"

সুরে। আপনাদের সংসার কিরূপে চলিতেছে? খরচপত্রের সবকুলান হইতেছে কিরূপে?

হা-মা। সেজন্য আমাদের কোন অসুবিধা নাই। ভগবান্ আমাদের সহায় হইয়া সকল অভাব মিটাইয়া দিতেছেন।

সুরে। বুঝিয়াছি। আপনারা যাঁহার সহায়তা-লাভ করিয়াছেন, তিনি ভগবানই বটেন। আমি তাঁহার উদ্দেশে ভ্রমণ করিতেছি। আমি অনেক কষ্টে আপনাদের সন্ধান করিয়াছি। আমার অত্যাচারে আপনারা অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। সাধ্যমতে সে অত্যাচারের প্রতিকার করিতে বাসনা করি।

হা-মা। অত্যাচারের কোন কথা এখন আর আমাদের মনে নাই। আমাদের কোন অসুবিধা থাকিলে, আপনার নিকট জানাইতে পারিতাম।

সুরে। সে কথা যাউক। এক্ষণে একটা অপ্রিয় সংবাদ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, আপনি বলিতে পারেন, গিরিবালা এখন কোথায় আছে?

হারাধনের জননীর কণ্ঠস্বর একটু সংক্ষুব্ধ হইল। বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি সে মারা গিয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথ কাতর ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"মারা গিয়াছে? আপনি ঠিক জানেন কি, গিরিবালা আর এ সংসারে নাই?"

হারাধনের জননী ব্যথিত স্বরে উত্তর দিলেন,—"হাঁ,

যাঁহার মুখে আমি এ সংবাদ শুনিয়াছি, তিনি মিথ্যা বলিতে পারেন না।”

তখন সুরেন্দ্রনাথ সেই স্থলে বসিয়া পড়িল এবং উড়ানির দ্বারা মুখ ঢাকিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। হারাধনের মা বহুক্ষণ তাহার স্বর শুনিতে না পাইয়া, সাহসে ভর করিয়া একটু অগ্রসর হইলেন এবং বেড়ার ফাঁক দিয়া সেই রোদননিরত যুবাকে দর্শন করিলেন। এ দৃশ্য তাঁহাকে ব্যথিত করিল। তিনি বধূমাতাকে সংক্ষেপে সমস্ত কথা জানাইলেন এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে এক ঘটী জল লইয়া বাহিরে আসিলেন। সুরেন্দ্রনাথের নিকটস্থ হইয়া বৃদ্ধা বলিলেন,—“আপনি সে হতভাগিনীর জন্য কাঁদিতেছেন কি? সে যেরূপ পাপ করিয়াছে, তাহাতে তাহার জন্য কাহারও দুঃখ হওয়া উচিত নহে। আপনি মুখে জল দিউন, স্থির হউন।”

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—“গিরিবালা পাপ করে নাই; আমিই তাহাকে পাপে মজাইয়াছি। তাহার পাপের জন্য আমিই দায়ী। হা ভগবন্, এ ঘোর পাপের নিমিত্ত আমাকে একবার গিরিবালার চরণ ধরিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিবারও সুযোগ দিলে না। আপনি জানেন বোধ হয়, কিরূপে কোথায় গিরিবালার মৃত্যু হইয়াছে?”

হারাধনের মা বলিলেন,-“অনাহারে অতিকষ্টে সে শান্তিপুরে মারা গিয়াছে।”

সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে এ সংবাদ বজ্রের ন্যায় কঠোর-ভাবে প্রবেশ করিল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"গিরিবালা অন্তঃস্বত্বা ছিল। সেই অবস্থায় তাহার জীবনান্ত হইয়াছে কি ?"

হারাধনের মা বলিলেন,—"না। এক পুত্র প্রসবের পরই অভাগিনী মরিয়া গিয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসিলেন,—"বোধ হয় সন্তানও সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়িয়াছে ?"

হারাধনের জননী বলিলেন,—"না। আমি শুনিয়াছি, ছেলে বাঁচিয়া আছে, ভাল আছে।"

সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায় আছে ?"

হারাধনের জননী বলিলেন,—"ঠিক জানি না, শুনিয়াছি শান্তিপুরে ঠাকুরদের নিকটে আছে।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি এক্ষণে বিদায় হই। পুত্রের সন্ধান না করিয়া আমি আর স্থির হইব না। আমার দ্বারা যদি আপনাদের কোন উপকার হয়, তাহা হইলে আমি সুখী হইব। আমি অধম, পাপী, কিন্তু আপনার সন্তান। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

সেই সুরেন্দ্রনাথের মুখে এইরূপ কোমল কথা শুনিয়া হারাধনের জননীর চক্ষুতে জল আসিল। সেই সন্ন্যাসীর সহিত সুরেন্দ্রনাথের সম্মিলনের গল্প বৃদ্ধার

মনে পড়িল। যদু হালদারের কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি বুঝিলেন, সেই সকল মহাত্মার সংস্পর্শে পাষণ্ডেরও এক মুহূর্ত্তে সাধু হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বলিলেন, "আপনি স্থির হউন, একটু বিশ্রাম করুন। তাহার পর যাহা হয় করিবেন।"

সুরেন্দ্রনাথ কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অদূরে শব্দ হইল,—"মা কোথায়, বুড়ি দিদি কোথায়? দাদা দিদি কই গো?"

তখনই মাতার অঞ্চলাশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভীত বালক-বালিকা বাহিরে আসিল। বৃদ্ধা ও সুরেন্দ্রনাথ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন।

আগন্তুক আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই মূর্খ দোকান-দার যদু হালদার। তাহার হাতে এক প্রকাণ্ড পুঁটুলি। তাহার পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই। এক সামান্য ধূতি সে পরিধান করিয়া কোমরে এক চাদর জড়াইয়াছে। যদু হালদার বেড়ার দরজা দিয়া উঠানে প্রবেশ না করিয়া বালক বালিকার হাত ধরিয়া সুরেন্দ্র-নাথের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

তাহাকে দর্শনমাত্র সুরেন্দ্রনাথ নমস্কার করিয়া বলি-লেন,—"যে দিন কৃপাময় মহাপুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে, তাহার পর দিন রাজীবপুরের বাটীতে আপ-নাকে দেখিয়াছিলাম। আপনি মহাত্মা। আমি শুনি-

তেছি, আমার সন্তান জীবিত আছে। আপনি নিশ্চয়ই তাহার সন্ধান জানেন। আজি ভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন পাইয়া ধন্য হইলাম। এক্ষণে দয়া করিয়া বলিয়া দিউন, আমি কোথায় আমার সন্তানকে দেখিতে পাইব?"

যদু বলিলেন,—"সে জন্য কোন চিন্তা নাই। আপনার সন্তান অতি উত্তম স্থানে সযত্নে পালিত হইতেছে। আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া সে স্থানে লইয়া যাইব। আপনি কাঁদিতেছিলেন, দেখিতেছি, অতীত ঘটনার নিমিত্ত কাতরতা অনাবশ্যক। বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহারই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আপনি মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়াছেন। সুতরাং চিন্তা বা শোক অনাবশ্যক। এক্ষণে আপনি বিশ্রাম করুন। দিদি মা, বাবুর জন্য একটু খাবার জল আন। একটা মাদুর কি কম্বল আন।"

হারাধনের জননী জলের ঘটী সেই স্থানে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। যদু হালদার বলিলেন,— আপনি রাজরাজেশ্বর। এরূপ স্থানে জলগ্রহণ আপনার শোভা পায় না। কিন্তু দেহরক্ষার জন্য কৃপা করিয়া এ অযোগ্য স্থানে একটু মিষ্ট মুখে দিয়া একটু জল খাইতে আপত্তি করিবেন কি?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আপনি দেবতার পার্শ্বচর। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।"

যদু বলিলেন,—"কৃপা করিয়া আপনি ঘটীর জল একটু মুখে হাতে দিউন।"

সুরেন্দ্রনাথ মুখে হাতে জল দিলেন। বৃদ্ধা আসিয়া একখানি কম্বল পাতিয়া দিলেন এবং পুনরায় জল আনিতে প্রস্থান করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করিলে যদু হালদার পুঁটুলি খুলিয়া কয়েকটী সন্দেশ বাহির করিলেন এবং তাহার দুইটী সবিনয়ে সুরেন্দ্র বাবুর হস্তে প্রদান করিয়া, আর দুই দুইটী বালক বালিকার হাতে দিলেন। বৃদ্ধা পানীয় জল লইয়া আসিলেন। যদু বলিলেন,—"আপনি কৃপা করিয়া ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। এই বাটীতে আমার মা আছেন। এই বালক বালিকা আমার ভাই ভগ্নী। আমি বাটীর মধ্যে গিয়া মার সহিত দুইটা কথা কহিয়া শীঘ্রই অসিতেছি।"

সুরেন্দ্রনাথ এখন আর সে অহঙ্কৃত, সে শিক্ষাগর্ব্বিত, সে বিলাসীপুরুষ নহেন। তিনি নিশ্চয়ই কোন মন্ত্রবলে আপনাকে তৃণাদপি নীচ বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন। তাঁহার বস্ত্র, জামা, চাদর, জুতা সকলই সামান্য। দোকানদার মূর্খ যদু হালদারও তাঁহার এখন ঘৃণার পাত্র নহে। সহজেই সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলেন।

যদু হালদার বলিলেন,—"আইস বুড়ি দিদি, আমার দুই একটা কথা শুনিতে সময় হইবে না কি?"

বৃদ্ধা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যদু হালদার বালক বালিকার হাত ধরিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

———●———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্যামবাজারে অদ্বৈত দাসের সেই বাটীতে অনঙ্গ মঞ্জরী মধ্যাহ্ন কালে একাকিনী বসিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিতেছে। তাহার দীক্ষা হইয়াছে। দীক্ষায় সে কি শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু সে ন না প্রকার পুষ্প সংগ্রহ করিয়া এবং চন্দনাদি বিবিধ উপকরণ লইয়া, অনেকক্ষণ বসিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অদ্বৈত দাসের সহিত সে আর বিবাদ করে না, তাহাকে কোন কটুবাক্য বলে না, তাহার ভাল মন্দ কার্য্যাকার্য্যের কোন সন্ধান করে না. তাহার সহিত প্রণয় বা অভিমানের কোন কথাই কহে না। অনঙ্গ এক প্রকার উদাসীন, সে সংসারে থাকিয়াও সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত। দিনের অধিকাংশ সময় তাহার পূজায় অতিবাহিত হয়। তাহার পর তৃতীয় প্রহর কালে সে পাক করে। অদ্বৈতকে এক পাথর ভাত দেয়, আপনিও যৎ-সামান্য আহার করে। অদ্বৈতের সহিত তাহার কথা-বার্ত্তা নাই বলিলেই হয়। তাহার পর সে বাটী হইতে প্রস্থান করে। অদ্বৈত লুকাইয়া দেখিয়াছে, তাহার সুন্দরী পত্নী বাটী হইতে প্রস্থান করিয়া কোন কুস্থানে

বা কুকার্য্য সম্পাদন করিতে যায় না। অনঙ্গ বাটী হইতে প্রস্থান করিয়া বন্যপথে মেলের নিকটে সেই সনাতন ঠাকুরের বাটীতে যায়। সেখানে সেই ঠাকুরের পত্নী ও কখন কখন মা লক্ষীর নিকট সে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা কথা শুনে; কোন কোন দিন তাঁহাদের সহিত সে জেঠা গোপীনাথের অঙ্গনে আসিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেয়। তাহার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে বাটীতে ফিরিয়া আইসে।

পত্নীর এইরূপ পরিবর্ত্তনে সাংসারিক আনন্দের কোন বৃদ্ধি না হইলেও, অদ্বৈত বিশেষ সুখী হইয়াছে। কারণ এ ভাবান্তরে তাহার প্রতি তিরস্কার, তাহার কার্য্যের তীব্র সমালোচনা ও তাহার সম্বন্ধে ঘৃণাসূচক বাক্যাবলী তিরোহিত হইয়াছে। সংসারে প্রণয়লীলা বা প্রেমালাপ নাই বটে, সুখ দুঃখে কার্য্যাকার্য্যে সমপ্রাণতা নাই বটে, তথাপি অসুখ ও অশান্তি নাই। কলহ ও চীৎকার অদ্বৈতের গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সে এখন সুখী হইয়াছে। কথাবার্ত্তা থাকুক না থাকুক, গালাগালি ও কলহ নাই, ইহাতে আনন্দিত হইয়াছে। মাসাধিক কাল এইরূপ চলিতেছে।

অদ্য মধ্যাহ্ন কালে অনঙ্গ পূজা করিতেছে। পূজায় বসিয়াছে অনেকক্ষণ; পূজা করিতে করিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈত বাটীতে ফিরিয়াছে।

পত্নীকে দূর হইতে পূজায় নিযুক্তা দেখিয়া সে আর সে দিকে আইসে নাই। যথাস্থান হইতে একটু তৈল লইয়া সে মাথায় দিয়াছে এবং ধীরে ধীরে স্নান করিতে গিয়াছে। অনঙ্গমঞ্জরী আজি বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া দেবার্চ্চনা করিতেছে। এত দিন সে পূজা করিতেছে, কিন্তু এমন অলৌকিক আত্মবিস্মৃতি তাহার কোন দিন হয় নাই। তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, দেহ আলোকিত, নেত্র মুকুলিত, গণ্ডে অশ্রু বিগলিত। সে আর পুষ্প লইয়া চন্দন মাখাইয়া দেবতাকে দিতেছে না; সে আর মন্ত্র বা বাক্য বলিতেছে না; সে আত্মহারা উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ সময়ে স্নানাদির পর অদ্বৈত ধীরে ধীরে সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং পত্নীর এইরূপ ভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িল। বাহ্যলক্ষণাদি দেখিয়া পত্নীর কোন কঠিন পীড়া হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল। অনঙ্গের বিরাগ ভয়ে এ সময়ে কথা কহিয়া তাহার অবস্থা জানিতে চেষ্টা না করা সে অবৈধ বলিয়া মনে করিল। তখন অতি সাবধানে নিকটস্থ হইয়া সে ধীরে ধীরে ডাকিল,—"মঞ্জরী, অনঙ্গ মঞ্জরী, তুমি এমন করিয়া রহিয়াছ কেন"

অনঙ্গ কোন উত্তর দিল না; কিন্তু তাহার শরীর যেন একটু চঞ্চল হইল। অদ্বৈত আবার ডাকিল,—"অনঙ্গ, অনঙ্গ কথা কহিতেছ না কেন?"

অনঙ্গমঞ্জরী যেন মন্ত্রচালিত হইয়া চক্ষু মেলিল এবং অদ্বৈতের বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। অতি কোমল, অতি মধুর, অতি প্রশান্ত দৃষ্টি। তাহার পর সহসা অদ্বৈ-তের অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া গলায় কাপড় দিল এবং বহুক্ষণ অদ্বৈতের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া রহিল অদ্বৈত নিশ্চল ও অবাক্। পত্নীর দেহের সহিত তাহার দেহের সংস্পর্শ বহুকাল ঘটে নাই। আজি অনঙ্গের মস্তক তাহার চরণে সংলগ্ন হইয়া রহিল। অদ্বৈতের দেহে যেন অননুভূত-পূর্ব্ব মোহময় মদিরার আবেশ উপস্থিত হইল। সে যেন সহসা কোন পূর্ণানন্দময় অভিনব রাজ্যে নীত হইয়া পরমানন্দের অধিকারী হইল।

মঞ্জরী বহুক্ষণ পরে মস্তকোত্তোলন করিল। তখন তাহার গণ্ড বহিয়া শতধারায় অশ্রু বহিতেছে। সে কৃতা-ঞ্জলীপুটে নিবেদন করিল,—"তোমার এত রূপ, এত শোভা, এত গুণ, এত পুণ্য, এত পবিত্রতা! এমন আর কখন দেখি নাই। ধন্য আমি। যুগে যুগে যেন তোমার এই ভাব দেখিয়া আমি ধন্য হই।"

অদ্বৈতদাস পত্নীকে সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া থাকিতে দেখিল, তাহার নয়নের অশ্রুপ্রবাহ দেখিল, তাহার বাক্যাবলী শুনিল। কিন্তু এ অবস্থায় কি বলিতে হইবে, তাহা তাহার মনে হইল না। সে অনেকক্ষণ পরে সেই স্থানে বসিয়া পড়িল, তাহার পর আপনার বস্ত্রাগ্রদ্বারা

অনঙ্গের চক্ষু ও বদন মুছাইয়া দিল। তাহার পর উভয় বাহুদ্বারা সেই সুন্দরীকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। মঞ্জরী বলিল,—"কি ভয়ানক ভ্রমে আমি এতদিন ডুবিয়াছিলাম! কি পাপে আমি এতদিন অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছি! আমি তোমাকে এতদিন মানুষ ভাবিয়া কি যাতনাই না পাইয়াছি। তুমি যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণপুরুষ, এ সত্য কথা আমি এতদিন জানিতাম না। তোমার শোভার তুলনা নাই, তোমার গুণের শেষ নাই, তোমার কার্য্যাকার্য্য নাই। ক্ষুদ্র নারী হইয়া প্রত্যক্ষ ভগবান্ স্বামীর কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিতে আছে কি? ছি ছি! আমি কি পাপই না করিয়াছি।"

অদ্বৈত বলিল,—"আমি মহাপাপী, আমি প্রতারক, প্রবঞ্চক, পরস্বাপহারী দস্যু ও হিংস্রজীবের অপেক্ষাও অধম ব্যক্তি। তুমি আমাকে দেবতা ভাবিতেছ কেন?"

অনঙ্গ বলিল,—"ছি ছি! ও কথা বলিও না। ও সকল কথা কানে শুনিলেও পাপ হয়। তুমি যাহা কেন কর না, সকলই ভাল; তোমার কার্য্যে ভাল ভিন্ন মন্দ দেখিলে আমার পাপ হয়।"

অদ্বৈত বলিল,—"অনঙ্গ, তুমি এ সকল আশ্চর্য্য শিক্ষা কোথায় পাইলে? তোমার এরূপ দেবত্ব কিরূপে হইল?"

মঞ্জরী বলিল,—"ছি, দাসীকে কি দেবতা বলিতে আছে? আমি কত পাপ করিয়াছি, তাহার সীমা নাই।

তুমি দয়াময়। দয়া করিয়া অবোধের পাপ ক্ষমা করিও।”

অদ্বৈত বলিল,—“তোমার নিকট আমি শত অপরাধী। তোমার ক্ষমাই আমার প্রার্থনীয়। সে যাহা হউক, বল মঞ্জরী, কাহার উপদেশে তোমার এইরূপ জ্ঞান জন্মিল ?”

মঞ্জরী বলিল,—“তিনি স্বর্গের দেবী। তাঁহাকে তুমি তো জান। তিনি মা-লক্ষ্মী। তাঁহার উপদেশে আমি আমার দেবতা চিনিতে পারিয়াছি।”

অদ্বৈত একবার সাদরে মঞ্জরীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—“মা লক্ষ্মীর চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম। তাঁহার কৃপায় আমি আজি ধন্য হইলাম।”

মঞ্জরী বলিল—“আমি এখন যাই। তোমার সেবার আয়োজন করিতে হইবে। বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে।”

মঞ্জরী চলিয়া গেল। অদ্বৈত একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল, বাস্তবিকই আমি অতি ঘৃণিত পাপী। তথাপি আমার আজি এই ভাগ্যোদয়। আমাকে দেবতা বলিতেছে। পাপী হইয়াও যদি এই মান, এই সুখ, এই ভাগ্য হইল. নিষ্পাপ হইলে না জানি কি সৌভাগ্যই ঘটিতে পারে। মঞ্জরী নিশ্চয়ই দেবতা হইয়াছে। মঞ্জরীর উপদেশে কাজ করিতে হইবে। যাই, মঞ্জরী যেখানে বসিয়া আছে, তাহার নিকটে গিয়া বসিয়া থাকি।

তাহার অঙ্গের বায়ু গায়ে লাগিলেও মন পবিত্র হইতে থাকে। যাহার গৃহে এমন দেবী, তাহার কি কোন পাপ করিতে আছে?”

অদ্বৈত ধীরে ধীরে উঠিয়া পাকশালায় গমন করিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া মঞ্জরী তাড়াতাড়ি একখানি পিঁড়ি পাতিল এবং অঞ্চলবস্ত্রে তাহা পরিষ্কৃত করিয়া অদ্বৈতকে তাহার উপর বসিতে বলিল।

যথাসময়ে অন্নাদি পাক হইলে মঞ্জরী সযত্নে অদ্বৈতের সম্মুখে আহার্য্য আনিয়া দিল। অদ্বৈত যতক্ষণ আহার করিল, ততক্ষণ মঞ্জরী পার্শ্বে বসিয়া তাহার দেহে পাখার বাতাস দিতে লাগিল। অদ্বৈতের আহার সমাপ্ত হইলে, সে বিশ্রাম করিতে গেল। মঞ্জরী তখন ভক্তি সহকারে অদ্বৈতের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি ভোজন করিল।

বড় সুখে অদ্বৈতের দিন কাটিতে লাগিল। এত আনন্দ সে আর জীবনে কখন ভোগ করে নাই। তাহার চিত্তেরও যথেষ্ট ভাবান্তর হইতে লাগিল। সে আপনার অতীত জীবনের আলোচনা করিয়া অশেষ দুষ্কৃতির আলেখ্য দেখিতে লাগিল। সে সতত মঞ্জরীর সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা কহিতে লাগিল। মঞ্জরী এক দিন তাহাকে বলিল,—“আমি পাপিষ্ঠা নারী; ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন কথাই আমি জানি না। পাপের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতে মরিতে আমি মা লক্ষ্মীর আশ্রয় লইয়াছিলাম। তিনি

আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে নারী স্বামীকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করে সে পাপীয়সীর একশেষ। জেঠা গোপীনাথ বিগ্রহ দেখাইয়া তিনি স্বামীকেও সেই-রূপ জ্ঞান করিতে বলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি স্বামীকে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী ভাবিয়া ধ্যান পূজা করিতে অভ্যাস করি। অনেক চেষ্টায় এ অন্ধকার-হৃদয়ে আলোক আসিয়াছে। এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি, স্বামীর কাজ সকলই ভাল। তাঁহার ভাল-মন্দ আলোচনা করাও মহাপাপ। তোমার কি করা উচিত, কি না করা উচিত, আমি তাহার কি জানি? তুমি যাহা কর, সকলই ভাল, "আশীর্ব্বাদ কর তোমার চরণে যেন আমার অবিচলিত মতি থাকে।"

বড় সুখে দিন কাটিতে লাগিল বটে, কিন্তু অদ্বৈত ক্রমেই বড়ই চিন্তাকুল হইতে লাগিল। সে অনেক সময় আপনার বিগত ক্রিয়াকলাপের কথা ভাবিতে লাগিল। শেষে এক দিন বৈকালে সে গোপীনাথ পল্লীতে আসিয়া অন্য কোন দিকে না গিয়া সে প্রথমেই জেঠা গোপীনাথ দেবের ভবনে উপস্থিত হইল এবং সম্মুখস্থ অঙ্গনে মস্তক স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ সে প্রণাম করিল। যখন সে মাথা তুলিল, তখন তাহার নয়নে জল, হৃদয়ে শান্তি আসিল। এমন ভাবে দেবতা প্রণাম

সে কখনও করে নাই; প্রণাম করিয়া এত সন্তোষ সে আর কখন ভোগ করে নাই।

সে স্থান হইতে অদ্বৈত হরিদাসের ভবনে উপস্থিত হইল। হরিদাসের সে দিন বড় উদ্বেগ—তাহার ঘরে চাউল নাই। এ উদ্বেগ তাহার মাসের মধ্যে প্রায় পনের দিন ভুগিতে হয়। সে কাপড় বুনিতে বসিবে, এমন সময় তাহার ভগ্নী তাহাকে এই বিষম সংবাদ দিল। হরিদাস কাজকর্ম্ম ভুলিয়া গেল। এমন সময় মা-লক্ষ্মীর সন্তাপনাশিনী মূর্ত্তি তাহার নয়নে পড়িল। মা-লক্ষ্মী আসিবা মাত্র হরিদাস উঠিয়া তাঁহাকে ভক্তিসহ প্রণাম করিল। মা-লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হরিদাস সকল চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কাজে বসিল। এমন সময় দূরে অদ্বৈতদাসকে আসিতে দেখিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ক্রমে সে দেখিল, অদ্বৈত তাহারই বাটীর দিকে আসিতেছে। অদ্বৈত অচিরে হরিদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল আছ হরিদাস? ছেলে ভাল আছে?"

হরিদাসের তখন ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং সে নমস্কার করিল না। কথার প্রকৃত উত্তরও দিতে পারিল না। বলিল,—"দাদা, তা, তুমি এদিকে কেন? দেনা তো মিটিয়া গিয়াছে।"

অদ্বৈত বলিল,—"সে জন্য কোন চিন্তা নাই। আমি সে জন্য আসি নাই। তোমরা কেমন আছ, তাহাই একবার দেখিতে আসিয়াছি। আর একটা কথাও আছে। তোমার কাছে ডিক্রীজারী করিয়া যে টাকা আমি আদায় করিয়াছি, তাহাতে আমার কিছু ভুল হইয়াছে।"

হরিদাস নিতান্ত কাতর ভাবে বলিল,—"দাদা আমাকে প্রাণে মারিও না। আমি আর টাকা দিতে পারিব না। আমি টাকা কোথায় পাইব? এক মহাত্মা দয়া করিয়া দেওয়ায় তোমার দেনা শোধ করিতে পারিয়াছি। দোহাই—দাদা, সে কথা আর তুলিও না।"

অদ্বৈত বলিল,—"তোমাকে আর টাকা দিতে হইবে না। তুমি যে টাকা দিয়াছ, তাহাতে ভুলক্রমে কিছু বেশী লওয়া হইয়াছে। সেই টাকা কয়টী তোমার ফেরৎ লইতে হইবে।"

হরিদাস বলিল,—যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আর ফেরৎ লইবার আবশ্যক নাই দাদা। তোমার টাকা হাতে লইলেই আবার আমার ঘর দুই খানি লইয়া টানা-টানি পড়িবে। টাকার আমার দরকার নাই দাদা। তুমি ওকথা আর বলিও না।"

অদ্বৈত বলিল,—"এ টাকার রসিদ লইব না, খৎ লিখা-ইব না, কেহ সাক্ষী থাকিবে না; সুতরাং বিপদ ঘটিবার

কোন ভয় নাই। তোমার হক টাকা আমি ফিরাইয়া দিব মাত্র। ইহাতে ভয় কি ভাই ?"

হরিদাস বলিল,—"টাকা আমার নহে, আমি তাহা দিই নাই। আমি ফেরৎ লইব কেন ? তোমার যদি ইচ্ছা হয়, যাঁহার টাকা তাঁহাকে তুমি ফিরাইয়া দিতে পার।"

অদ্বৈত বলিল,—"তাঁহার সাক্ষাৎ আমি কোথায় পাইব ? তুমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে জান। তুমিই তাঁহাকে টাকা দিতে পারিবে। তুমি টাকা রাখিয়া দেও।"

হরিদাস বলিল,—"না দাদা, আমি টাকা রাখিব না। আমি সে মহাত্মাকে জানি না। মা-লক্ষ্মী তাঁহাকে জানেন, মা-লক্ষ্মী এখন ঐ ঘরের মধ্যে আছেন। তিনি বাহিরে আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা ভাল হয় করিও।"

তখনই মা-লক্ষ্মী গোপালের মা ও পিসির সহিত কথা কহিতে কহিতে বাহিরে আসিলেন। অদ্বৈত ও হরিদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। মা-লক্ষ্মী নিকটস্থ হইলেন। অদ্বৈত ভক্তি সহকারে ভূপৃষ্ঠে মস্তক স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ তাঁহাকে প্রণাম করিল।

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমি সকল কথা শুনিয়াছি। কত টাকা ভুল হইয়াছিল ?"

অদ্বৈত বলিল,—"বত্রিশ টাকা সাড়ে বারো আনা।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"তুমি আমার সহিত আইস।

যাঁহার টাকা তাঁহার নিকট তোমাকে লইয়া যাইব। তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই হইবে।"

মা-লক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন। অদ্বৈতদাস তাঁহার অনুসরণ করিল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গোপীনাথ পল্লীর উত্তর পশ্চিমে প্রকাণ্ড প্রান্তর আছে। তাহারই এক পার্শ্বে একটী ঘন বাঁশ ও আম বাগানের মধ্যে সনাতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস। মুখোপাধ্যায় মহাশয় দরিদ্র গৃহস্থ। কিঞ্চিৎ নিষ্কর ভূমি আছে; তাহার আবাদ করিয়া তাঁহার অন্নাদির সঙ্কুলান হয়; তিনটী গাভী আছে; তাহাদের দুগ্ধ পাওয়া যায়; আবশ্যকের অধিক ধান্য বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়; তাহাতে অন্যান্য খরচ চলে। গৃহসংলগ্ন একটু বেড়া দেওয়া জমি আছে; তাহাতে নানাপ্রকার তরকারী হয়। সুতরাং বিশেষ সমৃদ্ধির সহিত না হইলেও, অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া যায়।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভূত শ্রমশীল ও বলিষ্ঠ পুরুষ, তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ; কিন্তু দেহ পঞ্চবিংশ বর্ষীয় যুবার ন্যায় মাংসল ও উজ্জ্বল। কৃষিকর্ম্ম, গো-পালন ও সাংসারিক অন্যান্য অনেক কর্ম্ম মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং সম্পাদন করেন। তিনি নিষ্কর্ম্মাবস্থায় এক মুহূর্ত্তও থাকেন না।

সনাতন মুখোপাধ্যায় লেখা পড়ায় সুপণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার আছে এবং দর্শনাদি শাস্ত্র তিনি রীতিমত আলোচনা করিয়াছেন। ইংরাজি ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার। এরূপ ব্যক্তি রাজকার্য্যাদিতে লিপ্ত হইলে নিশ্চয়ই অত্যুন্নত পদপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি ও শিক্ষা তাঁহাকে সে পথে যাইতে দেয় নাই। তিনি অর্থ লালসা ও ভোগস্পৃহা পরিহার করিয়া এইরূপ হীন ও অপরিচিত ভাবে জীবনপাত করাই পরম সুখময় বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

সংসারে তাঁহার পত্নী মাধবী দেবী ও দুইটী শিশু পুত্র ও একটী কন্যা আছেন। সনাতনের সহধর্ম্মিণী মাধবী দেবীর রূপ অলৌকিক এবং স্বভাব দেবোপম। অলঙ্কার বা শোভাবর্দ্ধক পদার্থে তাঁহার প্রয়োজন হয় না। আলস্য বা বিলাসপ্রিয়তা তাঁহার নিকটে আইসে না। নিরানন্দ ও অসন্তোষ তাঁহাকে দেখিলেই দূরে পলায়ন করে। সীমন্তে স্থূল সিন্দূর রেখা বিন্যাস করিয়া, দেহ স্থূল ও পরিষ্কার লালপেড়ে সাটীতে সুন্দর-রূপে আচ্ছন্ন করিয়া, প্রকোষ্ঠে শঙ্খ ও লৌহভূষণ ধারণ করিয়া এই সুন্দরী নিয়ত সন্তুষ্টচিত্তে ও প্রসন্ন বদনে পতি-সেবা, গৃহকর্ম্ম সম্পাদন, সন্তান পালন ও অন্যান্য বিবিধ কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। মাধবী দেবীর

বয়স পঞ্চত্রিংশ বর্ষ হইলেও, তিনি অষ্টাদশবর্ষীয়া নারীর ন্যায় লাবণ্যময়ী।

যাঁহাকে লোকে মা-লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করে এবং যিনি লক্ষ্মীরূপে আনন্দ ও সন্তোষ বিতরণ করিতে করিতে প্রতিনিয়ত বিপন্নের সহায়তায় আত্ম নিয়োজন করিয়া থাকেন, তিনিও এই বাটীতে বাস করেন। সম্পর্কে তিনি সনাতনের ভগ্নী।

সনাতনের ভবন অতি সামান্য। কয়েকখানি তৃণাচ্ছাদিত ঘরে তাঁহারা বাস করেন। একখানি ঘরে গাভী থাকে, একখানিতে পাক হয়, একখানিতে আগন্তুক পুরুষেরা বসিয়া থাকে, আর দুইখানি ঘরে সনাতন বাস করেন। সকল ঘরই সুপরিষ্কৃত ও সর্ব্বত্র আবর্জ্জনা শূন্য। বাটীর চারি দিকে কচার বেড়া।

এক দিকের বেড়ার বাতা খসিয়া গিয়াছে ও কচা গাছসকল ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে। সনাতন অনেকবার তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার গৃহিণীও কয়েকদিন সে বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। অবকাশ অভাবে সনাতন এই প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অদ্য হাতে বিশেষ কার্য্য না থাকায়, সনাতন সেই কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার ভগ্নী বেড়ার অপর দিকে থাকিয়া ভ্রাতৃকার্য্যের সহায়তা করিতেছেন।

সনাতনের মাথায় গামছা বাঁধা। বক্ষের উপর স্থূল উপবীত। হাতে একখানি ছোট দা। পার্শ্বে এক তাল দড়ি এবং অনেক কচার ডাল ও কয়েকখানি বাকারি। এইরূপ হীনজনোচিত কর্ম্ম সম্পাদনকালেও সনাতনের কি প্রশান্ত মূর্ত্তি! কি অপরূপ জ্ঞানালোক সমুদ্ভাষিত অলৌকিক মুখশ্রী! কি শোভাময় সুপরিণত সমুজ্জ্বল কলেবর!

সনাতন বেড়ার বাহিরের দিকে এবং মালক্ষ্মী ভিতরের দিকে রহিয়াছেন। মা লক্ষ্মী আবশ্যক মত দড়ি ঘুরাইয়া দিতেছেন, বাকারি ধরিতেছেন ও কচাগাছ সমান করিয়া বসাইতেছেন। কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিলেও ভাই-ভগ্নীর সুখের বিরাম নাই। তাঁহারা নিয়ত নানা বিষয়ক কথা কহিতেছেন। মা লক্ষ্মী বলিতেছেন— "কিন্তু দাদা, সুরেন্দ্র বাবুকে এখনই ছেলে ছাড়িয়া না দিলে হইত। হয় তো সুরেন্দ্র ছেলের ভাল যত্ন করিবে না; তখন খোকা কষ্ট পাইবে, অসুস্থ হইবে, মারাও যাইতে পারে।"

সনাতন বলিলেন,—"আমার মনে সে আশঙ্কা নাই। সুরেন্দ্র যত করুক না করুক, তাহার স্ত্রী যে খোকার রীতিমত যত্ন করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সন্তান হয় নাই। তাঁহার লক্ষ্মীরূপা স্ত্রী একটী পুত্রের জন্য বড়ই ব্যাকুলা। স্বামীর পুত্র আছে জানিয়া তিনি

সেই পুত্র পাইবার নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহান্বিতা। তাঁহার নিকট খোকা স্বচ্ছন্দ থাকিবে, মাতৃহীন শিশু মা পাইবে, পিতার আশ্রয়ে পিতার ঐশ্বর্য্য ভোগে শিশু নিশ্চয়ই সুখে থাকিবে।”

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—“হারাধন নিশ্চয়ই শীঘ্র ভাগিনেয়কে দেখিতে আসিবে। সে তো বার বার খোকাকে দেখিতে আইসে। এবার আসিলে কি বলিবে?”

সনাতন বলিলেন,—“হারাধনকে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব। সুরেন্দ্র ও হারাধন উভয়েরই মন অনেক নির্ম্মল হইয়াছে। তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিলে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। এ ব্যবস্থায় হারাধন নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে।”

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—“আমার কিন্তু খোকার জন্য মন কেমন করিতেছে।”

সনাতন হাসিয়া বলিলেন,—“তাই কেন বল না তুমি নিজে খোকাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছ না, তাহা না বলিয়া ব্যবস্থাটা ঠিক হয় নাই বলিতেছ কেন? কিন্তু দিদি, মায়া মোহ কমাইয়া আসাই তো আবশ্যক। পরের ছেলেই হউক, আর নিজের ছেলেই হউক, কাহারও জন্য অনাবশ্যক মায়া ভাল নহে। যতটুকু প্রয়োজন, যাহা নহিলে নহে, কর্ত্তব্যপালনের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তাহার অধিক মায়া এ জগতে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধেই থাকা উচিত নহে।”

মা লক্ষ্মী কোন উত্তর না দিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সনাতন বলিলেন,—"বুঝিয়াছি দিদি, তোমার নীরববাক্য আমি প্রণিধান করিয়াছি। তুমি বলিবে, অনেক স্থলে ধর্ম্ম সাধনার্থও মায়ার প্রয়োজন। দেবতার প্রতি মমতা পরমধর্ম্ম। তাহা বর্জ্জন করিলে অধর্ম্ম হয়। একথা সত্য। কিন্তু ভগ্নি, এ সংসারে কর্ত্তব্য অনেক। অন্য কর্ত্তব্যের গুরুভার সম্বন্ধ লইয়া একটা কর্ত্তব্য ত্যাগ করায় ক্ষতি কি? সকল কর্ত্তব্যই সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেই বোধ হয় পূর্ণতা হয়।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"কিন্তু দাদা, আমার বোধ হয় এ ধর্ম্মনীতি নারীর পক্ষে আদরণীয় নহে। নারীর প্রধান কর্ত্তব্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পতিপরায়ণতা। সে কর্ত্তব্য সাধন না করিয়া অন্য সহস্র কর্ত্তব্য পালন করিলেও বোধ হয় নারীর ধর্ম্মহীনতা ও অপূর্ণতা ঘটে। তুমি দেখ দাদা, মঞ্জরীদাসী ধর্ম্মশীলা ও সতী হইলেও, এক পতিবিদ্বেষ-রূপ মহাপাপে সে নরকের অনলে পুড়িতেছিল।"

সনাতন বলিলেন,—"তোমারই কৃপায় তাহার চিত্তে শান্তি আসিয়াছে।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"যেরূপেই হউক, ভগবানকে স্বামী ভাবিয়া আরাধনা করিতে করিতে সে স্বামীকেই ভগবান বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল যাতনার শেষ হইয়াছে। তবেই দাদা, নারীর

পক্ষে কোন অবস্থা, কোন ধর্ম্ম, কোন কর্ত্তব্যই পতি-পরায়ণতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।"

সনাতন বলিলেন,—"তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তবে প্রত্যক্ষরূপে যেখানে সে ধর্ম্মপালনের সুযোগ না হয়, সেখানে নারী মনে মনেও সে ধর্ম্ম পালন করিয়া পূর্ণানন্দের অধিকারিণী হইতে পারে।"

মা লক্ষ্মী পুনরায় একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সনাতন বলিলেন,—"কিন্তু দিদি, অনঙ্গমঞ্জরীর পরিবর্ত্তনে আমি বিশেষ কোন আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না। কেন না, সে তোমার ন্যায় দেবীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে। তোমার প্রদত্ত উপদেশ ও শিক্ষা সে লাভ করিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতদাসের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে অতীত দুষ্কৃতির জন্য এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে, এখন সে সর্ব্বপ্রকারে অতীত দুষ্কৃতির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"ইহাতে আমি কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছি না দাদা। তাহার পত্নী এখন দেবী-স্বভাব। সাধু সঙ্গের পরিণাম চিরকালই অত্যাশ্চর্য্য ও মন্ত্রৌষধি অপেক্ষা বলবান্। অনঙ্গমঞ্জরীর সংস্পর্শে অদ্বৈতও এখন সাধু হইতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য কথা কিছুই নাই।"

সনাতন বলিলেন,—"তুমি শুনিয়াছ কি লক্ষ্মী, অদ্বৈত

তাহার বহু আয়াসে অর্জ্জিত কুড়ি হাজার টাকা এই সেবাব্রতে ব্যয় করিবার নিমিত্ত আমার হাতে দিতে উদ্যত হইয়াছে?”

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—“আমি তাহা শুনিয়াছি। আর সুরেন্দ্র বাবুও এই কার্য্যে বার্ষিক পনর হাজার টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এরূপও শুনিয়াছি। তুমি কি ব্যবস্থা করিয়াছ দাদা?”

সনাতন বলিলেন,—“আমি অদ্বৈতকে বলিয়াছি, আবশ্যক হইলে তোমার টাকা ক্রমে ক্রমে লওয়া যাইতে পারে; সেবার ভাণ্ডারে এখন টাকার অপ্রতুল নাই। আর সুরেন্দ্রকে বলিয়াছি, উপস্থিত সময়ে পরোপকার-ব্রত যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে এত টাকার প্রয়োজন হইবে না। যদি সকলের চেষ্টায় এই ব্রত আরও ব্যাপক-রূপে অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই টাকার প্রয়োজন হইবে। তখন অবশ্যই তোমার টাকা গ্রহণ করিতে হইবে। সুরেন্দ্র এই পরসেবাব্রত বহু বিস্তৃত করিতে অভিলাষী হইয়াছে।”

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—“গোপীনাথের কৃপায় এ অনুষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব।”

লাবণ্যময়ী মাধবী দেবী হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—“ভাই-বহিনে বেড়াই বাঁধিতেছ—এদিকে বেলা কত হইল তাহার জ্ঞান আছে কি?”

সনাতন বলিলেন,—"সত্যই বেলা অনেক হইয়াছে। লক্ষ্মী, তুমি যাও, আর সামান্য কাজ বাকী আছে, আমি এটুকু শেষ করিয়া যাইতেছি।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমি তো যাইব না। বউ-ঠাকরুণের সহিত আমার ঝগড়া হইয়াছে। সকাল বেলা যখন ছেলেরা চালিভাজা খায়, তখন আমি বউ-ঠাকরুণের কাছে দুইটী চালিভাজা চাহিয়াছিলাম, উনি আমাকে দেন নাই। আমার কি রাগ হইতে পারে না?"

মাধবী বলিলেন,—"বেশ তো, ভাইয়ের কাছে, আমার নামে ঠকামি করিলে। আমিও বলি, শুন ঠাকুর, কালি রাত্রিতে তোমার ভগ্নীর শরীর খারাপ হইয়াছিল, তাই আমি প্রাতে উহাকে চালিভাজা খাইতে দিই নাই। ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে কি?"

সনাতন বলিলেন,—"তোমার যে দিন অপরাধ হইবে, সে দিন চন্দ্র-সূর্য্য নিভিয়া যাইবে। লক্ষ্মী, তোমার শরীর খারাপ হইয়াছিল, এ কথা তুমি তো একবারও বল নাই।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"কিছুই নহে—একটু মাথা ধরিয়াছিল মাত্র; বউ-ঠাকরুণ ফাঁকি দিয়া চালিভাজা খাইতে দিলেন না। অসুখ কাহাকে বলে তাহা তো তোমার কৃপায় আর জানিতে পারি না দাদা।"

বেড়া শেষ হইয়া আসিল। সনাতন বলিলেন,—

"কাজ শেষ হইয়াছে, বেলাও অনেক হইয়াছে, চল এখন আহারাদির চেষ্টায় যাওয়া যাউক। মাধবী দেবি, আজি কি পাক করিয়াছ বল ?"

মাধবী বলিলেন,—"লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যাহা জুটাইয়া দিয়াছেন।"

মাধবী হাসিতে হাসিতে মা লক্ষ্মীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন্। সকলে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজীবপুরের জমিদার সুরেন্দ্র বাবুর অন্তঃপুরে এক সুন্দরী যুবতী একটী দেড় বৎসর বয়স্ক ভুবনমোহন শিশু ক্রোড়ে লইয়া সোহাগ করিতেছেন। এই সুন্দরী সুরেন্দ্র বাবুর সহধর্ম্মিণী রাজবালা; আর এই শিশু সুরেন্দ্র বাবুর পাপপ্রবৃত্তির জ্বলন্ত পরিচয় স্থল—গিরিবালার সহিত তাঁহার অবৈধ প্রণয়ের পরিণাম ফল। শিশু বড়ই সুকুমার, বড়ই পুষ্টদেহ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। রাজবালা সন্তানরূপে এই শিশুকে পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছেন। শিশু তাঁহাকে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছে। খোকার অন্য নাম থাকিলেও, রাজবালা তাহাকে 'সোণার চাঁদ' এবং সংক্ষেপে 'চাঁদ' বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। রাজবালার অন্য কাজ নাই; দাস দাসীতে সংসার নির্ব্বাহ করে; তিনি কেবল দিন রাত্রি তাঁহার চাঁদকে লইয়া ব্যস্ত থাকেন। চাঁদ প্রায় এক মুহূর্ত্তও তাঁহার কাছছাড়া হইতে পায় না।

রাজবালা বৈকালে চাঁদকে কোলে লইয়া অন্তঃপুরের একটী প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে পরিক্রমণ করিতেছেন; সঙ্গে

সঙ্গে কত সোহাগের কথা, কত আদরের কথা বলিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিতেছেন। চাঁদ সে সকল কথা বুঝিতে পারুক না পারুক, সেও তাহার সঙ্গে অনেক বকিতেছে, অনেক হাস্য করিতেছে।

ধীরে ধীরে সুরেন্দ্র বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে খোকার ও রাজবালার এই আনন্দাভিনয় দর্শনে বড়ই সুখী হইলেন। মনে মনে তাঁহার একটু লজ্জাও হইল। এই অতুলনীয়া সুন্দরীর সহিত প্রাণের মিলন দূরে থাকুক, কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয়ও ছিল না। এই গুণময়ী, লাবণ্যময়ী স্বর্ণপ্রতিমার সহিত তিনি একটা কথাও কহিতেন না, এজন্য লজ্জা হইল। আর লজ্জা হইল সেই সুন্দরীর অঙ্কস্থিত সেই নয়নবিনোদন নন্দন দর্শনে। সেই শিশু তাঁহার লজ্জার পরিচায়ক এবং তাঁহার পত্নীর ঘৃণার স্থল হইলেও, রাজবালা তাহাকে অকপটে স্নেহের সহিত গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় সমাদরে লালন পালন করিতেছেন। মাতৃহীন-শিশু স্নেহময়ী মা পাইয়াছে, পিতৃ-পরিত্যক্ত শিশু, পিতার আশ্রয় পাইয়াছে; পাপজাত পরিচয়হীন-শিশু সর্ব্বসমক্ষে পিতৃপরিগৃহীত হইয়াছে। শিশুর সকলই শুভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু পিতার লজ্জা তো যায় না। এক বৎসর পূর্ব্বে হইলে এরূপ ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, সুরেন্দ্র বাবু বুক ফুলাইয়া মনুষ্যসমাজের মস্তকে

পদাঘাত করিতেন; পত্নী এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, সুরেন্দ্র বাবু হয় তো তাঁহার কোমল কলেবরে কষাঘাত করিতেন। কিন্তু এখন আর সে সুরেন্দ্র বাবু নাই, তাঁহার হৃদয় আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে সহসা সুরেন্দ্র বাবুর মূর্ত্তি রাজবালার নয়নে নিপতিত হইল। তিনি একটু প্রণয়সূচক হাস্য করিয়া, মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন,—"তুমি ওখানে দাঁড়াইয়া আছ বুঝি? কেন কাছে আসিলে ক্ষতি কি? আবার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি?"

সুরেন্দ্র একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"অপরাধ তুমি করিবে কেন? যে চির অপরাধী সেই কাছে আসিতে ভয় পায়।" "কেন, আমি কি বাঘ না ভালুক? আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিব না—ভয় নাই। তুমি ও পোড়া অপরাধের কথাটা বার বার বলিয়া কেন আমাকে লজ্জা দেও বল দেখি? তোমার কিসের অপরাধ?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"অপরাধ গণিয়া শেষ হয় না; কোন্‌টা বলি বল? আপাততঃ অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমার ঐ কোলে।"

রাজবালা আর একটু অগ্রসর হইয়া সুরেন্দ্রের অতি নিকটে আসিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"অপরাধ করিয়া যদি সোণার চাঁদ লাভ করা যায়, তবে তাহা

অপরাধ নয়—পুণ্য। বহু পুণ্যেও এমন সোণার চাঁদ পাওয়া যায় না।"

সুরেন্দ্র বলিল,—"তাহা হউক, যেরূপে এ সোণার চাঁদের উদ্ভব হইয়াছে তাহা কি পুণ্য? তাহাও কি অপরাধ নয়?"

রাজবালা বলিলেন,—"ছিঃ! তাহাতে কি হইয়াছে? নানা কারণে পুরুষের নানা প্রকার স্বাধীনতা আছে। তাহা যখন আছে, তখন পুরুষে তাহার ব্যবহার করিলে অপরাধ হয় না। সেইরূপ স্বাধীনতার ব্যবহার করিতে গিয়া এই সোণার চাঁদের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাতে ক্ষতি কি?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"এরূপে অতি সহজে হাসিয়া উড়াইয়া দিলে সকলেই উড়াইয়া দেওয়া যায়। তোমাকে যে এত দিন একবারও চক্ষু দিয়াও দেখি নাই, তোমার এ সোণার দেহ যে অনাদরে শুকাইতেছে, সে কথা একবারও ভাবি নাই, তাহাতেও কি আমার অপরাধ হয় নাই?"

রাজবালা বলিলেন,—"কিছু না। তুমি দেখ বা না দেখ, তোমাকে ভক্তি করা, মনে মনে তোমার চরণ চিন্তা করা, তোমাকে পূজা করা আমার ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের, সে সুখের, আনন্দের কোনই ব্যাঘাত হয় নাই। আর অনাদরের কথা বলিতেছ? স্বামীর আশ্রয়ে থাকিতে পাওয়াই

নারীর পরম সুখ। সে সুখে তো তুমি আমাকে বঞ্চিত কর নাই। তবে আবার অনাদর কি?”

সুরেন্দ্র বলিলেন,—“এত অত্যাচার এরূপ সহজে উড়াইয়া দেওয়া অসাধারণ ক্ষমতার কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কথার বিচার এখন থাকুক। আপাততঃ তোমার সোণার চাঁদকে দেখিবার জন্য তাহার মাতুল হারাধন আসিয়াছে। একবার সোণার চাঁদকে বিশ্বাস করিয়া আমার কাছে দিবে কি?”

রাজবালা একটু ভীতভাবে সোণার চাঁদকে আর একটু চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন,—“তিনি কেন আসিয়াছেন? সত্য বটে,ছেলে আমার গর্ভে জন্মে নাই—তাঁহার ভগ্নীর গর্ভে জন্মিয়াছে। কিন্তু ছেলে যে তোমার, তাহার তো কোনই ভুল নাই। তোমার ছেলে হইলেই, কাজেই এ ছেলে আমার। বিশেষ যখন ছেলের মা নাই, তখন ছেলে নিশ্চয়ই আমার। আমি এ ছেলে যাহার তাহার কাছে যাইতে দিব কেন? তোমার ছেলে তোমার কাছে দিব না বলিতে আমার কোন অধিকার নাই। কিন্তু হারাধনের এ ছেলের উপর কোনই দাবী থাকিতে পারে না তো। তবে তিনি কেন ছেলে দেখিতে আসিলেন?”

সুরেন্দ্র বলিলেন,—“তিনি অধিকার সাব্যস্ত করিতে আইসেন নাই, ছেলে লইয়া যাইতেও আইসেন নাই।

ছেলের সহিত তাঁহার রক্তের সম্বন্ধ আছে, তাই তিনি স্নেহের অনুরোধে একবার সোণার চাঁদকে দেখিতে চাহেন।”

রাজবালা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“তা আচ্ছা। তুমি লইয়া যাইবে, আবার তুমিই লইয়া আসিবে। যাহার তাহার কোলে সোণার চাঁদকে দিতে পাইবে না। বেশী বিলম্ব করিলে হইবে না। বড় জোর আধ ঘণ্টার জন্য আমি সোণার চাঁদকে তোমার কাছে ছাড়িয়া দিব। এ সকল কথায় স্বীকার হও যদি, তবে খোকাকে লইয়া যাইতে পার।”

সুরেন্দ্র বলিলেন,—“বেশ কথা। আমি ঠিক তোমার আদেশমত কাজ করিব।”

রাজবালা বলিলেন,—“দাঁড়াও এখনই কোল পাতিও না। সোণার চাঁদকে গহনা পরাইয়া দিই, ভাল জামা গায় দিয়া দিই, চুল আঁচড়াইয়া দিই, সঙ্গে এক জন দাসী দিই, তাহার পর তোমার কোলে দিব।”

এক জন দাসীর নাম ধরিয়া ডাকিয়া রাজবালা সোণার চাঁদের অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদি আনিতে বলিলেন। সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসিলেন,—“হারাধন এখন কি করেন ?”

সুরেন্দ্র বলিলেন,—“বড় কিছু করেন না। ভগ্নীর দুর্দ্দশা ও অকাল মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার চিত্ত বড় অবসন্ন হইয়াছে।”

রাজবালা বলিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে তিনি মা, স্ত্রী ও সন্তানাদি লইয়া এই গ্রামেই বাস করেন না কেন? তুমি যদি অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার একটু পাকা বাড়ী করিয়া দেও এবং কিঞ্চিৎ মূলধন দিয়া তাঁহাকে একটা কারবার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেও, তাহা হইলেই বড় ভাল হয়।"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"তোমার মুখে এ পরামর্শ শুনিবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার নিকট এ সকল প্রস্তাব করিয়াছি। তিনি বলেন, এ গ্রামে মুখ দেখাইতে তাঁহার লজ্জা হয়, আর স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইতে তাঁহার বড়ই সঙ্কোচ হয়।"

দাসী অলঙ্কারাদি লইয়া উপস্থিত হইল। রাজবালা খোকাকে লইয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন এবং তাহাকে সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন,—"তাঁহার এ লজ্জা ও সঙ্কোচ সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তুমি একটু চেষ্টা করিলেই বোধ হয় এই কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আমরা সুখী হইতে পারি।"

খোকা অলঙ্কার পরিতে ও জামা গায়ে দিতে বড়ই আপত্তি করিতে লাগিল। রাজবালা তাহাকে অনেক আদর করিতে লাগিলেন, অনেক ভয় দেখাইতে লাগিলেন কিন্তু খোকা হাত ছুড়িয়া, পা নাচাইয়া, শুইয়া পড়িয়া পরিচ্ছদ ধারণে অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন

রাজবালা, "দুষ্টছেলে, ও চুপ।" বলিয়া তিরস্কার করিলেন, তৎক্ষণাৎ অভিমানী শিশু ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজবালা অনেকক্ষণ বুকে করিয়া, অনেক আদর করিয়া, তাহাকে ভুলাইলেন।

সুরেন্দ্র বলিলেন, "তোমার কথামত হারাধনের সুব্যবস্থা করিতে আমি চেষ্টা করিব। বোধ হয় কৃতকার্য্য হইব। তোমাকে একটা কথা বলা হয় নাই। সে অভাগিনী আমার ঘড়ি, চেন, আঙ্গটী, নোট, মোহর ও টাকা প্রভৃতি যে সকল জিনিষ লইয়া গয়াছিল, তাহার সকলই হারাধন লইয়া আসিয়াছে। কিছুই নষ্ট হয় নাই।"

রাজবালা বলিলেন,—"সে সকল সামগ্রী না লইয়া, নন্দী মহাশয়কেই লইতে বল না কেন?"

সুরেন্দ্র বলিলেন,—"তাহা তিনি কিছুতেই লইবেন না।"

রাজবালা বলিলেন,—সেগুলা আর আমাদের লইয়া কাজ নাই। অন্য উপযুক্ত কোন কার্য্যে তাহার ব্যবহার করিলেই হইবে। খোকাকে সাজান প্রায় শেষ হইল। চুল কয়টা একটু গুছাইয়া দিলেই হয়। দেরী হইতেছে বলিয়া রাগ করিতেছ কি?"

"তোমার কার্য্যে রাগ? আমাকে লজ্জা দিবার জন্যই কি এ কথা বলিতেছ রাজবালা?"

রাজবালা বলিলেন,—"তুমি যখন রাগ করিতেছ না,

তখন আর একটা কথা বলি। সেই তোমার বৈঠক-খানায় সন্ন্যাসীরূপে যিনি দর্শন দিয়াছিলেন, কয়দিন প্রাতে দয়া করিয়া যিনি আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহাকে তুমি আবার একবার দেখিয়াছ। কিন্তু আমার অদৃষ্টে সে দেবদর্শন আর ঘটিল না। সে গোপীনাথপল্লী আমি কখন দেখিতে পাইলাম না। সে প্রত্যক্ষ দেবতা গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শনও আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আর তোমার মুখে শুনিয়াছি, সেখানে মা লক্ষ্মী আছেন। তাঁহাকে দেখিলে পাপতাপ দূরে যায়। সে দেবীদর্শনও আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। ইহার কোন উপায় তুমি করিতে পার না কি ?”

সুরেন্দ্র বলিলেন,—“উত্তম কথা। নিশ্চয়ই শীঘ্র ইহার সুব্যবস্থা করিব। আপাততঃ দয়া করিয়া তোমার সোণার চাঁদকে আমার কাছে দেও।”

রাজবালা বলিলেন,—“হাঁ, সব ঠিক হইয়াছে। এখন লইয়া যাও।”

গলায় হীরার হার, গায়ে মুক্তাখচিত সাচ্চা কাজ করা জামা, হাতে জড়াও বালা, তাহার পশ্চাতে সরু সরু সোণার চুড়ি প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে খোকা ভূষিত হই-য়াছে। স্বভাবসুন্দর শিশু বড়ই শোভাময় হইয়াছে। সুরেন্দ্র তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু সোণার চাঁদ ভাল করিয়া মার গলা

জড়াইয়া ধরিল ; পিতার কোলে যাইতে সম্মত হইল না। শেষে একটু জোর করিয়া সোণার চাঁদের অনিচ্ছায়, সুরেন্দ্র লজ্জিত ও কুণ্ঠিত ভাবে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। রাজবালার আজ্ঞাক্রমে দাসী সঙ্গে চলিল। সুরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

রাজবালা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—তোমার আবার অপরাধ! যাঁহার অপরাধেও এমন সোণার চাঁদ পাওয়া যায়, তাঁহাকে কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়, তাহা আমার মত অজ্ঞান নারী কি বুঝিবে? আমার কাছে লজ্জা কেন? সঙ্কোচ কেন? আমি তো আশ্রিতা দাসী। তবে এত দিন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চরণসেবা করিতে সুযোগ পাই নাই; এখন সে অধিকার লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।”

রাজবালা অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন।

———●———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুরের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তস্থিত পল্লীতে একখানি জীর্ণ ও পতনোন্মুখ সামান্য খড়ের ঘরে এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট পীড়িত ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে। একখানি সামান্য তক্তাপোষের উপর অতি মলিন ও ছিন্ন শয্যায় রুগ্ন পুরুষ শায়িত আছে। তাহার মাথার নিকট একটী পিতলের গ্লাসে জল রহিয়াছে, কাতর পুরুষ সময়ে সময়ে হাত বাড়াইয়া সেই গ্লাস লইতেছে এবং একটু করিয়া জল খাইতেছে। তাহার নিকটে কোন লোক নাই; ঘরের মধ্যে একটা ঘটী, একটা কলসী, দুইটা হাঁড়ি ছাড়া অন্য কোন সামগ্রী নাই। ঘর নানা প্রকার আবর্জ্জনায় পূর্ণ এবং গৃহস্বামীর নিতান্ত দুর্দ্দশার পরিচায়ক। রোগীর নিকটে কোন লোক নাই। প্রবেশদ্বার অর্গলবদ্ধ নহে, চাপা রহিয়াছে মাত্র। এই রুগ্ন পুরুষ আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত কালিদাস চক্রবর্ত্তী।

কালিদাস তিন মাস হইতে নানা প্রকার রোগভোগ করিতেছেন। অল্প অল্প জ্বর হয়, আহারে নিতান্ত অপ্রবৃত্তি, নিতান্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা ইহাই তাঁহার পীড়া। উপযুক্ত ঔষধাদি পাইলে,রীতিমত চিকিৎসা হইলে,

কালিদাস হয় তো সহজেই সারিয়া উঠিতে পারিতেন এবং তাঁহার এরূপ জীর্ণ দশা হইত না। কিন্তু তাঁহার অর্থ নাই, সহায় নাই, বন্ধুবান্ধব নাই, আশ্রয় নাই। এরূপ ব্যক্তির যত্ন করে কে? চিকিৎসা হয় কিরূপে? শুশ্রূষা করিবার লোক কোথায়? কাজেই কালিদাসের পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে তাঁহাকে শয্যাগত করিয়াছে। এক সময়ে কালিদাসের অনেক পসার ছিল, অনেক ভাল মন্দ লোক তাঁহার অনুগত ছিল। তাঁহার কারবার উঠিয়া গেল, বাড়ী ঘর হাতছাড়া হইল, হাতের পয়সা ফুরাইল, আত্মীয় বন্ধুর সম্বন্ধও শেষ হইল। একজন কায়স্থ বেপারি কালিদাসকে পীড়িত ও নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া, আপনার এই ঘরে তাঁহাকে বাস করিতে দিয়াছেন। প্রথম প্রথম তিনি ব্রাহ্মণকে যৎসামান্য অর্থসাহায্যও করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে নানা কারণে তাঁহার সহায়তা লাভে কালিদাসকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

কালিদাসের দুর্দ্দশার সীমা নাই। তিনি শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছেন,—"শরীর আর বহিবে না। বহিয়া কাজই কি? দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে; এখন মৃত্যু হইলেই মঙ্গল। আমার সকলই ছিল; বাড়ী ঘর, টাকা, জিনিষপত্র কিছুরই অভাব ছিল না, সকলই গেল। কেন এমন হইল? ঠিকই হইয়াছে। আমি কুলটা অবিশ্বাসিনীর

কথা শুনিয়া লক্ষ্মীরূপা পত্নীকে অন্নবস্ত্র আশ্রয় দিই নাই,—পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছি। আজি তরঙ্গিণী সুখের সাগরে ভাসিতেছে, আমার সর্ব্বস্ব লইয়া পরমানন্দে কাল কাটাইতেছে। আর আমার সে স্ত্রী? সে আমার একটু পদধূলি চাহিয়াও পায় নাই, একটু মুখের আদরও পায় নাই। আজি সে থাকিলে কি এমন দশা হইত? সে হয় তো ভিক্ষা করিয়া, পরিশ্রম করিয়াও আমাকে সেবা করিত। সে আর নাই। হায়! আমি হেলায় সকলই হারাইয়াছি। এ পাপের ফল এ জন্মে ভুগিতেছি; পরজন্মেও ভুগিব।"

রোগীর চক্ষুতে জল আসিল। তিনি আবার বলিলেন,—"দুইখানা বাতাসা কি একটু মিছরি পাইলে মুখে দিয়া জল খাই; সুধু জল আর খাইতে পারি না। কিন্তু কে বা পয়সা দিবে? কে বা আনিয়া দিবে?"

কালিদাস গ্লাস টানিয়া একটু জল খাইলেন। আবার বলিলেন,—"এ সংসারে যাহার স্ত্রী নাই, তাহার কেহই নাই। আমার লক্ষ্মীরূপা স্ত্রী ছিল—আমার সব গিয়াছে।"

সহসা ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল। সেই দ্বার দিয়া একটী নারী ও একটী পুরুষ সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। নারী বলিলেন,—"আপনার সকলই আছে। আপনি হতাশ হইবেন না।"

কি মধুর স্বর! কি আশ্বাসের বাণী! নারীর আগমনে সেই মলিন ঘর যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আশা ও আনন্দ পীড়িত ব্যক্তিকে উৎসাহিত করিল। নারীর হস্তে একটী ক্ষুদ্র পুঁটুলি। তিনি তাহা শয্যার এক পার্শ্বে রক্ষা করিয়া রোগীর মূর্ত্তি একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। নারীর সঙ্গীপুরুষ বলিলেন,—"চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? আমি কৃষ্ণনগরের সেই যদু হালদার।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"ঠিক, তোমাকে চিনিয়াছি। আর ইনি কে?"

যদু বলিলেন,—"ইঁহাকে আপনি চিনেন না? ইঁহার নাম এ অঞ্চলে কে না জানে? ইনি মা লক্ষ্মী।"

কালিদাস বলিলেন,—"তিনি তো দেবী শুনিয়াছি। ইঁহার আকার দেখিয়াও দেবী বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু আমার ন্যায় পাপী নরাধমের প্রতি এ দেবীর দয়া কেন?"

যদু বলিলেন,—"এমন কথা বলিবেন না। মা-লক্ষ্মীর দয়া সকলের প্রতিই সমান। আপনি তো ব্রাহ্মণ, মাথার মণি। চণ্ডালের প্রতিও মা-লক্ষ্মীর কৃপার শেষ নাই।"

কালিদাস বলিলেন,—"আমি তবে দেবীকে প্রণাম করি?"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ—আমার পরম গুরু। আপনি প্রণাম করার কথা মুখে বলিলেও আমার পাপ হইবে। আমি আপনার চরণ-ধূলী মস্তকে ধারণ করিতেছি।"

মা-লক্ষ্মী তখন কালিদাসের চরণে মস্তক স্থাপন করিলেন। তাহার পর রোগীর শিয়রে বসিয়া পুঁটুলি হইতে মিছরি, বাতাসা, বেদানা, পানিফল প্রভৃতি নানা সামগ্রী বাহির করিলেন। রোগীর মুখে প্রথমে একটী পানিফল দিলেন, তাহার পর কয়েকটী বেদানার দানা দিলেন। রোগীর মুখ জুড়াইয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আঃ প্রাণটা শীতল হইল। আপনি সাক্ষাৎ স্বর্গের দেবী। আমি আপনাকে দেবী বলিয়াই ডাকিব।"

মা-লক্ষ্মী রোগীর শুশ্রূষা লইয়া ব্যস্ত হইলেন। এদিকে যদু হালদার ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ঘর পরিচ্ছন্ন হইল। তাহার পর যদু হালদার নূতন কলসী আনিয়া ভাল জল রাখিলেন, পুরা-তন কলসীতে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য জল থাকিল। এদিকের কার্য্য শেষ হইলে যদু একবার সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইল। অপরাহ্নকালে তিনি প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই জন মুটে। তাহাদের মাথায় দিয়া যদু অনেক সামগ্রী আনিয়াছেন। লেপ, চাদর, বালিস, মাদুর, কম্বল

সকলই আসিয়াছে। দুধ, কড়াই, কাষ্ঠাদি আসিয়াছে। গড়গড়া, নল, কলিকা, টীকা, তামাক আসিয়াছে। লণ্ঠন, বাতি, দিয়াশলাই আসিয়াছে। ঘড়া, ঘটী, গাড়ু, থালা, রেকাব, বাটী ও গ্লাস আসিয়াছে। জিনিষপত্রে ক্ষুদ্র ঘর পূর্ণ হইল।

তখনই কালিদাসকে সরাইয়া ও তক্তাপোষ ঝাড়িয়া ভাল বিছানা করা হইল। চারিদিকে বালিস দেওয়া হইল, সেই বিছানায় কালিদাসকে আনয়ন করা হইল। কালিদাস না শুইয়া একটু বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহার পর গড়গড়ায় তাওয়া দিয়া বড় কলিকায় উত্তম তামাকু সাজিয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল। কালিদাস অত্যন্ত তামাকুপ্রিয়। ঘরের এক কোণে একটা থেলো হুঁকা, একটু দাকাটা তামাক এবং একটা ভাঙ্গা কলিকা ছিল। তামাক ওবেলা শেষ হইয়াছে। সহসা এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনে কালিদাস বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

মা-লক্ষ্মী উঠিয়া দুধ গরম করিবার ব্যবস্থা করিলেন। গরম দুধ আনিয়া কালিদাসের মুখে ধরিলেন। কালিদাস অল্প অল্প করিয়া তাহা খাইয়া যথেষ্ট আরাম অনুভব করিলেন। নূতন ভাল বস্ত্র কালিদাসকে পরান হইল, দেহ জামায় ঢাকা হইল।

সন্ধ্যা হইল। হরিকেন লণ্ঠন জ্বালা হইল। একটা বাতিও ঠিক করিয়া রাখা হইল। যদু হালদার ভূতলে

কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর উপবেশন করিলেন। যে দৃশ্য পূর্ব্বে ঘৃণাজনক ও বিষাদময় ছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা প্রীতিজনক ও আনন্দময় হইয়া উঠিল।

মা-লক্ষ্মীর অঞ্চলে একটা ঔষধ ছিল, তিনি এক্ষণে তাহা কালিদাসকে খাওয়াইয়া দিলেন। অভাগা কালিদাস এই সকল দ্রব্য সামগ্রী, সেবা শুশ্রূষা, সর্ব্বোপরি এই দেবীর পরিচর্য্যা দেখিয়া অবাক হইয়া পড়িলেন। বলি-লেন,—"আমি অতিশয় পাপী। আপনারা আমার জন্য যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহা বৃথা নষ্ট হইতেছে।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আপনি পাপী হউন, পুণ্যাত্মা হউন, আমরা তাহা জানি না। আপনাকে সুস্থ করা আমাদের প্রয়োজন। আমরা সে জন্য কোন অর্থব্যয় কেন, প্রাণপাত করিতে হইলেও করিব। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।"

কালিদাস বলিলেন,—"আমি এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি। একটু দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কোন রোগ আমি বুঝিতে পারিতেছি না; এক্ষণে রাত্রি হইয়া পড়িল। এখানে থাকিলে আপনাদের অনেক অসুবিধা হইবে। আপনারা এখন প্রস্থান করিতে পারেন। কল্য কোন সময় দয়া করিয়া আমার সন্ধান করিলে চিরতার্থ হইব।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"আমরা কোথায়ও যাইব না। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে আমরা সকলেই এ স্থান ত্যাগ করিব। আপনি আর একটু দুধ খান, একটু বেদানা খান, তাহার পর নিদ্রা যান। আমাদের জন্য কোন চিন্তার আবশ্যক নাই।"

রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতে হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের পর নাপিতের দ্বারা রোগীর ক্ষৌরকর্ম্ম শেষ করা হইল। ঔষধ ও পথ্যাদি সেবন করান হইল। তিন দিন পরে কালিদাস নীরোগ হইয়া উঠিলেন। বেলা দশটার সময় অন্নাদি সেবন করিয়া কালিদাস শয্যার উপর বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন। যদু হালদার আজি প্রাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুস্থ হইয়াছেন বুঝিয়া কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। মধ্যাহ্নকালে তিনি আসিলেও আসিতে পারেন; সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি যে সেই জীর্ণ কুটীরে প্রত্যাগমন করিবেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

মা-লক্ষ্মী তখনকার প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম্মাদি শেষ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর একটা পান দিব কি ?"

কালিদাস বলিলেন,—"না। আমি একে মহাপাপী, তাহার উপর আবার যে কত পাপ হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আপনি দেবী। আপনি

আমার জন্য যে সকল পরিচর্য্যা করিতেছেন, তাহাতে আমার বড়ই পাপ হইতেছে। আমি এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি। আপনার সাহায্য না পাইলেও এখন আমার অনিষ্ঠ হইবে না; আপনি আমার আর পরিচর্য্যা করিবেন না।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"স্ত্রীলোকে গৃহকর্ম্ম যেরূপে করিতে পারে, পুরুষে তাহা পারে না। এখন স্ত্রীলোকের সহায়তা না পাইলে আপনার অসুবিধা হইবে। আপনি সুস্থ হইয়া এস্থান হইতে ভাল জায়গায় যাওয়ার পর, যাহা ভাল হয় করিবেন।"

কালিদাস বলিলেন,—"স্ত্রীলোকের দ্বারা যেরূপ শুশ্রূষা হয়, এমন আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না, এ কথা আমি বেশ জানি। কিন্তু তাই বলিয়া সুস্থ হইয়াও দেবীর সেবা লইয়া পাপসঞ্চয় করিব কেন? আমার যাবজ্জীবন, অনুক্ষণ সাধ্বী পত্নীর সেবা পাইবার উপায় ছিল। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সুখ নষ্ট করিয়াছি।"

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—"কিরূপে?"

কালিদাস বলিলেন,—"আপনার নিকট আমি মিথ্যা বলিব না। আমি এক চতুরা কুলটার প্রেমাসক্ত ছিলাম। পত্নীর কখন সন্ধানও করি নাই। সতী অন্নাভাবে কষ্ট পাইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি সেই কুলটার মিথ্যা কথায় ভুলিয়া ধর্ম্মশীলা পত্নীকে পদাঘাতে

দূর করিয়া দিয়াছি। আমার স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। এখন রোদন ভিন্ন আমার আর উপায় নাই।”

কালিদাসের চক্ষুতে জল আসিল। মা-লক্ষ্মী জিজ্ঞাসিলেন,—“তাহার পর আপনার স্ত্রীর কি হইল?”

কালিদাস বলিলেন,—“তাহার পর আমি কোন সন্ধান করি নাই। আমার আশঙ্কা হয়, দুঃখিনী গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।”

মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—“তবে তো সকল জ্বালাই চুকিয়া গিয়াছে। আর তাহার জন্য ভাবিয়া কি ফল?”

কালিদাস বলিলেন,—“এমন কথা বলিবেন না। যত দিন বাঁচিতে হইবে, কেবল তাহার জন্যই ভাবিতে হইবে। সংসারের সকল মোহ আমি দেখিয়াছি। সকলই অসার —সকলই স্বার্থমাখা—সকলই ক্ষণস্থায়ী। কেবল ধর্ম্মপত্নীর ভালবাসাই সার। আমি তাহাকে পাইলে, ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইলেও সুখী হইব। আহা! আমার একটু পদধূলির আশা করিয়া অভাগিনীকে কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইয়াছে। এখন তাহাকে দেখিতে পাইলে, তাহার চরণতলে আমি লুটাইয়া পড়ি।”

কালিদাসের চক্ষুতে আবার জল আসিল। মা-লক্ষ্মী বলিলেন,—“তাহার জন্য যখন আপনার এত কষ্ট, তখন তাহাকে সন্ধান করা উচিত। তাহার আকার কিরূপ ছিল, আপনার মনে পড়ে কি?”

কালিদাস বলিলেন,—"ভাল মনে পড়ে না। বিবাহের পর আমি কখনই তাহাকে ভাল করিয়া দেখি নাই। এক দিন তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সে চেহারা আমার মনে বেশ জাগিয়া আছে। একবার তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি। সে স্বর আমার বেশ মনে আছে।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"আপনি যদি আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাহার সন্ধান করিতে পারি।"

কালিদাস বলিলেন,—"পারি; কিন্তু বলিতে সাহস হয় না। যদি তাহার বর্ণ আর একটু উজ্জ্বল, আর একটু জ্যোতির্ম্ময় হইত, যদি তাহার চক্ষুতে আর একটু দয়া মিশান কোমল ভাব থাকিত, যদি তাহার শরীরে দেব-ভাব থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে বলিতে সাহস হয় না —তাহা হইলে সে আপনার মত হইতে পারিত। আর তাহার কণ্ঠস্বর যদি আর একটু গম্ভীর হইত তাহা হইলে আপনার স্বরের মতই শুনাইত। বলিতে ভয় হয়, আমি অনেক সময় আপনার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়াছি।"

মা লক্ষ্মী ধীরে ধীরে সেই শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কালিদাস বলিলেন,—"সে মানবী—আর আপনি দেবী। আমার এরূপ তুলনা করা অন্যায় হই-

য়াছে। কিন্তু এখন বুঝিয়াছি, তাহার ব্যবহারে ও কার্য্যে অনেক দেবত্ব ছিল।”

মা লক্ষ্মী আর একটু সরিয়া বসিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর একটু জড়িত হইল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—“যদিই তাহার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনি তাহাকে এক্ষণে চরণে স্থান দিবেন কি ?”

কালিদাস চমকিত হইয়া বলিলেন,—“এইরূপ কণ্ঠস্বর। আমার সে বিরাজমোহিনীর এমনই স্বর। চরণে স্থান দিব কি বলিতেছেন ? আমি তাহাকে একবার দেখিয়া মরিতে পাইলেও চরিতার্থ হইব। হায় সে কোথায় গেল !”

কালিদাস কাঁদিতে লাগিলেন। তখন নয়নের জলে মা-লক্ষ্মীর বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“প্রাণেশ্বর ! দাসী বিরাজমোহিনী তোমার চরণতলে।”

তৎক্ষণাৎ মা-লক্ষ্মী কালিদাসের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গভীর রাত্রিতে বহু সংখ্যক দস্যু তরঙ্গিণীর ভবনে প্রবেশ করিয়া তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে এবং তাহার গৃহে ও শরীরে যে কিছু অলঙ্কারাদি ছিল, তৎসমস্ত অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। রাত্রিতেই তরঙ্গিণীর দ্বারবান থানায় এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে। প্রাতে তাহার দ্বারে, ভবনে, সন্নিহিত অঙ্গনে ও পথে অনেক মনুষ্যসমাগম হইয়াছে।

থানার দারোগা প্রভৃতি বহু লোক উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বারবান প্রভৃতির জোবানবন্দী শুনিয়া থানার লোকেরা হারাধন নন্দী বা কালিদাস চক্রবর্ত্তী, অথবা রাজা অরবিন্দ রায়কে এই নারীহত্যার পাতকে সংলিপ্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হয় তিন জন একযোগে, না হয় ঐ তিন জনের কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্র ভাবে দল জুটাইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন, ইহাই দারোগা প্রভৃতির বিশ্বাস হইয়াছে।

তরঙ্গিণী কিন্তু একবারও সে কথা বলিতেছে না। সে বলে, যাহারা এ কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে সে সুস্পষ্টরূপে দেখিয়াছে এবং এখনও দেখিতে পাইলে

চিনিতে পারে। তাহাদের মধ্যে উল্লিখিত তিন জনের কেহই ছিলেন না, ইহা তরঙ্গিণী জোর করিয়া বলিতেছে। কিন্তু থানার লোকেরা এ কথা সহজেই উড়াইয়া দিতেছেন। তাঁহারা বলেন, ঐ তিন ব্যক্তির কেহই উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহাদের নিয়োজিত লোকে এ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, ইহার কোনই ভুল নাই।

তরঙ্গিণীর আঘাত অতি গুরুতর হইয়াছে। হাতে গায়ে অনেক অস্ত্রাঘাত হইয়াছে, এবং সে জন্য প্রভূত রক্তক্ষয় হইতেছে বটে; কিন্তু তাহাতেও আহতা নারীর জীবনান্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তাহার তলপেটে এক গভীর অস্ত্রাঘাত হইয়াছে, সেই আঘাত সাংঘাতিক, পীড়িতার যাতনা এখন আর বড় নাই। রাত্রিকালে আঘাতের পরই তাহার অসহ্য যন্ত্রণা হইয়াছিল; কিন্তু প্রাতে ক্লেশ কমিয়া গিয়াছে এবং তরঙ্গিণী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। তাহাকে এখন কঠিন পীড়ায় পীড়িত বিবর্ণ রোগীর ন্যায় দেখাইতেছে; সহসা তাহার জীবনের সমাপ্তি হইবে, এরূপ কোন আশঙ্কা তাহাকে দেখিয়া কাহারও মনে হইতেছে না।

দারোগা প্রভৃতি অনেকে তরঙ্গিণীকে পাল্কী করিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহাদের লেখা পড়া শেষ হইয়াছে; এক্ষণে আহতা নারীকে

হাঁসপাতালে চালান দিলেই আপাততঃ তাঁহাদের কর্ত্তব্যের সমাপ্তি হয়। তাহার পর ঐ তিন ব্যক্তিকে ধরিতে পারিলেই যে আসামীর কিনারা হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে তাঁহারা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তরঙ্গিণীকে তাঁহারা হাঁসপাতালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

অতি কাতরস্বরে তরঙ্গিণী বলিল,—"আমার জীবনের শেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। এখন আমাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার উদ্যোগ করিলে, হয় তো বাহির করিবার সময়েই আমার মৃত্যু হইবে; পথে যে মৃত্যু হইবে তাহার ভুল নাই। সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, আপনারা যে তিন ব্যক্তির উপর সন্দেহ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত যদি একবার এ সময় আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।"

দারোগা বলিলেন,—"তাহারা নিশ্চয়ই ভাগড়া হইয়াছে। তাহাদের সহিত দেখা হওয়ার কোন আশা নাই। তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য আমি লোক লাগাইয়াছি। তোমাকে কথামত এখনও তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করায় কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইবে না।"

তখনই সেই ঘরে চারি জন পুরুষ ও একটী নারী প্রবেশ করিলেন। তরঙ্গিণী চিনিতে পারিল, রাজা অরবিন্দ রায়, কালিদাস চক্রবর্ত্তী এবং হারাধন নন্দী তাহার সম্মুখে উপস্থিত। চতুর্থ ব্যক্তি ও আনন্দ প্রতিমার ন্যায় সমুজ্জ্বল নারী কে, সে চিনিতে পারিল না। সেই নারী মা-লক্ষ্মী এবং সেই পুরুষ যদু হালদার।

দারোগার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তরঙ্গিণী বলিল,—"যাঁহাদের আপনি ভাগড়া বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এখানে উপস্থিত।"

দারোগা এই তিন আসামীর কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারাদি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিবেন স্থির করিয়া, একটু দূরে সরিয়া বসিলেন।

অন্য কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে মা-লক্ষ্মী অগ্রসর হইয়া তরঙ্গিণীর শিয়রে বসিলেন এবং নিতান্ত ব্যথিত ভাবে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"দিদি, আঘাত কি বড় গুরুতর হইয়াছে? বড় যাতনা হইতেছে কি?"

দেবীর করস্পর্শে তরঙ্গিণীর বড় শান্তি জন্মিল। সে বলিল,—"আঘাত বড় গুরুতর হইয়াছে, জীবনের শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। আপনি কে? আপনাকে তো আমি চিনিতে পারিতেছি না।"

হারাধন অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"তুমি মা-লক্ষ্মীর নাম শুন নাই? ইনি সেই মা-লক্ষ্মী।"

তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে কপালে হাত তুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। হাত বাড়াইয়া তাঁহার পদধূলি লইল। কালিদাস বলিলেন,—"ইঁহাকে তোমার ভাল করিয়া চিনিতে পারা উচিত। ইনিই আমার স্ত্রী—বিরাজ-মোহিনী।"

তরঙ্গিণী ভাল করিয়া মা-লক্ষ্মীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল,—"অসম্ভব নহে। সেই মূর্ত্তিরই উপর কেমন দেবত্বের আলোক লাগিয়াছে। উনি এ সময়ে দেখা দিয়া বড়ই দয়া করিয়াছেন; আমি অনেক পাপ করিয়াছি। আমি এই সতী লক্ষ্মীকে মিথ্যা অপবাদ দিয়া লাথি খাওয়াইয়াছি, তাঁহার ন্যায্য স্থানে তাঁহাকে তিষ্ঠিতে দিই নাই; স্বামীর অন্ন বস্ত্র ভোগ করিতে দিই নাই, কিন্তু আমার অশেষ পাপ। পাপের হিসাব দিয়া কি করিব? এখন কয়টী দরকারী কথা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে বলিয়া ফেলিতে পারিলেই হয়।"

হারাধন, কালিদাস, অরবিন্দ ও যদু তরঙ্গিণীকে ঘেরিয়া বসিলেন। হারাধন বলিল,—"ধীরে কথা বল। অল্প কথায় শেষ কর। যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে কোন কথা বলিয়া কাজ নাই।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"বলিতেই হইবে। রাজা মহাশয়

এই বাটী আপনার নামে বেনামী করা হইয়াছে। অনেক জিনিষ পত্র আপনার বাটীতে রাখা হইয়াছে। সে সকলই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার অধিক কথা বলিতে হইবে না। আমি জানি যে সমস্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সামগ্রী, পাছে তুমি কোন প্রতারকের কুহকে পড়িয়া সে সমস্ত ধ্বংস কর, এই আশঙ্কায় আমি সে সকল তোমার নিকট হইতে লইয়াছি। তুমি বলিবার পূর্ব্বেই আমি চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এ সংবাদ জানাইয়াছি; জিনিষ পত্রের তালিকা তাঁহাকে দিয়াছি, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামে বাটীর লেখা পড়া প্রস্তুত করিয়াছি। তুমি আর কি বলিতে চাহ বল?"

তরঙ্গিণী বলিল,—"গিরিবালার নিকট হইতে আমি যে অলঙ্কারাদি লইয়া আপনার নিকট দিয়াছিলাম, তাহা হারাধনকে দিলে ভাল হয়।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা হারাধনকে দেওয়া হয় নাই। হারাধনের দ্বারা তৎসমস্ত সুরেন্দ্র বাবুকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমার পরামর্শে গিরিবালার অশেষ দুর্গতি, শেষে মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়াছি গিরিবালার একটী ছেলে আছে। সেই ছেলের আর হারাধনের একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হইত।"

রাজা বলিলেন,—"সে জন্য তোমার কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। সুরেন্দ্র বাবু ছেলেকে আপন উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর হারাধনের জন্যেও সুব্যবস্থা হইয়াছে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমার শরীর বড় ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আর দেরি নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমি আপনার নিকট অনেক পাপ করিয়াছি, অনেক অত্যাচার করিয়াছি। আপনার সহিত আমি নিয়ত প্রতারণা করিয়াছি। সে কথা আর বলিয়া ফল কি? এত অপরাধের যে কি শাস্তি হইবে, তাহা বলিতে পারি না।"

কালিদাস বলিলেন,—"আমি অকপট চিত্তে তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেছি। প্রার্থনা করি, তুমি পরকালে সুখী হইবে।"

তরঙ্গিণী বলিল,—"আমি ভাল করিয়া কথা বলিতে পারি না। বুঝি শেষ কাল আসিতেছে। হারাধন আমি তোমার ভগ্নীর মৃত্যুর কারণ। তোমাকে আঘাতে মৃতপ্রায় দেখিয়াও আমি তোমাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছি।"

হারাধন বলিল,—"বেশ করিয়াছ। তাহাতেই এই মহাত্মাদের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। আমি সুখী হইয়াছি। আমার নিকট তুমি কোন অপরাধ কর নাই।"

তরঙ্গিণী একটু অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্ব-

শরীর কাঁপিতে লাগিল। মা লক্ষ্মী তাহার মস্তক আপনার ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। তরঙ্গিণী বলিল,—"তুমি আমাকে দিদি বলিয়া ডাকিয়াছ। তোমার কি কষ্টই আমি ঘটাইয়াছি।"

মা লক্ষ্মী বলিলেন,—"কিছু না। তোমার কৃপায় আমার পরম মঙ্গল হইয়াছে। আমি জেঠা গোপীনাথের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তোমার যেন শান্তি হয়।"

মা লক্ষ্মীর কোলে তরঙ্গিণীর মস্তক স্বতঃ এদিক ওদিক করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল, তরঙ্গিণীর আর বিলম্ব নাই। সে বলিল,—"কি মিষ্ট আলাপ। গোপীনাথ! গোপীনাথকে ডাকিব কি?"

রাজা বলিলেন,—"ডাক—ডাকিতে না পার, তাঁহাকে মনে মনে ভাব। নিশ্চয় তোমার মঙ্গল হইবে।"

তরঙ্গিণী বলিলেন,—"আর রাজা, আপনি কে? আপনি তো মানুষ নহেন। আপনি কি দেবতা?"

রাজা বলিলেন,—"আমি রাজা নহি, আমি দেবতা নহি, আমি সামান্য মানুষ। আমার নাম সনাতন মুখোপাধ্যায়। সাধ্যমত পরের হিতসাধন আমার ব্রত। আমি এ ব্রত একাকী সম্পাদন করিতে পারি না। এ কার্য্যে আমার অনেক সহায় আছেন। কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি কখন রাজা, কখন ব্রাহ্মণ, কখন বৃদ্ধ, কখন সন্ন্যাসী, কখন দণ্ডী সাজিয়া থাকি।"

তরঙ্গিণী বলিল,—আপনিই কি বড়বাজারে চক্রবর্ত্তীর লাঠি হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ?”

সনাতন বলিলেন,—হাঁ, আমি পূর্ব্বেই রাজা সাজিয়া সুরেন্দ্র বাবুর অপহৃতধন আদায় করিয়া তখনই ব্রাহ্মণ সাজিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছি।”

তরঙ্গিণী বলিল,—“আপনাকে প্রণাম। আপনি দেবতা! এ কি হঠাৎ সকলই অন্ধকার হইল কেন? গোপীনাথ! দেখা দেও—বিরাজমোহিনী পায়ের ধূলা—দেবতা কই ?”

সনাতন উচ্চস্বরে বলিলেন,—“তুমি আমাদের কথা ভুলিয়া যাও। এখন কেবল গোপীনাথকে ভাব।”

তরঙ্গিণী মুখ বড় বিকৃত করিল। তাহার মস্তক মা-লক্ষ্মীর ক্রোড় হইতে পড়িয়া গেল। তাহার প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

শেষ।

তরঙ্গিণীর মৃতদেহ সদরে চালান হইল। সেখানে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ লাস জ্বালাইয়া দিতে হুকুম দিলেন।

দারোগা মহাশয় দস্যুদের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না; অথচ যে তিন ব্যক্তির উপর তিনি সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহাকেও ফাঁদে ফেলিবার কোন উপায়ও করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

ডাকাতির ও হত্যার কোন কিনারা করিতে না পারিলেও, দারোগা মহাশয় আর একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিলেন। সনাতন মুখোপাধ্যায় আইনের ও রাজশক্তির অবমাননা করিয়া, স্বয়ং শাসন পালন নির্ব্বাহ করেন এবং পরের অর্থ আত্মসাৎ করেন, ইত্যাদি নানা কথা লিখিয়া তিনি এক রিপোর্ট পাঠাইলেন। সদর হইতে স্বয়ং মেজিষ্ট্রেট সাহেব এই বিষম অভিযোগের তদন্ত করিতে আসিলেন। অনেক দিন ধরিয়া তন্নতন্ন করিয়া অনেক অনুসন্ধান তিনি করিলেন। বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই। তদন্তের শেষ হইলে মেজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং সনাতন মুখোপাধ্যায়ের সেই পর্ণ-

কুটীরে উপস্থিত হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সাহেব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন, এই সংসার এক বিশাল

কর্ম্মক্ষেত্র।

স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থে কর্ম্ম-সম্পাদন করিবার অভ্যাস করিলেই যথার্থ মনুষ্যত্ব হয়। মেজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার ইংরাজী ভাষার প্রগাঢ় অধিকার, বুদ্ধির সারবত্তা, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের উচ্চতা প্রণিধান করিয়া বার বার তাঁহার সাধুবাদ করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অবলম্বিত ব্রতের প্রণালী প্রভৃতি সকলই সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন। যেরূপে আবশ্যক মত অর্থ তাঁহার হস্তগত হয়, যেরূপে সে অর্থ ব্যয়িত হয়, যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহকারী লোক এ ব্রতে যোগ দেয়, সকলই তিনি ব্যক্ত করিলেন। এই আশ্চর্য্য পরসেবা-ব্রতের বিবরণাদি সাহেব লিখিয়া লইলেন। যথাসময়ে তিনি তাহা গভর্ণমেণ্টের গোচর করিলেন। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সনাতন মুখোপাধ্যায়ের নামে ধন্যবাদ প্রচারিত হইল। অধিকন্তু আবশ্যক হইলে, তিনি অবলম্বিত কার্য্যে পুলিসের সাহায্যপ্রাপ্ত হইবেন, এরূপ আদেশ হইল। পরসেবাব্রত আরও বিস্তারিতরূপে চলিতে লাগিল। অনেক মহাত্মা ইচ্ছাপূর্ব্বক সনাতন মুখোপাধ্যায়ের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে উপস্থিত হইলেন।

হারাধন, জননী, স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া রাজীবপুরে বাস করিতে লাগিলেন কিন্তু সনাতন মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য হইয়া তিনি যে পরসেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে তাঁহার সাধ্য হইল না।

সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার পত্নী এই সেবা-ব্রতের প্রধান উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সোণার চাঁদ ক্রমেই বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও অব্যাহত স্বাস্থ্যের পরিচয় দিতে লাগিল।

যদু হালদারের কারবারের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি। তাহার শ্যাম-খুড়াই কারবার চালইয়া থাকেন, যদুকে বড় দেখিতে হয় না। যদু ক্রমশঃ এই সেবাকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিয়োজন করিল।

মা-লক্ষ্মী স্বামীর সহিত ঘরকন্না করিতে লাগিলেন কালিদাস আর কাজ কারবার করিলেন না। সনাতন মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় যে সামান্য অর্থ তিনি লাভ করিলেন, তাহাতেই কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে লাগিলেন। কালিদাস এই ব্রতানুষ্ঠানের একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়া পড়িলেন। যাহারা কখন ধর্ম্মানুষ্ঠান করে নাই, ধর্ম্মের মধুর ভার তাহা-দের হৃদয়ে একবার প্রবেশ করিলে, বড়ই বদ্ধমূল হইয়া উঠে এবং তাহার আকর্ষণ বড়ই প্রবল হয়। কালিদাস সেবাব্রতের জন্য উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিলেন। পতি-

সেবা প্রধান অবলম্বনীয় হইলেও, মা-লক্ষ্মী সেবা ব্রতের নায়িকা হইয়াই রহিলেন। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, ভরসা ও আনন্দ তাঁহার অগ্রে অগ্রে সে দিকে ধাবিত হইত। তিনি যখন যে দিকে যাইতেন, তখন অবনতশিরে তাবৎ নরনারী তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিত। তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই লোকে সে দিন সুপ্রভাত বলিয়া জ্ঞান করিত। যে যে স্থলে তাঁহার চরণাঙ্ক নিপতিত হইত, অনেকে তত্রত্য মৃত্তিকা লইয়া মস্তকে ধারণ করিত। সকলেই তাঁহাকে সন্তাপ-নাশিনী দেবী বলিয়া জ্ঞান করিত।

এই সেবাব্রত সম্পাদনে আরও শত শত সম্পন্ন ও দরিদ্র মানব মিলিত হইল। আমরা এই সেবাব্রতধারী নরনারীগণকে প্রণাম করিয়া এই স্থানে গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেছি। প্রার্থনা করি, এই ব্রতগ্রহণের নিমিত্ত যেন সকল মানবই চিরদিন ব্যাকুল হয়।

সমাপ্ত